শেষের পরিচয়
শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শেষের পরিচয়

এক

রাখাল-রাজের নূতন বন্ধু জুটিয়াছে তারকনাথ। পরিচয় মাস-তিনেকের, কিন্তু ‘আপনি’র পালা শেষ হইয়া সম্ভাষণ নামিয়াছে ‘তুমি’তে। আর এক ধাপ নীচে আসিলেও কোন পক্ষের আপত্তি নাই ভাবটা সম্প্রতি এইরূপ।

বেলা আড়াইটায় তারকের নিশ্চয় পৌঁছিবার কথা, তাহারই কি-একটা অত্যন্ত জরুরী পরামর্শের প্রয়োজন, অথচ তাহারই দেখা নাই, এদিকে ঘড়িতে বাজে তিনটা। রাখাল ছটফট করিতেছে,—পরামর্শের জন্যও নয়, বন্ধুর জন্যও নয়, কিন্তু ঠিক তিনটায় তাহার নিজেরই বাহির না হইলেই নয়। ভবানীপুরে এক সুশিক্ষিত পরিবারে সন্ধ্যার পরেই মহিলা-মজলিসের অধিবেশন, বহু তরুণী বিদুষীর পদার্পণের নিঃসংশয় সম্ভাবনা জানাইয়া বেগার খাটিবার সনির্বন্ধ আহ্বান পাঠাইয়াছেন গৃহিণী স্বয়ং। অতএব, বেলাবেলি না যাইলে অতিশয় অন্যায় হইবে; অর্থাৎ কিনা যাওয়াই চাই।

এদিকে যাত্রার আয়োজন তাহার সম্পূর্ণ। দাড়ি-গোঁফ বার-দুই কামাইয়া বার-চারেক হিমানী লাগানো শেষ হইয়াছে, শয্যার পরে সুবিন্যস্ত গিলে-করা পাঞ্জাবি, সিল্কের গেঞ্জি, কোঁচানো দেশী ধুতি-চাদর, খাটের নীচে ক্রিম-মাখানো বার্নিশ-করা পাম্প, তেপায়ার উপরে রাখা সুবর্ণ-বন্ধনী-সংবদ্ধ সোনার চৌকা রিস্ট ওয়াচ—মেয়েদের চিত্তহারিণী বলিয়াই ছেলেমহলে প্রখ্যাত—সবই প্রস্তুত। টেবিলে টি-পটে চায়ের জল গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া প্রায় অপেয় হইয়া উঠিল, কিন্তু বন্ধুবরের সাক্ষাৎ নাই। সুতরাং দোষ যখন বন্ধুরই, তখন দ্বারে তালা দিয়ে বাহির হইয়া পড়িলেই বা দোষ কি! কিন্তু কোথায় যেন বাধিতেছে, অথচ ওদিকের আকর্ষণও দুর্নিবার্য।

প্রবল চঞ্চলতায় রাখাল চটি পায়ে দিয়া বড় রাস্তা পর্যন্ত একবার ঘুরিয়া আসিল। তারপরে চা ঢালিয়া একলাই গিলিতে শুরু করিয়া মনে মনে শেষবারের মত প্রতিজ্ঞা করিল, এ পেয়ালা শেষ হইলেই ব্যস্! আর না। মরুক গে তার পরামর্শ। বাজে—বাজে, সব বাজে। সত্যকার কাজ থাকিলে সে আধ-ঘণ্টা আগেই হাজির হইত, পরে নয়। না হয়, কাল সকালে একবার তার মেসটা ঘুরিয়া আসা যাইবে,—ব্যস্!

তারকের পরিচয় পরে হইবে, কিন্তু রাখালের ইতিহাসটা মোটামুটি এইখানে বলিয়া রাখি।

কিন্তু ওকে জিজ্ঞাসা করিলেই বলে, আমি তো সন্ন্যাসী-মানুষ হে। অর্থাৎ, মাতৃ-পিতৃকুলের সবাই গেছেন লোকান্তরে, সে-ই শুধু বাকি। ইহলোক সমুজ্জ্বল করিয়া একদিন তাঁহারা ছিলেন নিশ্চয়ই, কিন্তু সে-সব খবর রাখাল ভালো জানে না। যদি বা কিছু জানে, বলিতে চায় না। অধুনা পটলডাঙ্গায় তাহার বাসা। বাড়িআলা বলে দু'খানা ঘর, সে বলে একখানা। ভাড়ার দিক দিয়া শেষ পর্যন্ত দেড়খানার দরে রফা হইয়াছে। একতলা, সুতরাং যথেষ্ট স্যাঁতসেঁতে। তবে, হাওয়া না থাকিলেও আলোটা আছে—দিনে দেশলাই জ্বালিয়া জুতা খুঁজিয়া ফিরিতে হয় না। ঘর যাই হউক, রাখালের আসবাবের অভাব নাই। ভালো খাট, ভালো বিছানা, ভালো টেবিল-চেয়ার, ভালো দুটা আলমারি,—একটা বইয়ের, অন্যটা কাপড়-জামা-পোশাকে পরিপূর্ণ। একটি দামী ইলেকট্রিক ফ্যান, দেওয়ালের ঘড়িটাও নেহাত কম মূল্যের নয়—এমন আরও কত কি শৌখিন ছোটখাটো টুকিটাকি জিনিস। একজন ঠিকার বুড়ি-ঝি রাখালের কুকার, চায়ের সাজসরঞ্জাম মাজিয়া ঘষিয়া দিয়া যায়, ঘরদ্বার পরিষ্কার করে, ভিজা কাপড় কাচিয়া শুকাইয়া তুলিয়া দিয়া যায়,—সময় পাইলে বাজার করিয়াও আনে। রাখাল পাল-পার্বণের নাম করিয়া টাকাটা সিকাটা যাহা দেয় তাহা বহু সময়ে মাস-মাহিনাকেও অতিক্রম

করে। রাখাল মাঝে মাঝে আদর করিয়া ডাকে নানী। রাখালকে সে সত্যই ভালবাসে।

রাখাল সকালে ছেলে পড়ায়, বাকি সমস্তদিন সভা-সমিতি করিয়া বেড়ায়। রাজনীতিক নয়, সামাজিক। সে বলে, সে সাহিত্যিক,—রাজনীতির গণ্ডগোলে তাহাদের সাধনার বিঘ্ন ঘটে।

ছেলে পড়ায়, কিন্তু কলেজের নয়,—স্কুলের। তাও খুব নীচের ক্লাসের। পূর্বে চাকরির চেষ্টা অনেক করিয়াছে, কিন্তু জুটাইতে পারে নাই। এখন সে চেষ্টা ছাড়িয়াছে।

কিন্তু একবেলা ছোট ছেলে পড়াইয়া কি করিয়া যে এতটা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্ভবপর তাহাও বুঝা যায় না। সে সাহিত্যিক, কিন্তু প্রচলিত সাপ্তাহিক বা মাসিকপত্রে তাহার নাম খুঁজিয়া মেলে না। রাত্রে, অনেক রাত্রি জাগিয়া খাতা লেখে, কিন্তু সেগুলা যে কি করে কাহাকেও বলে না। ইস্কুল-কলেজে সে কি পাস করিয়াছে কেহ জানে না, প্রশ্ন করিলে এমন একটা ভাব ধারণ করে যে, সে গুরু-ট্রেনিং হইতে ডক্টরেট পর্যন্ত যা-কিছু হইতে পারে। তাহার আলমারিতে সকল জাতীয় পুস্তক। কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান—মোটা মোটা বাছা বাছা বই। কথাবার্তা শুনিলে হঠাৎ বর্ণচোরা মহামহোপাধ্যায় বলিয়া শঙ্কা হয়। হোমিওপ্যাথি শাস্ত্র হইতে wireless পর্যন্ত তাহার অধিগত।

তাহার মুখে শুনিলে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ-প্রবাহের জ্ঞান মার্কোনীর অপেক্ষা নিতান্ত কম বলিয়া সন্দেহ হয় না। কন্টিনেনটাল গ্রন্থকারদের নাম রাখালের কণ্ঠস্থ,—কে কয়টা বই লিখিয়াছেন সে অনর্গল বলিতে পারে। হিউমের সহিত লকের গরমিল কতটুকু এবং স্পিনোজার সঙ্গে দেকার্তের আসল মিল কোন্‌খানে এবং ভারতীয় দর্শনের কাছে তাহা কত অকিঞ্চিৎকর, এ-সকল তত্ত্বকথা সে পণ্ডিতের মতই প্রকাশ করে। বুয়ার-ওয়ারের সেনাপতি কে কে, রুশ-জাপান যুদ্ধে কিসের জন্য রুশের পরাজয় ঘটিল, আমেরিকানরা কি করিয়া এত টাকা

করিল, এ-সকল বিবরণ তাহার নখাগ্রে। ভারতীয় মুদ্রা-বিনিময়ে বাট্টার হার কি হওয়া উচিত, রিভার্স কাউন্সিল বেচিয়া ভারতের কত টাকা ক্ষতি হইল, গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড রিজার্ভে কত সোনা আছে এবং কারেন্সি আমানতে কত টাকা থাকা উচিত, এ সম্বন্ধে সে একেবারে নিঃসংশয়। এমন কি, নিউটনের সহিত আইনস্টিনের মতবাদ কতদিনে সামঞ্জস্য লাভ করিবে এ ব্যাপারেও ভবিষ্যদ্বাণী করিতে তাহার বাধে না। শুনিয়া কেহ কেহ হাসে, কেহ-বা শ্রদ্ধায় বিগলিত হইয়া যায়। কিন্তু একটা কথা সকলেই অকপটে স্বীকার করে যে, রাখাল পরোপকারী। সাধ্যে কুলাইলে সাহায্য করিতে সে কোথাও পরাঙ্মুখ হয় না।

বহু গৃহেই রাখালের অবাধ গতি, অবারিত দ্বার। খাটাইয়া লইতে তাহাকে কেহ ছাড়ে না। যে-সব মেয়েরা বয়সে বড়, মাঝে মাঝে অনুযোগ করিয়া বলেন, রাখাল, এ তোমার ভারী অন্যায়, এইবার একটা বিয়ে-থা করে সংসারী হও। কতকাল আর এমনভাবে কাটাবে,—বয়স তো হোলো।

রাখাল কানে আঙুল দিয়া বলে,আর যা বলেন বলুন, শুধু এই আদেশটি করবেন না। আমি বেশ আছি।

তথাপি আদেশ-উপদেশের কার্পণ্য ঘটে না। যাঁহারা ততোধিক শুভানুধ্যায়ী তাঁহারা দুঃখ করিয়া বলেন, ও নাকি আবার কথা শুনবে! স্বদেশ ও সাহিত্য নিয়েই পাগল।

কথা সে না শুনিতে পারে, কিন্তু পাগলামি সারে কিনা যাচাই করিয়া আজও কোনও শুভাকাঙ্ক্ষী দেখে নাই। কেহ বলে নাই, রাখাল তোমার পাত্রী স্থির করিয়াছি, তোমাকে রাজী হইতে হইবে।

এমনি করিয়া রাখালের দিন কাটিতেছিল এবং বয়স বাড়িতেছিল।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন। দর্শন-বিজ্ঞানে যাই হোক, সংসারে আপনার বলিতে তাহার যে কোথাও কিছু নাই এবং ভবিষ্যতের পাতেও শূন্য অঙ্ক দাগা এ খবরটা আর যাহার চোখেই চাপা পড়ুক, মেয়েদের চোখে যে

চাপা পড়ে নাই এ কথা রাখাল বোঝে।তাই বিবাহের অনুরোধে সে তাঁহাদের সদিচ্ছা ও সহানুভূতিটুকুই গ্রহণ করে; তাঁহাদের কাজ করে, বেগার খাটে, তার বেশীতে প্রলুব্ধ হয় না। এক ধরনের স্বাভাবিক সংযম ও মিতাচার ঐখানে তাহাকে রক্ষা করে।

চা-খাওয়া শেষ করিয়া রাখাল কোঁচান কাপড়টি পরিপাটি করিয়া পরিয়া সিল্কের গেঞ্জি আর একবার ঝাড়িয়া গায়ে দিবার উপক্রম করিতেছে, এমনি সময়ে তারক আসিয়া প্রবেশ করিল।

রাখাল কহিল, বাঃ—বেশ তো! এরই নাম জরুরী পরামর্শ? না?

কোথাও বেরুচ্চো নাকি?

না, সমস্ত বিকেলটা ঘরে বসে থাকবো!

না, সে হবে না। বিকেলের এখনো ঢের দেরি—বসো।

না হে না—তার জো নেই। পরামর্শ কাল হবে। এই বলিয়া সে গেঞ্জির উপরে পাঞ্জাবি চড়াইল।

তারক তাহার প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তা হলে পরামর্শ থাকল। কাল সকালে আমি অনেকদূরে গিয়ে পড়বো। হয়তো আর কখনো—না, তা না হোক—অনেকদিন আর দেখা হবার সম্ভাবনা রইল না।

রাখাল ধপ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল,—তার মানে?

তার মানে আমি একটা চাকরি পেয়েছি। বর্ধমান জেলার একটা গ্রামে। নতুন ইস্কুলের হেডমাস্টারি।

প্রাইমারি?

না, হাই ইস্কুল।

হাই ইস্কুল? ম্যাট্রিক? মাইনে?

লিখচে তো নব্বুই টাকা। আর একটা ছোটখাটো বাড়ি—থাকবার জন্যে অমনি দেবে।

রাখাল হাঃ হাঃ করিয়া একচোট হাসিয়া লইল, পরে কহিল, ধাপ্পা—ধাপ্পা—সব ধাপ্পাবাজি। কে তামাশা করেচে। এ তো একশো টাকার ওপরে গেল হে। কেন, তারা কি আর লোক পেলে না?

তারক কহিল, বোধ হয় পায়নি। পাড়াগাঁয়ে সহজে কি কেউ যেতে চায়?

না, চায় না! একশো টাকায় যমের বাড়ি যেতে চায়, এ তো বর্ধমান! ইঃ—তিনটে দশ। আর দেরি করা চলে না। না না,—পাগলামি রাখো,—কাল সকালে সব কথা হবে, দেখা যাবে কে লিখেচে, আর কি লিখেচে। এটা বুঝচো না যে একশো টাকা! অজানা—অচেনা—দ্যুৎ! অ্যাপ্লিকেশনের জবাব তো? ও ঢের জানি, হাড়ে ঘুণ ধরে গেছে। দ্যুৎ! চললুম। বলিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল।

তারক মিনতি করিয়া কহিল, আর দশ মিনিট ভাই। সত্যি-মিছে যাই হোক, রাতের গাড়িতে যেতেই হবে।

রাখাল বলিল, কেন শুনি? কথাটা আমার বিশ্বাস হলো না বুঝি?

তারক ইহার জবাব দিল না, কহিল,—অথচ এমনি অভ্যাস হয়ে গেছে যে, দিনান্তে একবার দেখা না হলে প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে ওঠে।

রাখাল কহিল, আমারই তা হয় না বুঝি?

ইহার পরে দুজনেই ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল।

তারক বলিল, বেঁচে যদি থাকি, বড়দিনের ছুটিতে হয়তো আবার দেখা হবে। ততদিন রাখালের চোখে সামান্যতেই জল আসিয়া পড়ে, তাহার চোখ ছলছল করিতে লাগিল।

তারক আঙুল হইতে একটা বহু ব্যবহৃত সোনার শিল-আঙটি খুলিয়া টেবিলের একধারে রাখিয়া দিল, কহিল, ভাই রাখাল, তোমার কাছে আমি কুড়িটা টাকা ধারি —

কথাটা শেষ হইল না—এ কি তার বন্ধক নাকি? বলিতে বলিতে রাখাল ছোঁ মারিয়া আঙটিটা তুলিয়া লইয়া ঝোঁকের মাথায় জানালা দিয়া ফেলিয়া

দিতেছিল, তারক হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, আরে না না, বন্ধক নয়—বেচলে এর দাম দশটা টাকাও কেউ দেবে না,—এ আমার স্মরণ-চিহ্ন, যাবার আগে তোমার হাতে নিজের হাতে পরিয়ে যাবো,—এই বলিয়া সে জোর করিয়া বন্ধুর আঙুলে পরাইয়া দিল। বলিল, দশ মিনিট সময় চেয়ে নিয়েছিলাম, কিন্তু পনর মিনিট হয়ে গেছে। এবার তোমার ছুটি। নাও, পোশাক-টোশাক পরে নাও,—এই বলিয়া সে হাসিল।

মহিলা-মজলিসের চেহারা তখন রাখালের মনের মধ্যে ম্লান হইয়া গেছে, সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ড্রেসিং টেবিলের আয়নার পাশাপাশি দুই বন্ধুর ছবি পড়িল। রাখাল বেঁটে, গোলগাল, গৌরবর্ণ, তাহার পরিপুষ্ট মুখের 'পরে একটি সহৃদয় সরলতা যেন অত্যন্ত ব্যক্ত—মানুষটি যে সত্যই ভালোমানুষ তাহাতে সন্দেহ জন্মায় না, কিন্তু তারকের চেহারা সে শ্রেণীরই নয়। সে দীর্ঘাকৃতি, কৃশ, গায়ের রংটা প্রায় কালোর ধার ঘেঁষিয়া আছে। বাহিরে প্রকাশিত নয় বটে, কিন্তু ঠাহর করিলেই সন্দেহ হয়, লোকটি বোধ হয় অতিশয় বলিষ্ঠ। মুখ দেখিয়া হঠাৎ কোন ধারণা করা কঠিন, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে একটি আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য আছে। আয়ত বা সুন্দর নয়, কিন্তু মনে হয় যেন নির্ভর করা চলে। সুখে-দুঃখে ভার সহিবার ইহার শক্তি আছে। বয়স সাতাশ-আটাশ, রাখালের চেয়ে দু-তিন বছরের ছোট, কিন্তু কিসে যেন তাহাকেই বড় বলিয়া ভ্রম হয়।

রাখাল হঠাৎ জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, কিন্তু আমি বলচি তোমার যাওয়া উচিত নয়।

কেন?

কেন আবার কি? একটা হাই ইস্কুল চালানো কি সোজা কথা! ম্যাট্রিক ক্লাসের ছেলে পড়াতে হবে, তাদের পাস করাতে হবে—সে কোয়ালিফিকেশন কি—

তারক কহিল, কোয়ালিফিকেশন তারা চায়নি, চেয়েছে য়ুনিভারসিটির ছাপছোপের বিবরণ। সে-সব মার্কা কর্তৃপক্ষদের দরবারে পেশ করেছি, আর্জি মঞ্জুর হয়েছে। ছেলে পড়াবার ভার আমার,কিন্তু পাস করার দায় তাদের।

রাখাল ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে কহিল, সে বললে হয় না হে, হয় না। পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল, কিন্তু আমাকেও তো তুমি সত্যি কথা বলোনি তারক। বলেছিলে পড়াশুনা তেমন কিছু করোনি।

তারক হাসিয়া কহিল, সে এখনও বলচি। ছাপছোপ আছে, কিন্তু পড়াশুনা করিনি। তার সময় পেলাম কৈ? পড়া-মুখস্থর পালা সাঙ্গ হতেই লেগে গেলাম চাকরির উমেদারিতে, কাটলো বছর দু'ত্তিন—তার পরে দৈবাৎ তোমার দয়া পেয়ে কলকাতায় এসে দুটো খেতে-পরতে পাচ্চি।

দ্যাখো তারক, ফের যদি তুমি—

অকস্মাৎ আয়নার দুই বন্ধুর মাথার উপরে আর একটি ছায়া আসিয়া পড়িল। নারীমূর্তি। উভয়েই ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, একটি অপরিচিতা মহিলা ঘরের প্রায় মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মহিলাই বটে। বয়স হয়তো যৌবনের আর এক প্রান্তে পা দিয়াছে, কিন্তু সে চোখেই পড়ে না। বর্ণ অত্যন্ত গৌর, একটু রোগা, কিন্তু সর্বাঙ্গ ঘেরিয়া মর্যাদার সীমা নাই। ললাটে আয়তির চিহ্ন। পরনে গরদের শাড়ি, হাতে গলায় প্রচলিত সাধারণ দু-চারখানি গহনা, শুধু যেন সামাজিক রীতি-পালনের জন্যই। দুই বন্ধুই কিছুক্ষণ স্তব্ধবিস্ময়ে চাহিয়া রাখাল চৌকি ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল,—এ কি! নতুন-মা যে! তাহার পরেই সে উপুড় হইয়া তাঁহার পায়ের উপর গিয়া পড়িল, দুই পায়ে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম যেন তাহার আর শেষ হইতেই চাহে না।

উঠিয়া দাঁড়াইলে রমণী হাত দিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন। তিনি চৌকিতে বসিলে রাখাল মাটিতে বসিল এবং তারক উঠিয়া গিয়া বন্ধুর পাশে বসিল।

হঠাৎ চিনতে পারিনি মা।

না পারবারই ত কথা রাজু।

মনে মনে ভাবছি, চোখ পড়ে গেল আপনার চুলের ওপর। রাঙ্গা আঁচলের পাড় ডিঙিয়ে পায়ে এসে ঠেকেচে। এমনটি এ-দেশে আর কারু দেখিনি। তখন সবাই বলত এর খানিকটা কেটে নিয়ে এবার প্রতিমা সাজানো হবে। মনে পড়ে মা?

তিনি একটুখানি হাসিলেন, কিন্তু কথাটা চাপা দিলেন। বললেন, রাজু, ইনিই বুঝি তোমার নতুন বন্ধু? নামটি কি?

রাখাল বলিল, তারক চাটুয্যে। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?

তিনি এ প্রশ্নও চাপা দিলেন, শুধু বললেন, শুনেচি তোমাদের খুব ভাব।

রাখাল বলল, হাঁ, কিন্তু সে বুঝি আর টেঁকে না। ও আজই চলে যেতে চাচ্চে বর্ধমানের কোন্ এক পাড়াগাঁয়ে,—ইস্কুলের হেডমাস্টারি জুটেছে ওর, কিন্তু আমি বলি, তুমি এম. এ. পাস করেছো যখন তখন মাস্টারির ভাবনা নেই, এখানেই একটা যোগাড় হয়ে যাবে। ও কিন্তু ভরসা করতে চায় না। বলুন তো কি অন্যায়!

শুনিয়া তিনি মৃদুহাস্যে কহিলেন, তোমার আশ্বাসে বিশ্বাস করতে না পারাকে অন্যায় বলতে পারিনে রাজু। তারকবাবু কি সত্যিই আজ চলে যাচ্চেন?

রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, এঁরা কারা রাজু? মেয়ের সৎমা তো? তাঁর আপত্তি করার কি অধিকার?

রাখাল চুপ করিয়া রহিল। তিনি নিজেও ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া কহিলেন, তোমাকে তা হলে একবার বাগবাজারে যেতে হবে, ছেলের মামার কাছে। শুনেচি, ও-পক্ষে তিনিই কর্তা। তাঁকে মেয়ের মায়ের ইতিহাসটা জানিয়ে বারণ করে দিতে হবে। আমার বিশ্বাস এতে কাজ হবে; যদি না হয়, তখন সে ভার রইলো আমার। আমি রাত্রি এগারটার পর আবার আসবো বাবা,—এখন

উঠি। এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাখাল ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, কিন্তু তার পরে যে রেণুর আর বিয়ে হবে না নতুন-মা। জানাজানি হয়ে গেলে—

না-ই হোক বাবা, সে-ও ভালো।

রাখাল আর তর্ক করিল না, হেঁট হইয়া আগের মতই ভক্তিভরে প্রণাম করিল। তাহার দেখাদেখি এবার তারকও পায়ের কাছে আসিয়া নমস্কার করিল। তিনি দ্বার পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াই হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, তারক, তোমাকে বলা হয়তো আমার উচিত নয়, কিন্তু তুমি রাজুর বন্ধু, যদি ক্ষতি না হয়, এ দুটো দিন কোথাও যেও না। এই আমার অনুরোধ।

তারক মনে মনে বিস্মিত হইল, কিন্তু সহসা জবাব দিতেও পারিল না। কিন্তু এ জন্য তিনি অপেক্ষাও করিলেন না, বাহির হইয়া গেলেন। রাখাল জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল তিনি পায়ে হাঁটিয়াই গেলেন, শুধু গলির বাঁকের কাছে দরোয়ানের মতো কে-একজন অপেক্ষা করিতেছিল, সে তাঁহাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করিল।

দুই

রাখাল জামা খুলিয়া ফেলিল।

তারক প্রশ্ন করিল, বেরুবে না?

না। কিন্তু তুমি? যাচ্চো আজই বর্ধমানে?

না। তুমি কি করো দেখবো,—স্বেচ্ছায় না করো জোর করে করাবো।

চায়ের কেৎলিটা আর একবার চড়িয়ে দিই,—কি বলো?

দাও।

কিছু জলখাবার কিনে আনি গে—কি বলো?

রাজী।

তাহলে তুমি চড়াও জলটা, আমি যাই দোকানে। এই বলিয়া সে কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়া চটি পায়ে বাহির হইয়া গেল। গলির মোড়েই খাবারের দোকান, নগদ পয়সার প্রয়োজন হয় না, ধার মেলে।

খাবার খাওয়া শেষ হইল। সন্ধ্যার পর আলো জ্বালিয়া চায়ের পেয়ালা লইয়া দুই বন্ধু টেবিলে বসিল।

তারক প্রশ্ন করিল, তার পরে?

রাখাল বলিল, আমার বয়স তখন দশ কি এগারো। বাবা চার-পাঁচদিন আগে একবেলার কলেরায় মারা গেছেন; সবাই বললে, বাবুদের মেজমেয়ে সবিতা বাপের বাড়িতে পুজো দেখতে এসেছে, তুই তাকে গিয়ে ধর। বাবুদের বুড়ো সরকার আমাকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে অন্দরে গিয়ে উপস্থিত হলো। তিনি পইঠের একধারে বসে কুলোয় করে তিল বাছছিলেন, সরকার বললে, মেজমা, ইটি বামুনের ছেলে, তোমার নাম শুনে ভিক্ষে চাইতে এসেছে। হঠাৎ বাপ মারা গেছে,—ত্রিসংসারে এমন কেউ নেই যে, এ দায় থেকে ওকে উদ্ধার করে দেয়।

শুনে তাঁর চোখ ছলছল করে এলো, বললেন, তোমার কি আপনার কেউ নেই? বললুম, মাসী আছে, কিন্তু কখনো দেখিনি। জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রাদ্ধ করতে কত টাকা লাগবে? এটা শুনেছিলুম, বললুম, পুরুতমশাই বলেন পঞ্চাশ টাকা লাগবে। তিনি কুলোটা রেখে উঠে গেলেন, আর একটা কথাও জিজ্ঞেসা করলেন না। একটু পরে ফিরে এসে আমার উত্তরীয়ের আঁচলে দশ টাকার পাঁচখানি নোট বেঁধে দিয়ে বললেন, তোমার নাম কি বাবা? বললুম, রাজু, ভালো নাম রাখাল-রাজ। বললেন, তুমি যাবে বাবা, আমার সঙ্গে আমার শ্বশুরবাড়ির দেশে? সেখানে ভালো ইস্কুল আছে, কলেজ আছে, তোমার কোন কষ্ট হবে না। যাবে? আমাকে জবাব দিতে হলো না, সরকারমশাই যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল, বললে, যাবে মা, যাবে, এক্ষুনি যাবে। এতবড় ভাগ্য ও কোথায় কার কাছে পাবে? ওর চেয়ে অসহায় এ গাঁয়ে আর কেউ নেই মা,—মা-দুর্গা তোমাকে ধনে-পুত্রে চিরসুখী করবেন। এই বলে বুড়ো সরকার হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল।

শুনিয়া তারকের চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল।

রাখাল বলিতে লাগিল, পিতৃশ্রাদ্ধ ও মহামায়ার পূজো দুই-ই শেষ হলো। ত্রয়োদশীর দিন যাত্রা করে চিরদিনের মত দেশ ছেড়ে তাঁর স্বামিগৃহে এসে আশ্রয় নিলুম। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী; তাই সবাই বলে নতুন-মা, আমিও বললুম নতুন-মা। শ্বশুর-শাশুড়ি নেই, কিন্তু বহু পরিজন। অবস্থা সচ্ছল, ধনী বললেও চলে। এ বাড়ির শুধু ত তিনি গৃহিণীই নন, তিনিই গৃহকর্ত্রী। স্বামীর বয়স হয়েছে, চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে, কিন্তু যেন ছেলে-মানুষের মত সরল। এমন মিষ্টি মানুষ আমি আর কখনো দেখিনি—দেখবামাত্রই যেন ছেলের আদরে আমাকে তুলে নিলেন। দেশে জমিজমা চাষবাসও ছিল, দু-একখানি ছোটোখাটো তালুকও ছিল, আবার কলকাতায় কি-যেন একটা কারবারও চলছিল। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই তিনি থাকতেন বাড়িতে, তখন দিনের অর্ধেকটা কাটত তাঁর পূজোর ঘরে,—দেব-সেবায়, পূজো-আহ্নিকে, জপ-তপে।

আমি স্কুলে ভর্তি হলাম। বই-খাতা-পেন্সিল-কাগজ-কলম এলো, জামা-কাপড়-জুতো-মোজা অনেক জুটলো, ঘরে মাস্টার নিযুক্ত হলো, যেন আমি এ-বাড়িরই ছেলে,—নিরাশ্রয় বলে মা যে সঙ্গে করে এনেছিলেন এ কথা সবাই গেল ভুলে। তারক, এ জীবনে সে-সুখের দিন আর ফিরবে না। আজও কতদিন আমি চুপ করে শুয়ে সেই-সব কথাই ভাবি। এই বলিয়া সে চুপ করিল এবং বহুক্ষণ পর্যন্ত কেমন যেন একপ্রকার বিমনা হইয়া রহিল।

তারক কহিল, রাখাল, কি জানি কেন আমার বুকের ভেতরটা যেন ঢিপঢিপ করচে। তার পরে?

রাখাল বলিল, তার পরে এমন অনেকদিন কেটে গেল। ইস্কুলে ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে আই. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছি, এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন সমস্ত উলটে-পালটে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। ভাঙতে-চুরতে কোথাও কিছু আর বাকি রহিল না। এই বলিয়া সে নীরব হইল।

কিন্তু চুপ করিয়াও থাকিতে পারিল না, কহিল, এতদিন কাউকে কোন কথা বলি নি। আর বলবই বা কাকে? আজও বলা উচিত কিনা জানিনে, কিন্তু বুকের ভেতরটায় যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে—

চাহিয়া দেখিল, তারকের মুখে অপরিসীম কৌতূহল, কিন্তু সে প্রশ্ন করিল না। রাখাল নিজের সঙ্গে ক্ষণকাল লড়াই করিয়া অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তারক, নিজের মাকে দেখিনি, মা বলতে আমার নতুন-মাকেই মনে পড়ে। এই আমার সেই নতুন-মা। এতক্ষণে সত্যই তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। প্রথমে দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, তারপরে বড় বড় কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

মিনিট দুই-তিন পরে চোখ মুছিয়া নিজেই শান্ত হইল, কহিল, উনি তোমাকে দিন-দুই থাকতে বলে গেলেন, হয়তো তোমাকে তাঁর কাজ আছে। বারো-তেরো বছর পূর্বের কথা—সেদিন ব্যাপারটা কি ঘটেছিল তোমাকে বলি। তার পরে থাকা না-থাকা তোমার বিবেচনা।

তারক চুপ করিয়া ছিল, চুপ করিয়াই রহিল।

রাখাল বলিতে লাগিল, তখন কে-একজন ওঁদের কলকাতার আত্মীয় প্রায়ই বাড়িতে আসতেন, কখনো দু-একদিন, কখনো বা তাঁর সপ্তাহ কেটে যেতো। সঙ্গে আসত তেল-মাখাবার খানসামা, তামাক সাজবার ভৃত্য, ট্রেনে খবরদারি করবার দরোয়ান—আর নানা রকমের কত যে ফল-মূল-মিষ্টান্ন তার ঠিকানা নেই। পাল-পার্বণ উপলক্ষে উপহারের ত পরিমাণ থাকতো না। তাঁর সঙ্গে ছিল এঁদের ঠাট্টার সুবাদ। শুধু কোন সম্পর্কের হিসেবেই নয়, বোধ করি বা ধনের হিসেব থেকেও এ বাড়িতে তাঁর আদর-আপ্যায়ন ছিল প্রভূত। কিন্তু বাড়ির মেয়েরা যেন ক্রমশঃ কি একপ্রকার সন্দেহ করতে লাগল। কথাটা ব্রজবাবুর কানে গেল, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করা ত দূরের কথা, উলটে করলেন রাগ। দূর-সম্পর্কের এক পিসতুতো বোনকে যেতে হলো তার শ্বশুরবাড়ি। শুনেচি, এমনিই নাকি হয়ে থাকে—এই হলো দুনিয়ার সাধারণ নিয়ম। তা ছাড়া, এইমাত্র ত ওঁর নিজের মুখেই শুনতে পেলে, কর্তার মতো সরলচিত্ত ভালোমানুষ লোক সংসারে বিরল। সত্যিই তাই। কারও কোন কলঙ্ক মনের মধ্যে স্থান দেওয়াই তাঁর কঠিন। আর, সন্দেহ কাকে, না নতুন-মাকে, ছিঃ!

দিন কাটে, কথাটা গেল বাহ্যতঃ চাপা পড়ে, কিন্তু বিদ্বেষ ও বিষের বীজাণু আশ্রয় নিলে পরিজনদের নিভৃত গৃহকোণে। যাদের সবচেয়ে বড় করে আশ্রয় দিয়েছিলেন একদিন নতুন-মাই নিজে,—তাদেরই মধ্যে। কেবল আমাকেই যে একদিন ‘যাবে বাবা আমার কাছে?’ বলে ঘরে ডেকে এনেছিলেন তাই নয়, এনেছিলেন আরও অনেককেই। এ ছিল তাঁর স্বভাব। তাই পিসতুতো বোন গেল চলে, কিন্তু পিসী রইলেন তার শোধ নিতে।

তারক শুধু ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। রাখাল কহিল, ইতিমধ্যে চক্রান্ত যে কত নিবিড় ও হিংস্র হয়ে উঠছিল তারই খবর পেলাম অকস্মাৎ একদিন গভীর রাতে। কি একপ্রকার চাপাগলার কর্কশ কোলাহলে ঘুম ভেঙ্গে ঘরের বাইরে এসে

দেখি সুমুখের ঘরের কবাটে বাইরে থেকে শেকল দেওয়া। উঠানের মাঝখানে গোটা পাঁচ-ছয় লণ্ঠন। বারান্দার একধারে বসে স্তব্ধ অধোমুখে ব্রজবাবু এবং সেই ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে নবীনবাবু—কর্তার খুড়তুতো ছোটভাই—রুদ্ধদ্বারে অবিরত ধাক্কা দিয়ে কঠিনকণ্ঠে পুনঃ পুনঃ হাঁকচেন, রমণীবাবু, দোর খুলুন। ঘরটা আমরা দেখব। বেরিয়ে আসুন বলচি!

ইনি কলকাতার আড়ত থেকে হাজার কুড়ি-পঁচিশ টাকা উড়িয়ে কিছুকাল হল বাড়িতে এসে বসেছেন।

বাড়ির মেয়েরা বারান্দার আশেপাশে দাঁড়িয়ে, মনে হল চাকররা কাছাকাছি কোথায় যেন আড়ালে অপেক্ষা করে আছে;—ব্যাপারটা ঘুম-চোখে প্রথমটা ঠাওর পেলাম না,—কিন্তু পরক্ষণেই সমস্ত বুঝলাম। এখনি ভীষণ কি-একটা ঘটবে ভেবে ভয়ে সর্বাঙ্গ ঘামে ভেসে গেল, চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো; হয়ত মাথা ঘুরে সেইখানে পড়ে যেতাম, কিন্তু তা আর হল না। দোর খুলে রমণীবাবুর হাত ধরে নতুন-মা বেরিয়ে এলেন। বললেন, তোমরা কেউ এঁর গায়ে হাত দিয়ো না, আমি বারণ করে দিচ্ছি। আমরা এখুনি বাড়ি থেকে বার হয়ে যাচ্ছি।

হঠাৎ যেন একটা বজ্রাঘাত হয়ে গেল। এ কি সত্য সত্যই এ-বাড়ির নতুন-মা! কিন্তু তাঁদের অপমান করবে কি, বাড়িসুদ্ধ সকলে যেন লজ্জায় মরে গেল। যে-যেখানে ছিল সেইখানেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে—তাঁরা সদর দরজা যখন পার হয়ে যান, কর্তা তখন অকস্মাৎ হাউহাউ করে কেঁদে উঠে বললেন, নতুন-বৌ, তোমার রেণু রইল যে! কাল তাকে আমি কি দিয়ে বোঝাব!

নতুন-মা একটা কথাও বললেন না, নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বার হয়ে গেলেন। সেদিন সেই রেণু ছিল তিন বছরের, আজ বয়স হয়েছে তার ষোল। এই তেরো বচ্ছর পরে আজ হঠাৎ দেখা দিলেন মা, মেয়েকে বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্যে।

এইবার এতক্ষণ পরে কথা কহিল তারক—নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আর এই তেরোটা বচ্ছর মেয়েকে মা চোখের আড়াল করেন নি। এবং শুধু মেয়েই নয়, খুব সম্ভব, তোমাদের কাউকেই না।

রাখাল কহিল, তাই তো মনে হচ্ছে ভাই। কিন্তু কখনো শুনেছ এমন ব্যাপার?

না শুনিনি, কিন্তু বইয়ে পড়েচি। একখানা ইংরিজি উপন্যাসের আভাস পাচ্চি। কেবল আশা করি উপসংহারটা যেন না আর তার মত হয়ে দাঁড়ায়।

রাখাল কহিল, নতুন-মার ওপর বোধ করি এখন তোমার ঘৃণা জন্মালো তারক?

তারক কহিল, জন্মানোই তো স্বাভাবিক রাখাল।

রাখাল চুপ করিয়া রহিল। জবাবটা তাহার মনঃপূত হইল না, বরঞ্চ মনের মধ্যে গিয়া কোথায় যেন আঘাত করিল। খানিক পরে বলিল, এর পরে দেশে থাকা আর চলল না। ব্রজবাবু কলকাতায় এসে আবার বিবাহ করলেন,—সেই অবধি এখানেই আছেন।

আর তুমি?

রাখাল বলিল, আমিও সঙ্গে এলাম। পিসীমা তাড়াবার সুপারিশ করে বললেন, ব্রজ, সেই হতভাগীই এই বালাইটাকে জুটিয়ে এনেছিল। ওটাকে দূর করে দে।

নতুন-মার স্নেহের পাত্র বলে আমার ’পরে পিসিমা সদয় ছিলেন না।

ব্রজবাবু শান্ত মানুষ, কিন্তু কথা শুনে তাঁর চোখের কোণটা একটু রুক্ষ হয়ে উঠলো, তবু শান্তভাবেই বললেন, ওই ত তার রোগ ছিল পিসীমা। আপদ-বালাই ত আর একটি জুটোয় নি—কেবল ও-বেচারাকে তাড়ালেই কি আমাদের সুবিধে হবে?

পিসীমার নিজেদের কথাটা হয়ে গেছে তখন অনেকদিনের পুরনো—সে বোধ হয় আর মনে নেই। বললেন, তবে কি ওকে ভাত-কাপড় দিয়ে বরাবর পুষতেই হবে নাকি? না না, ও যেখানের মানুষ সেখানে যাক, ওর মুখ থেকে বাপ-মা মেয়ের কীর্তি-কাহিনী শুনুক। নিজেদের বংশ-পরিচয়টা একটুখানি পাক।

ব্রজবাবু এবার একটুখানি হাসলেন, বললেন, ও ছেলেমানুষ, গুছিয়ে তেমন বলতে পারবে না পিসীমা, তার বরঞ্চ তুমি অন্য ব্যবস্থা করো।

জবাব শুনে পিসীমা রাগ করে চলে গেলেন, বলে গেলেন, যা ভাল বোঝ করো, আমি আর কিছুর মধ্যেই নেই।

নতুন-মা যাবার পরে এ-বাড়িতে পিসিমার প্রভাবটা কিছু বেড়ে উঠেছিল। সবাই জানতো তাঁর বুদ্ধিতেই এতবড় অনাচারটা ধরা পড়েচে। এতকালের লক্ষ্মী-শ্রী ত যেতেই বসেছিল। নবীনবাবুর দরুন যে কারবারের লোকসান, তার মূলেও দাঁড়ালো এই গোপন পাপ। নইলে কৈ এমন মতি-বুদ্ধি ত নবীনের আগে হয়নি! পিসিমা বলতেও আরম্ভ করেছিলেন তাই। বলতেন, ঘরের লক্ষ্মীর সঙ্গে যে এ-সব বাঁধা। তিনি চঞ্চল হলে যে এমন হতেই হবে? হয়েছেও তাই।

তারক অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কলকাতায় এসে ওঁদের বাড়িতেই কি তুমি থাকতে?

হাঁ, প্রায় বছর-দশেক।

চলে এলে কেন?

রাখাল ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বলিল, আর সুবিধে হল না।

তার বেশি আর বলতে চাও না?

রাখাল আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, বলে লাভও নেই, লজ্জাও করে।

তারক আর জানিতে চাহিল না, চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। শেষে বলিল, তোমার নতুন-মা যে তোমাকে এতবড় একটা ভার দিয়ে গেলেন তার কি? যাবে না একবার ব্রজবাবুর ওখানে?

সেই কথাই ভাবছি। না হয় কাল—

কাল? কিন্তু, তিনি যে বলে গেলেন আজ রাত্রেই আবার আসবেন, তখন কি তাঁকে বলবে?

রাখাল হাসিয়া মাথা নাড়িল।

তারক প্রশ্ন করিল, মাথা নাড়ার মানে? বলতে চাও তিনি আসবেন না?

তাই ত মনে হয়। অন্ততঃ অতরাত্রে আসতে পারা সম্ভবপর মনে করিনে।

এবার তারক অধিকতর গম্ভীর হইয়া বলিল, আমি করি। সম্ভব না হলে তিনি কিছুতে বলতেন না। আমার বিশ্বাস তিনি আসবেন, এবং ঠিক এগারোটাতেই আসবেন। কিন্তু তখন তোমার আর কোন জবাব থাকবে না।

কেন?

কেন কি? তাঁর এতবড় দুশ্চিন্তাকে অগ্রাহ্য করে তুমি একটা পা-ও বাড়াও নি এ কথা তুমি উচ্চারণ করবে কোন্ মুখে? সে হবে না রাখাল, তোমাকে যেতে হবে।

রাখাল কয়েক মুহূর্ত তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তারপরে ধীরে ধীরে বলিল, আমি গেলেও কিছু হবে না তারক। আমার কথা ও-বাড়ির কেউ কানেও তুলবে না।

তার কারণ?

কারণ, পাগল-বরের পক্ষেও যেমন এক মামা কর্তা আছেন, কনের দিকেও তেমনি আর এক মামা বিদ্যমান, ব্রজবাবুর এ পক্ষের বড়কুটুম। অতি শক্তিমান পুরুষ। বস্তুতঃ সে মামার কর্তৃত্বের বহর জানিনে, কিন্তু এ মামার পরাক্রম বিলক্ষণ জানি। বাল্যকালে পিসীমার অতবড় সুপারিশেও আমাকে

নড়াতে পারেনি, এঁর চোখের একটা ইশারার ধাক্কা সামলানো গেল না, পুঁটুলি হাতে বিদায় নিতে হল। এই বলিয়া সে একটু হাসিয়া কহিল, ভগবান জুটিয়েছেন ভালো। না ভাই বন্ধু, আমি অতি নিরীহ মানুষ—ছেলে পড়াই, রাঁধি-বাড়ি, খাই, বাসায় এসে শুয়ে পড়ি। ফুরসত পেলে অবলা সবলা নির্বিচারে বড়লোকের ফাই-ফরমাস খাটি—বকশিশের আশা করিনে—সে-সব ভাগ্যবানদের জন্যে। নিজের কপালের দৌড় ভাল করেই জেনে রেখেচি—ওতে দুঃখও নেই, একরকম সয়ে গেছে। দিন মন্দ কাটে না, কিন্তু তাই বলে মল্লভূমি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মামায়-মামায় কুস্তি লড়িয়ে তার বেগ সংবরণ করতে পারবো না।

শুনিয়া তারক হাসিয়া ফেলিল। রাখালকে সে যতটা হাবা-বোকা ভাবিত, দেখিল তাহা নয়। জিজ্ঞাসা করিল, দু-পক্ষেই মামা রয়েছে বলে মল্লযুদ্ধ বাধবে কেন?

রাখাল কহিল, তা হলে একটু খুলে বলতে হয়। মামামশায় আমাকে বাড়িটা ছাড়িয়েছেন, কিন্তু তার মায়াটা আজও ঘোচাতে পারেন নি, কাজেই অল্পস্বল্প খবর এসে কানে পৌঁছয়। শোনা গেল, ভগিনীপতির কন্যাদায়ে শ্যালকের আরামেই বেশী বিঘ্ন ঘটাচ্ছে—এ ঘটকালিও তাঁর কীর্তি। সুতরাং, এ-ক্ষেত্রে আমাকে দিয়ে বিশেষ কিছু হবে না, এবং সম্ভবতঃ কাউকে দিয়েই না। পাকা-দেখা, আশীর্বাদ, গায়ে-হলুদ পর্যন্ত হয়ে গেছে, অতএব এ বিবাহ ঘটবেই।

তারক কহিল, অর্থাৎ, ও-পক্ষের মামাকে কন্যার মায়ের কাহিনী শোনাতেই হবে; এবং তার পরে ঘটনাটা মুখে মুখে বিস্তারিত হতেও বিলম্ব ঘটবে না, এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল ও-মেয়ের ভালো-ঘরে আর বিয়েই হবে না।

রাখাল বলিল, আশঙ্কা হয় শেষ পর্যন্ত এমনিই কিছু-একটা দাঁড়াবে।

কিন্তু মেয়ের বাপ ত আজও বেঁচে আছেন?

না, বাপ বেঁচে নেই, শুধু ব্রজবাবু বেঁচে আছেন।

তারক ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, রাখাল, চলো না একবার যাই, বাপটা একেবারেই মরেচে, না লোকটার মধ্যে এখনো কিছু বাকী আছে, দেখে আসি গে।

তুমি যাবে?

ক্ষতি কি? বলবে ইনি পাত্রের প্রতিবেশী—অনেক কিছুই জানেন।

রাখাল হাসিয়া বলিল, ভালো বুদ্ধি। প্রথমতঃ, সে সত্যি নয়, দ্বিতীয়তঃ, জেরার দাপটে তোমার গোলমেলে উত্তরে তাঁদের ঘোর সন্দেহ হবে তুমি পাড়ার লোক, ব্যক্তিগত শত্রুতা-বশে ভাঙ্‌চি দিতে এসেচো। তাতে কার্যসিদ্ধি ত হবেই না বরঞ্চ উলটো ফল দাঁড়াবে।

তাইতো! তারক মনে মনে আর একবার রাখালের সাংসারিক বুদ্ধির প্রশংসা করিল, বলিল, সে ঠিক। আমাদের জেরায় ঠকতে হবে। নতুন-মার কাছে আরও বেশি খবর জেনে নেওয়া উচিত ছিল। বেশ, আমাকে তোমার একজন বন্ধু বলেই পরিচয় দিও।

হাঁ, দিতে হলে তাই দেবো।

তারক বলিল, এ-বিয়ে বন্ধ করার চেষ্টায় তোমার সাহায্য করি এই আমার ইচ্ছে। আর কিছু না পারি, এই মামাটিকে একবার চোখে দেখেও আসতে পারবো। আর অদৃষ্ট প্রসন্ন হলে শুধু ব্রজবাবুই নয়, তাঁর তৃতীয় পক্ষেরও হয়তো দেখা মিলে যেতে পারে।

রাখাল বলিল, অন্ততঃ অসম্ভব নয়।

তারক প্রশ্ন করিল, এই মহিলাটি কেমন রাখাল?

রাখাল কহিল, বেশ ফরসা মোটা-সোটা পরিপুষ্ট গড়ন, অবস্থাপন্ন বাঙালী-ঘরে একটু বয়স হলেই ওঁরা যেমনটি হয়ে ওঠেন তেমনি।

কিন্তু মানুষটি?

মানুষটি ত বাঙালী-ঘরের মেয়ে। সুতরাং, তাঁদেরই আরও দশজনের মতো। কাপড়-গয়নার প্রগাঢ় অনুরাগ, উৎকট ও অন্ধ সন্তান-বাৎসল্য, পরদুঃখে সকাতর অশ্রুবর্ষণ, দু-আনা চার-আনা দান এবং পরক্ষণেই সমস্ত বিস্মরণ। স্বভাব মন্দ নয়,—ভালো বললেও অপরাধ হয় না। অল্পস্বল্প ক্ষুদ্রতা, ছোটখাটো উদারতা, একটু-আধটু—

তারক বাধা দিল—থামো থামো। এ-সব কি তুমি ব্রজবাবুর স্ত্রীর উদ্দেশেই শুধু বলচো, না সমস্ত বাঙালী-মেয়েদের লক্ষ্য করে যা মুখে আসচে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্চো,—কোন্‌টা?

রাখাল বলিল, দুটোই রে ভাই, দুটোই। শুধু তাৎপর্য গ্রহণ শ্রোতার অভিজ্ঞতা ও অভিরুচিসাপেক্ষ।

শুনিয়া তারক সত্যই বিস্মিত হইল, কহিল, মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার মনে মনে যে এতটা উপেক্ষা আমি জানতাম না। বরঞ্চ ভাবতাম যে রাখাল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, ঠিকই ভাবতে ভাই, ঠিকই ভাবতে। এতটুকু উপেক্ষা করিনে। ওঁরা ডাকলেই ছুটে যাই, না ডাকলেও অভিমান করিনে, শুধু দয়া করে খাটালেই নিজেকে ধন্য মানি। মহিলারা অনুগ্রহও করেন যথেষ্ট, তাঁদের নিন্দে করতে পারবো না।

তারক বলিল, অনুগ্রহ যাঁরা করেন তাঁদের একটু পরিচয় দাও ত শুনি।

রাখাল বলিল, এইবারেই ফেললে মুশকিলে। জেরা করলেই আমি ঘাবড়ে উঠি। এ-বয়সে দেখলাম শুনলাম অনেক, সাক্ষাৎ-পরিচয়ও বড় কম নেই, কিন্তু এমনি বিশ্রী স্মরণ-শক্তি যে কিছুই মনে থাকে না। না তাঁদের বাইরের চেহারা, না তাঁদের অন্তরের। সামনে বেশ কাজ চলে, কিন্তু একটু আড়ালে এসেই সব চেহারা লেপেমুছে একাকার হয়ে যায়। একের সঙ্গে অন্যের প্রভেদ ঠাউরে পাইনে!

তারক কহিল, আমরা পল্লীগ্রামের লোক, পাড়ার আত্মীয়-প্রতিবেশীর ঘরের দু'চারটি মহিলা ছাড়া বাইরের কাউকে চিনিও নে, জানিও নে। মেয়েদের

সম্বন্ধে আমাদের এই ত জ্ঞান। কিন্তু এই প্রকাণ্ড শহরের কত নতুন, কত বিচিত্র—

রাখাল হাত তুলিয়া থামাইয়া দিয়া বলিল, কিছু চিন্তা করো না তারক, আমি হদিশ বাত্‌লে দেব। পাড়াগাঁয়ের বলে যাঁদের অবজ্ঞা করচো কিংবা মনে মনে যাঁদের সম্বন্ধে ভয় পাচ্চো, তাঁদেরকেই শহরে এনে পাউডার রুজ প্রভৃতি একটু চেপে মাখিয়ে মাস-দুই খানকয়েক বাছা বাছা নাটক-নভেল এবং সেইসঙ্গে গোটা-পাঁচেক চলতি চালের গান শিখিয়ে নিও—ব্যস্‌! ইংরেজী জানে না? না জানুক, আগাগোড়া বলতে হয় না, গোটা-কুড়ি ভব্য কথা মুখস্থ করতে পারবে তো? তা হলেই হবে। তার পরে—

তারক বিরক্ত হইয়া বাধা দিল—তার পরেতে আর কাজ নেই রাখাল, থাক। এখন বুঝতে পারছি কেন তোমার গা নেই। ঐ মেয়েটির যেখানে যার সঙ্গেই বিয়ে হোক, তোমার কিছুই যায় আসে না। আসলে ওদের প্রতি তোমার দরদ নেই।

রাখাল সকৌতুকে প্রশ্ন করিল, দরদ হবে কি করে বলে দিতে পারো?

পারি। নির্বিচারে মেলামেশাটা একটু কম করো—যা হারিয়েছো তা হয়তো একদিন ফিরে পেতেও পারো। আর কেবল এইজন্যেই নতুন-মার অনুরোধ তুমি স্বচ্ছন্দে অবহেলা করতে পারলে।

রাখাল মিনিট-খানেক নিঃশব্দে তারকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পরিহাসের ভঙ্গীটা ধীরে ধীরে মিলাইয়া আসিল, বলিল, এইবার ভুল হলো। কিন্তু তোমার আগের কথাটায় হয়তো কিছু সত্যি আছে,—ওদের অনেকের অনেক-কিছু জানতে পারায় লাভের চেয়ে বোধ হয় ক্ষতিই হয় বেশী। এখন থেকে তোমার কথা শুনবো। কিন্তু যাঁদের সম্বন্ধে তোমাকে বলছিলাম তাঁরা সাধারণ মেয়ে—হাজারের মধ্যে ন'শ নিরানব্বই। তাঁর মধ্যে নতুন-মা নেই। কারণ, ঐ যে একটি বাকী রইলেন তিনিই উনি। ওঁকে অবহেলা করা যায় না,

ইচ্ছে করলেও না। কিসের জন্যে আজ তুমি বর্ধমান যেতে পারচো না, সে তুমি জানো না, কিন্তু আমি জানি। কিসের তাগাদায় ঠেলেঠুলে আমাকে এখুনি পাঠাতে চাও মামাবাবুর গহ্বরে, তার হেতু তোমার কাছে পরিষ্কার নয়। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি, ওর বিগত ইতিহাস শুনে ঐ যে কি না বলছিলে তারক, অমন স্ত্রীলোককে ঘৃণা করাই স্বাভাবিক—তোমার ঐ মতটি আর একদিন বদলাতে হবে। ওতে চলবে না।

তারক মুখে হাসি আনিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিল, না চললে জানাবো। কিন্তু ততক্ষণ নিজের কথা অপরের চেয়ে যে বেশী জানি, এটুকু দাবী করলে রাগ করো না রাখাল। কিন্তু এ তর্কে লাভ নেই ভাই—এ থাক। কিন্তু তোমার কাছে যে আজ পর্যন্ত একটি নারীও শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে টিকে আছেন এ মস্ত আশার কথা। কিন্তু আমরা ওঁর নাগাল পাবো না রাখাল, আমরা তোমার ঐ একটিকে বাদ দিয়ে বাকী ন'শ নিরানব্বইয়ের ওপরেই শ্রদ্ধা বাঁচিয়ে যদি চলে যেতে পারি, তাতেই আমাদের মতো সামান্য মানুষে ধন্য হয়ে যাবে।

রাখাল তর্ক করিল না—জবাব দিল না। কেবল মনে হইল সহসা সে যেন একটুখানি বিমনা হইয়া গেছে।

কি হে, যাবে?

চলো।

গিয়ে কি বলবে?

মোটের উপর যা সত্যি তাই। বলবো বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাওয়া গেছে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই ভালো।

দুই বন্ধু উঠিয়া পড়িল। রাখাল দরজায় তালা বন্ধ করিয়া যুক্তপাণি কপালে ঠেকাইয়া বলিল, দুর্গা! দুর্গা!

অতঃপর উভয়ে ব্রজবাবুর বাটীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

তারক হাসিয়া কহিল, আজ কোন কাজই হবে না। নামের মাহাত্ম্য টের পাবে।

তিন

পরদিন অপরাহ্নের কাছাকাছি দুই বন্ধু চায়ের সরঞ্জাম সম্মুখের লইয়া টেবিলে আসিয়া বসিল। টি-পটে চায়ের জল তৈরি হইয়া উঠিতে বিলম্ব দেখিয়া রাখাল চামচে ডুবাইয়া ঘন ঘন তাগিদ দিতে লাগিল।

তারক কহিল, নামের মাহাত্ম্য দেখলে তো?

রাখাল বলিল, অবিশ্বাস করে মা-দুর্গাকে তুমি খামকা চটিয়ে দিলে বলেই তো যাত্রাটা নিষ্ফল হলো,—নইলে হতো না।

প্রতিবাদে তারক শুধু হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

সত্যই কাল কাজ হয় নাই। ব্রজবাবু বাড়ি ছিলেন না, কোথায় নাকি নিমন্ত্রণ ছিল, এবং মামাবাবু কিঞ্চিৎ অসুস্থ থাকায় একটু সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া শয্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাখাল বাটীর মধ্যে দেখা করিতে গেলে, সে যে এখনো তাঁহাদের মনে রাখিয়াছে এই বলিয়া ব্রজবাবুর স্ত্রী বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ফিরিবার সময়ে অন্যের চোখের অন্তরালে রেণুও আসিয়া মৃদুকণ্ঠে ঠিক এই মর্মেই অনুযোগ জানাইয়াছিল।

তোমার বাবাকে বলতে ভুলো না যে, আমি সন্ধ্যার পরে কাল আবার আসবো। আমার বড় দরকার।

আচ্ছা, কিন্তু চাকরদেরও বলে যাও।

সুতরাং ব্রজবাবুর নিজস্ব ভৃত্যটিকেও এ কথা রাখাল বিশেষ করিয়া জানাইয়া আসিয়াছিল কিন্তু যথাসময়ে বাসায় পৌঁছিতে পারে নাই। আসিয়া দেখিল দরজার কড়ায় জড়ানো একটুকরো কাগজ, তাহাতে পেন্সিলে লেখা—আজ দেখা হলো না, কাল বৈকাল পাঁচটায় আসবো। ন-মা।

আজ সেই পাঁচটার আশাতেই দুই বন্ধুতে পথ চাহিয়া আছে। কিন্তু এখনো তার মিনিট-কুড়ি বাকী। তারক তাগাদা দিয়া কহিল, যা হয়েছে ঢালো। তাঁর আসবার আগে এ-সমস্ত পরিষ্কার করে ফেলা চাই।

কেন? মানুষে চা খায় এ কি তিনি জানেন না?

দেখো রাখাল, তর্ক করো না। মানুষে মানুষের অনেক-কিছু জানে, তবু তার কাছেই অনেক-কিছু সে আড়াল করে। গরু-বাছুরের এ প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া এ-গুলোই বা কি? এই বলিয়া অ্যাশ-ট্রে সমেত সিগারেটের টিনটা তুলিয়া ধরিল। বলিল, পৌরুষ করে এ-ও তাঁকে দেখাতে হবে নাকি?

রাখাল হাসিয়া ফেলিল—দেখে ফেললেও তোমার ভয় নেই, তারক, অপরাধী যে কে তিনি ঠিক বুঝতে পারবেন।

তারক খোঁচাটা অনুভব করিল। বিরক্তি চাপিয়া বলিল, তাই আশা করি। তবু, আমাকে ভুল বুঝলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু একদিন যাকে মানুষ করে তুলেছিলেন তাকে বুঝতে না পারলে তাঁর অন্যায় হবে।

রাখাল কিছুমাত্র রাগ করিল না, হাসিমুখে নিঃশব্দে চা ঢালিতে প্রবৃত্ত হইল।

তারক চা খাইতে আরম্ভ করিয়া মিনিট-দুই পরে কহিল, হঠাৎ এমন চুপচাপ যে?

কি করি? তিনি আসবার আগে সেই ন'শ নিরানব্বইয়ের ধাক্কাটা মনে মনে একটু সামলে রাখচি ভাই, বলিয়া সে পুনশ্চ একটু হাসিল।

শুনিয়া তারকের গা জ্বলিয়া গেল। কিন্তু, এবার সেও চুপ করিয়া রহিল।

চা খাওয়া সমাপ্ত হইলে সমস্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া দুজনে প্রস্তুত হইয়া রহিল। ঘড়িতে পাঁচটা বাজিল। ক্রমশঃ পাঁচ, দশ, পনেরো মিনিট অতিক্রম করিয়া ঘড়ির কাঁটা নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার দেখা নাই। উন্মুখ অধীরতায় সমস্ত ঘরটা যে ভিতরে ভিতরে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা

প্রকাশ করিয়া না বলিলেও পরস্পরের কাছে অবিদিত নাই; এমনি সময়ে সহসা তারক বলিয়া উঠিল,এ কথা ঠিক যে তোমার নতুন-মা অসাধারণ স্ত্রীলোক।

রাখাল অতি বিস্ময়ে অবাক হইয়া বন্ধুর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

তারক বলিল, নারীর এমনি ইতিহাস শুধু বইয়ে পড়েচি, কিন্তু চোখে দেখিনি। যাঁদের চিরদিন দেখে এসেচি তাঁরা ভালো, তাঁরা সতী-সাধ্বী, কিন্তু ইনি যেন—

কথাটা সম্পূর্ণ হইবার আর অবসর পাইল না।

রাজু, আসতে পারি বাবা?

উভয়েই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাখাল দ্বারের কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া প্রণাম করিল,কহিল, আসুন।

তারক ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিল, কিন্তু তখনি পায়ের কাছে আসিয়া সে-ও নমস্কার করিল।

সকলে বসিবার পরে রাখাল বলিল, কাল সবদিক দিয়েই যাত্রা হলো নিষ্ফল; কাকাবাবু বাড়ি নেই, মামাবাবু গুরুভোজনে অসুস্থ এবং শয্যাগত, আপনাকে নিরর্থক ফিরে যেতে হয়েছিল; কিন্তু এর জন্যে আসলে দায়ী হচ্ছে তারক। ওকে এইমাত্র তার জন্যে আমি ভর্ৎসনা করছিলাম। খুব সম্ভব অপরাধের গুরুত্ব বুঝে ও অনুতপ্ত হয়েছে। না দেবে ও মা-দুর্গাকে রাগিয়ে, না হবে আমাদের যাত্রা পণ্ড।

তারক ঘটনাটি খুলিয়া বলিল।

নতুন-মা হাসিমুখে প্রশ্ন করিলেন, তারক বুঝি এসব বিশ্বাস করো না?

বিশ্বাস করি বলেই তো ভয় পেয়েছিলাম, আজ বোধ হয় কিছু আর হবে না।

তাহার জবাব শুনিয়া নতুন-মা হাসিতে লাগিলেন; পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কারু সঙ্গেই দেখা হলো না?

রাখাল কহিল, তা হয়েছে মা। বাড়ির গিন্নী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, পথ ভুলে এসেছি কিনা। ফেরবার মুখে রেণুও ঠিক ঐ নালিশই করলে। অবশ্য আড়ালে। তাকেই বলে এলাম বাবাকে জানাতে আমি আবার কাল সন্ধ্যায় আসবো, আমার অত্যন্ত প্রয়োজন। জানি, আর যে-ই বলতে ভুলুক, সে ভুলবে না।

তোমরা আজ আবার যাবে?

হাঁ, সন্ধ্যার পরেই।

ওরা সবাই বেশ ভালো আছে?

তা আছে।

নতুন-মা চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ ধরিয়া মনের অনেক দ্বিধা-সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিলেন, রেণু কেমনটি দেখতে হয়েছে রাজু?

রাখাল বিস্ময়াপন্ন মুখে প্রথমটা স্তব্ধ হইয়া রহিল, পরে কৃত্রিম ক্রোধের স্বরে কহিল, প্রশ্নটি ত শুধু বাহুল্য নয়, মা,—হলো অন্যায়। নতুন-মার মেয়ে দেখতে কেমন হওয়া উচিত এ কি আপনি জানেন না? তবে রংটা বোধ হয় একটুখানি বাপের ধার ঘেঁষে গেছে—ঠিক স্বর্ণ-চাঁপা বলা চলে না। বলুন, তাই কি নয় নতুন-মা?

মেয়ের কথায় মায়ের দুই চোখ ছলছল করিয়া আসিল; দেওয়ালের ঘড়ির দিকে একমুহূর্ত মুখ তুলিয়া বলিলেন, তোমাদের বার হবার সময় বোধ হয় হয়ে এলো।

না, এখনো ঘণ্টা দুই দেরি।

তারক গোড়ায় দুই-একটা ছাড়া আর কথা কহে নাই, উভয়ের কথোপকথন মন দিয়া শুনিতেছিল। যে অজানা মেয়েটির অশুভ, অমঙ্গলময় বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিবার সঙ্কল্প তাহারা গ্রহণ করিয়াছে, সে কেমন দেখিতে, জানিতে তাহার আগ্রহ ছিল, কিন্তু ব্যগ্রতা ছিল না; কিন্তু এই যে রাখাল বর্ণনা

করিল না, শুধু অনুযোগের কণ্ঠে মেয়েটির রূপের ইঙ্গিত করিল, সে যেন তাহার অন্ধকার অবরুদ্ধ মনের দশ দিকের দশখানা জানালা খুলিয়া আলোকে আলোকে চকিত চঞ্চল করিয়া দিল। এতক্ষণ সে যেন দেখিয়াও কিছু দেখে নাই, এখন মায়ের দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

নতুন-মার বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। রূপে খুঁত নাই তা নয়, সুমুখের দাঁত-দুটি উঁচু, তাহা কথা কহিলেই চোখে পড়ে। বর্ণ সত্যই স্বর্ণ-চাঁপার মতো, কিন্তু হাত-পায়ের গড়ন ননী-মাখনের সহিত কোনমতেই তুলনা করা চলে না। চোখ দীর্ঘায়ত নয়, নাকও বাঁশী বলিয়া ভুল হওয়া অসম্ভব;কিন্তু একহারা দীর্ঘচ্ছন্দ দেহে সুষমা ধরে না। কোথায় কি আছে না জানিয়া অত্যন্ত সহজে মনে হয় প্রচ্ছন্ন মর্যাদায় এই পরিণত নারী-দেহটি যেন কানায়-কানায় পরিপূর্ণ। আর সবচেয়ে চোখে পড়ে নতুন-মার আশ্চর্য কণ্ঠস্বর। মাধুর্যের যেন অন্ত নাই।

তারকের চমক ভাঙ্গিল নতুন-মার জিজ্ঞাসায়। তিনি হঠাৎ যেন ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিলেন, রাজু, তোমার কি মনে হয় বাবা, এ বিয়ে বন্ধ করতে পারবে?

সে-কথা তো বলা যায় না মা।

তোমার কাকাবাবু কি কিছুই দেখবেন না? কোন কথাই কানে তুলবেন না?

রাখাল বলিল, চোখ-কান তো তাঁর আর নেই মা। তিনি দেখেন মামাবাবুর চোখে, শোনেন গিন্নীর কানে। আমি জানি এ বিয়ের সম্বন্ধ তাঁরাই করেছেন।

কর্তা তবে কি করেন?

যা চিরদিন করতেন—সেই গোবিন্দজীর সেবা। এখন শুধু তার উগ্রতা বেড়ে গেছে শতগুণে। দোকানে যাবারও বড় সময় পান না। ঠাকুরঘর থেকে বার হতেই বেলা পড়ে আসে।

তবে বিষয়-আশয়, কারবার, ঘর-সংসার দেখে কে?

কারবার দেখেন মামা, আর সংসার দেখেন তাঁর মা—অর্থাৎ শাশুড়ী। কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসা করে লাভ কি বলুন, কিছুই আপনার অজানা নয়। একটু থামিয়া বলিল, আমরা আজও যাবো সত্যি, কিন্তু তাঁর নিশ্চিত পরিণামও আপনার জানা নতুন-মা।

নতুন-মা চুপ করিয়া রহিলেন, শুধু মুখ দিয়া একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। বোধ হয় নিরুপায়ের শেষ মিনতি।

হঠাৎ শোনা গেল বাহিরে কে যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে, ওহে ছেলে, এইটি রাজুবাবুর ঘর?

বালক-কণ্ঠে জবাব হইল, না মশাই, রাখালবাবুর বাসা।

হাঁ হাঁ, তাকেই খুঁজচি। এই বলিয়া এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, রাজু আছো? বাঃ—এই তো হে! রাখালের প্রতি চোখ পড়িতেই সরল স্নিগ্ধ-হাস্যে গৃহের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, ভেবেছিলাম বুঝি খুঁজেই পাবো না। বাঃ—দিব্যি ঘরটি তো!

হঠাৎ শেল্‌ফের ঈষৎ অন্তরালবর্তিনী মহিলাটির প্রতি দৃষ্টি পড়ায় একটু বিব্রত বোধ করিলেন, পিছু হটিয়া দ্বারের কাছে আসিয়া কিন্তু স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। কয়েক মুহূর্ত নিরীক্ষণ করার পরে বলিলেন, নতুন-বৌ না? বলিয়াই ঘাড় ফিরাইয়া তিনি রাখালের প্রতি চাহিলেন।

একটা কঠিনতম অবমাননার মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য বিদ্যুদ্বেগে রাখালের মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিয়া মুখ তাহার মড়ার মত ফ্যাকাশে হইয়া গেল। তারক ব্যাপারটা আন্দাজ করিয়াও করিতে পারিল না, তথাপি অজানা ভয়ে সে-ও হতবুদ্ধি হইয়া গেল। ভদ্রলোক পর্য্যায়ক্রমে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন—তোমরা করছিলে কি? ষড়যন্ত্র? গুলির আড্ডায় কনস্টেবল ঢুকে পড়লেও ত তারা এতো আঁতকে ওঠে না? হয়েচে কি? নতুন-বৌ ত?

মহিলা চৌকি ছাড়িয়া দূর হইতে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া একধারে সরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, হাঁ, আমি নতুন-বৌ।

বসো, বসো। ভালো আছো? বলিয়া তিনি নিজেই অগ্রসর হইয়া চৌকি টানিয়া উপবেশন করিলেন; বলিলেন, নতুন-বৌ, আমার রাজুর মুখের পানে একবার চেয়ে দেখো। ও বোধ হয় ভাবলে আমি চিনতে পারামাত্র তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করে এক ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়ে দেবো। ওর ঘরের জিনিসপত্র আর থাকবে না, ভেঙ্গে তচনচ হয়ে যাবে।

তাঁহার বলার ভঙ্গীতে শুধু কেবল তারক ও রাখালই নয়, নতুন-মা পর্যন্ত মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া ফেলিলেন। তারক এতক্ষণে নিঃসন্দেহে বুঝিল ইনিই ব্রজবাবু। তাহার আনন্দ ও বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

ব্রজবাবু অনুরোধ করিলেন, দাঁড়িয়ে থেকো না নতুন-বৌ, বসো।

তিনি ফিরিয়া আসিয়া বসিলে ব্রজবাবু বলিতে লাগিলেন, পরশু রেণুর বিয়ে। ছেলেটি স্বাস্থ্যবান সুন্দর, লেখাপড়া করেচে—আমাদের জানা ঘর। বিষয়-সম্পত্তি টাকাকড়িও মন্দ নেই। এই কলকাতা শহরেই খান-চারেক বাড়ি আছে। এ-পাড়া ও-পাড়া বললেই হয়, যখন ইচ্ছে মেয়ে-জামাইকে দেখতে পাওয়া যাবে। মনে হয় ত সকল দিকেই ভালো হলো।

একটু থামিয়া বলিলেন, আমাকে তো জানোই নতুন-বৌ, সাধ্যি ছিল না নিজে এমন পাত্র খুঁজে বার করি। সবই গোবিন্দর কৃপা! এই বলিয়া তিনি ডান হাতটা কপালে ঠেকাইলেন।

কন্যার সুখ-সৌভাগ্যের সুনিশ্চিত পরিণাম কল্পনায় উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সমস্ত মুখ স্নিগ্ধ প্রসন্নতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন, একটা তিক্ত ও একান্ত অপ্রীতিকর বিরুদ্ধ প্রস্তাবে এই মায়াজাল তাঁহারই চক্ষের সম্মুখে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইল না।

ব্রজবাবু বলিলেন, আমাদের রাখাল-রাজকে ত আর চিঠিতে নিমন্ত্রণ করা যায় না, ওকে নিজে গিয়ে ধরে আনতে হবে। ও ছাড়া আমার করবে কর্মাবেই বা কে। কাল রাত্রে ফিরে গিয়ে রেণুর মুখে যখন খবর পেলাম রাজু এসেছিলো কিন্তু দেখা হয়নি—তার বিশেষ প্রয়োজন, কাল সন্ধ্যায় আবার আসবে—তখনি স্থির করলাম এ সুযোগ আর নষ্ট হতে দিলে চলবে না—যেমন করে হোক খুঁজে-পেতে তার বাসায় গিয়ে আমাকে ঐ ত্রুটি সংশোধন করতেই হবে। তাই দুপুরবেলায় আজ বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু কার মুখ দেখে বেরিয়েছিলাম মনে নেই, আমার এক-কাজে কেবল দু-কাজ নয়, আমার সকল কাজ আজ সম্পূর্ণ হলো।

স্পষ্টই বুঝা গেল তাঁহার ভাগ্য-বিড়ম্বিতা একমাত্র কন্যার বিবাহ ব্যাপারটিকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি এ কথা উচ্চারণ করিয়াছেন। মেয়েটা যেন তাহার অপরিজ্ঞাত জীবন-যাত্রার পূর্বক্ষণে জননীর অপ্রত্যাশিত আশীর্বাদ লাভ করিল।

রাখাল অত্যন্ত নিরীহের মত মুখ করিয়া কহিল, বেরোবার সময় মামাবাবু ছিলেন বলে কি মনে পড়ে?

কেন বলো তো?

তিনি ভাগ্যবান লোক, বেরোবার সময়ে তাঁর মুখ দেখে থাকলে হয়তো—

ওঃ—তাই। ব্রজবাবু হাসিয়া উঠিলেন।

নতুন-মা রাখালের মুখের প্রতি অলক্ষ্যে একটুখানি চাহিয়াই মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার হাসির ভাবটা ব্রজবাবুর চোখ এড়াইল না, বলিলেন, রাজু, কথাটা তোমার ভালো হয়নি। যাই হোক, সম্পর্কে তিনি নতুন-বৌয়েরও ভাই হন; ভাইয়ের নিন্দে বোনেরা কখনো সইতে পারে না। উনি বোধ করি, মনে মনে রাগ করলেন।

রাখাল হাসিয়া ফেলিল। ব্রজবাবুও হাসিলেন, বলিলেন, অসঙ্গত নয়, রাগ করারই কথা কিনা।

তারকের সহিত এখনো তাঁহার পরিচয় ঘটে নাই; লোভটা যে সংবরণ করিতে পারিল না, বলিল, আজ বার হবার সময়ে আপনি দুর্গা নাম উচ্চারণ করেন নি নিশ্চয়ই?

ব্রজবাবু প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝিতে পারিলেন না, বলিলেন, কৈ না! অভ্যাস-মতো আমি গোবিন্দ স্মরণ করি, আজও হয়তো তাঁকেই ডেকে থাকব।

তারক কহিল, তাতেই যাত্রা সফল হয়েছে, ও-নামটা করলে শুধু-হাতে ফিরতে হতো।

বজ্রবাবু তথাপি তাৎপর্য বুঝিতে পারিলেন না, চাহিয়া রহিলেন। রাখাল তারকের পরিচয় দিয়া কালকের ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিল, ওর মতে দুর্গা নামে কার্য পণ্ড হয়। কালকে যে আপনার দেখা না পেয়ে আমাদের বিফল হয়ে ফিরতে হয়েছিল, তার কারণ বার হবার সময় আমি দুর্গা নাম উচ্চারণ করেছিলাম। হয়তো এ-রকম দুর্ভোগ ওর কপালে পূর্বেও ঘটে থাকবে, তাই ও-নামটার ওপরেই তারক চটে আছে।

শুনিয়া ব্রজবাবু প্রথমটা হাসিলেন, পরে হঠাৎ ছদ্মগাম্ভীর্যে মুখখানা অতিশয় ভারী করিয়া বলিলেন, হয় হে রাখাল-রাজ হয়—ওটা মিথ্যে নয়।সংসারে নাম ও দ্রব্যের মহিমা কেউ আজও সঠিক জানে না। আমিও একজন রীতিমত ভুক্তভোগী। 'ফুট-কড়াই' নাম করলে আর আমার রক্ষে নেই।

জিজ্ঞাসু-মুখে সকলেই চোখ তুলিয়া চাহিল, রাখাল সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, কিসে?

ব্রজবাবু বলিলেন, তবে ঘটনাটা বলি শোনো। ব্রজবিহারী বলে ছেলেবেলায় আমার ডাক-নাম ছিল বলাই। ভয়ানক ফুট-কড়াই খেতে

ভালোবাসতাম। ভুগতামও তেমনি। আমার এক দূর-সম্পর্কের ঠাকুরমা সাবধান করে বলতেন—

বলাই, কলাই খেয়ো না—

জানালা ভেঙ্গে বৌ পালাবে দেখতে পাবে না।

ভেবে দেখ দিকি, ছেলেবেলায় ফুট-কড়াই খাওয়ায় বুড়ো-বয়সে আমার কি সর্বনাশ হলো! এ কি দ্রব্যের দোষ-গুণের একটা বড় প্রমাণ নয়? যেমন দ্রব্যের, তেমনি নামের আছে বৈ কি।

তারক ও রাখাল লজ্জায় অধোবদন হইল। নতুন-মা ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া চাপা ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, ছেলেদের সামনে এ তুমি করচ কি?

কেন? ওদের সাবধান করে দিচ্ছি। প্রাণ থাকতে যেন কখনো ওরা ফুট-কড়াই না খায়।

তবে তাই করো, আমি উঠে যাই।

ঐ তো তোমার দোষ নতুন-বৌ, চিরকাল কেবল তাড়াই লাগাবে আর রাগ করবে, একটা সত্যি কথা কখনো বলতে দেবে না। ভাবলাম, আসল দোষটা যে সত্যিই কার, এতকাল পরে খবরটা পেলে তুমি খুশি হয়ে উঠবে—তা হলো উলটো।

নতুন-মা হাতজোড় করিয়া কহিলেন, হয়েছে,—এবার তুমি থামো।—রাজু?

রাখাল মুখ তুলিয়া চাহিল।

নতুন-মা বলিলেন, তুমি যে-জন্যে কাল গিয়েছিলে ওঁকে বলো।

রাখাল একবার ইতস্ততঃ করিল, কিন্তু ইঙ্গিতে পুনশ্চ সুস্পষ্ট আদেশ পাইয়া বলিয়া ফেলিল, কাকাবাবু, রেণুর বিবাহ তো ওখানে কোনমতেই হতে পারে না।

শুনিয়া ব্রজবাবু এবার বিস্ময়ে সোজা হইয়া বসিলেন, তাঁহার রহস্য-কৌতুকের ভাবটা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল, বলিলেন, কেন পারে না?

রাখাল কারণটা খুলিয়া বলিল।

কে তোমাকে বললে?

রাখাল ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিল, নতুন-মা।

ওঁকে কে বললে?

আপনি ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন।

ব্রজবাবু স্তব্ধভাবে বহুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, নতুন-বৌ, কথাটা কি সত্যি?

নতুন-মা ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, হাঁ, সত্য।

ব্রজবাবুর চিন্তার সীমা রহিল না। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিলে বলিলেন, তা হলেও উপায় নেই। রেণুর আশীর্বাদ, গায়ে-হলুদ পর্যন্ত হয়ে গেছে, পরশু বিয়ে, একদিনের মধ্যে আমি পাত্র পাবো কোথায়?

নতুন-মা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, তুমি তো নিজে পাত্র খুঁজে আনোনি মেজকর্তা, যাঁরা এনেছিলেন তাঁদের হুকুম করো।

ব্রজবাবু বলিলেন, তারা শুনবে কেন? তুমি তো জানো নতুন-বৌ, হুকুম করতে আমি জানিনে—কেউ আমার তাই কথা শোনে না। তারা তো পর, কিন্তু তুমিই কি কখনো আমার কথা শুনেচো আজ সত্যি করে বলো দিকি?

হয়তো বিগত-দিনের কি- একটা কঠিন অভিযোগ এই উল্লেখটুকুর মধ্যে গোপন ছিল, সংসারে এই দুটি মানুষ ছাড়া আর কেহ তাহা জানে না।নতুন-মা উত্তর দিতে পারিলেন না, গভীর লজ্জায় মাথা হেঁট করিলেন।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিল। ব্রজবাবু মাথা নাড়িয়া অনেকটা যেন নিজের মনেই বলিয়া উঠিলেন, অসম্ভব।

রাখাল মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, অসম্ভব কি কারণে কাকাবাবু?

ব্রজবাবু বলিলেন, অসম্ভব বলেই অসম্ভব রাজু। নতুন-বৌ জানে না, জানবার কথাও নয়, কিন্তু তুমি তো জানো। তাঁহার কণ্ঠস্বরে, চোখের দৃষ্টিতে নিরাশা যেন ফুটিয়া পড়িল।অন্যথার কথা যেন তিনি ভাবিতেই পারিলেন না।

নতুন-মা মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, নতুন-বৌ তো জানে না, তাকে বুঝিয়েই বলো না মেজকর্তা, অসম্ভব কিসের জন্যে? রেণুর মা নেই, তার বাপ আবার যাকে বিয়ে করেছে তার ভাই চায় পাগলের হাতে মেয়ে দিতে,—তাই অসম্ভব? কিছুতেই ঠেকান যায় না, এই কি তোমার শেষ কথা? তাঁহার মুখের পরে ক্রোধ, করুণা, না তাচ্ছিল্য, কিসের ছায়া যে নিঃসংশয়ে দেখা দিল বলা কঠিন।

দেখিয়া ব্রজবাবু তৎক্ষণাৎ স্মরণ হইল, যে অবাধ্য নতুন-বৌয়ের বিরুদ্ধে এইমাত্র তিনি অভিযোগ করিয়াছেন এ সেই। রাখালের মনে পড়িল, যে নতুন-মা বাল্যকালে তাহার হাত ধরিয়া নিজের স্বামিগৃহে আনিয়াছিলেন ইনি সেই।

লজ্জা ও বেদনায় অভিসিঞ্চিত যে-গৃহের আলো-বাতাস স্নিগ্ধ হাস্য-পরিহাসের মুক্তস্রোতে অভাবনীয় সহৃদয়তায় উজ্জ্বল হইয়া আসিতেছিল, এক মুহূর্তেই আবার তাহা শ্রাবণের অমানিশার অন্ধকারের বোঝা হইয়া উঠিল। রাখাল ব্যস্ত হইয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মা,অনেকক্ষণ তো আপনি পান খাননি? আমার মনে ছিল না মা, অপরাধ হয়ে গেছে।

নতুন-মা কিছু আশ্চর্য হইলেন—পান? পানের দরকার নেই বাবা।

নেই বৈ কি! ঠোঁট দুটি শুকিয়ে কালো হয়ে উঠেচে। কিন্তু আপনি ভাবছেন এখুনি বুঝি হিন্দুস্থানী পান-আলার দোকানে ছুটবো। না মা, সে বুদ্ধি আমার আছে। এসো ত তারক, এই মোড়টার কাছে আমাকে একটু দাঁড়াবে, এই বলিয়া সে বন্ধুর হাতে একটা প্রচণ্ড টান দিয়া দ্রুতবেগে দুজনে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

এইবার নিরালা গৃহের মধ্যে মুখোমুখি বসিয়া দুজনেই সঙ্কোচে মরিয়া গেলেন।

নিঃসম্পর্কীয় যে-দুটি লোক মেঘখণ্ডের ন্যায় এতক্ষণ আকাশের সূর্যালোক বাধাগ্রস্ত রাখিয়াছিল, তাহাদের অন্তর্ধানের সঙ্গে-সঙ্গেই বিনির্মুক্ত রবিকরে ঝাপসা কিছুই আর রহিল না। স্বামী-স্ত্রীর গভীর ও নিকটতম সম্বন্ধ যে এমন ভয়ঙ্কর বিকৃত ও লজ্জাকর হইয়া উঠিতে পারে, এই নিভৃত নির্জনতায় তাহা ধরা পড়িল। ইতিপূর্বের হাস্য-পরিহাসের অবতারণা যে কত অশোভন ও অসঙ্গত এ কথা ব্রজবাবুর মনে পড়িল, এবং অপরিচিত পুরুষদের সম্মুখে ঐ লজ্জাবলুণ্ঠিত নিঃশব্দ নারীর উদ্দেশে অবক্ষিপ্ত ফুট-কড়াইয়ের রসিকতা যেন এখন তাঁহার নিজেরই কান মলিয়া দিল। মনে হইল, ছি ছি, করিয়াছি কি!

পান আনার ছল করিয়া রাখাল তাঁহাদের একলা রাখিয়া গেছে। কিন্তু সময় কাটিতেছে নীরবে। হয়তো তাহারা ফিরিল বলিয়া। এমন সময় কথা কহিলেন নতুন-বৌ প্রথমে। মুখ তুলিয়া বলিলেন, মেজকর্তা, আমাকে তুমি মার্জনা কর।

ব্রজবাবু বলিলেন, মার্জনা করা সম্ভব বলে তুমি মনে করো?

করি কেবল তুমি বলেই। সংসারে আর কেউ হয়তো পারে না, কিন্তু তুমি পারো। তাঁহার চোখ দিয়া এতক্ষণে জল গড়াইয়া পড়িল।

ব্রজবাবু ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিলেন, নতুন-বৌ, মার্জনা করতে তুমি পারতে?

নতুন-বৌ আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, আমরা তো পারিই মেজকর্তা। পৃথিবীতে এমন কোন মেয়ে আছে যাকে স্বামীর এ অপরাধ ক্ষমা করতে হয় না? কিন্তু আমি সে তুলনা দিইনে, আমার ভাগ্যে এমন স্বামী পেয়েছিলাম যিনি দেহে-মনে নিষ্পাপ, যিনি সব সন্দেহের ওপরে। আমি কি করে তোমাকে এর জবাব দেবো?

কিন্তু আমার মার্জনা নিয়ে তুমি করবে কি?

যতদিন বাঁচবো মাথায় তুলে রাখবো। আমাকে কি তুমি ভুলে গেছো মেজকর্তা?

তোমার মনে কি হয় বলো তো নতুন-বৌ?

এ প্রশ্নের জবাব আসিল না। শুধু স্তব্ধ নত-মুখে উভয়েই বসিয়া রহিলেন।

খানিক পরে ব্রজবাবু বলিলেন, মার্জনা চেয়ো না নতুন-বৌ, সে আমি পারবো না। যতদিন বাঁচবো তোমার ওপরে এ অভিমান আমার যাবে না। তবু, পাছে স্বামীর অভিশাপে তোমার কষ্ট বাড়ে এই ভয়ে কোনদিন তোমাকে অভিশাপ দিইনি। কিন্তু এমন অদ্ভুত কথা তুমি বিশ্বাস করতে পারো নতুন-বৌ?

নতুন-বৌ মুখ না তুলিয়াই বলিল, পারি।

ব্রজবাবু বলিলেন, তা হলে আর আমি দুঃখ করবো না। সেদিন আমাকে সবাই বললে অন্ধ, বললে নির্বোধ, বললে দেখিয়ে দিলেও যে দেখতে পায় না, প্রমাণ করে দিলেও যে বিশ্বাস করে না, তার দুর্দশা এমন হবে না তো হবে কার! কিন্তু দুর্দশা হয়েছে বলেই কি নিজেকে অন্ধ বলে মেনে নিতে হবে নতুন-বৌ! বলতে হবে, যা করেছি আমি সব ভুল? জানি, ভাই আমাকে ঠকিয়েছে, আমাকে ঠকিয়েচে বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী, কর্মচারী—

ঠকিয়েছে অনেকেই। কিন্তু, সব যখন যেতে বসেছিল, সেই দুর্দিনে তোমাকে বিবাহ করে আমিই তো ঘরে আনি। তুমি এসে একে একে সমস্ত বন্ধ করলে, সব লোকসান পূর্ণ হয়ে এলো—সেই—তোমাকে অবিশ্বাস করতে পারিনি বলে আমি হলাম অন্ধ, আর যারা চক্রান্ত করে, বাইরের লোক জড়ো করে, তোমাকে নীচে টেনে নামিয়ে বাড়ির বার করে দিলে তারাই চক্ষুষ্মান? তাদের নালিশ, তাদের নোংরা কথায় কান দিইনি বলেই আজ আমার এই দুর্গতি? আমার দুঃখের এই কি হলো সত্যি ইতিহাস? তুমিই বল তো নতুন—বৌ?

নতুন-বৌ কখন যে মুখ তুলিয়া স্বামীর মুখের প্রতি দুই চোখ মেলিয়া চাহিয়াছিল, বোধ হয় তাহা নিজেই জানিত না, এবং হঠাৎ তাঁহার কথা থামিতেই সে যেন চমকিয়া আবার মুখ নীচু করিল।

ব্রজবাবু বলিলেন, তুমি ছিলে শুধুই কি স্ত্রী? ছিলে গৃহের লক্ষ্মী, সমস্ত পরিবারের কর্ত্রী, আমার সকল আত্মীয়ের বড় আত্মীয়, সকল বন্ধুর বড় বন্ধু— তোমার চেয়ে শ্রদ্ধা-ভক্তি আমাকে কে কবে করেচে? এমন করে মঙ্গল কে কবে চেয়েছে? কিন্তু একটা কথা আমি প্রায়ই ভাবি নতুন-বৌ, কিছুতেই জবাব পাইনে। আজ দৈবাৎ যদি কাছে পেয়েচি, বল তো সেদিন কি হয়েছিল? এত আপনার হয়েও কি আমাকে সত্যিই ভালোবাসতে পারোনি? না বুঝে তুমি ত কখনো কিছু করো না,—দেবে এর সত্যি জবাব? যদি দাও, হয়তো আজও মনের মধ্যে আবার শান্তি পেতে পারি। বলবে?

নতুন-বৌ মুখ তুলিয়া চাহিল না, কিন্তু মৃদুকণ্ঠে কহিল, আজ নয় মেজকর্তা।

আজ নয়? তবে, কবে দেবে বল? আর যদি দেখা না হয়, চিঠি লিখে জানাবে?

এবার নতুন-বৌ চোখ তুলিয়া চাহিল, কহিল, না মেজকর্তা, আমি তোমাকে চিঠিও লিখবো না, মুখেও বলবো না।

তবে জানবো কি করে?

জানবে যেদিন আমি নিজে জানতে পারবো।

কিন্তু, এ যে হেঁয়ালি হলো।

তা হোক। আজ আশীর্বাদ করো, এর মানে যেন একদিন তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পারি।

দ্বারের বাহির হইতে সাড়া আসিল, আমার বড্ড দেরি হয়ে গেল। এই বলিয়া রাখাল প্রবেশ করিল, এক ডিবা পান সম্মুখে রাখিয়া দিয়া বলিল, সাবধানে

তৈরি করিয়ে এনেচি মা, এতে অশুচি স্পর্শদোষ ঘটেনি। নিঃসঙ্কোচে মুখে দিতে পারেন।

নতুন-বৌ ইঙ্গিতে স্বামীকে দেখাইয়া দিতে রাখাল ঘাড় নাড়িল।

ব্রজবাবু বলিলেন, আমি তেরো বচ্ছর পান খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি নতুন-বৌ, এখন তুমি হাতে করে দিলেও মুখে দিতে পারবো না।

সুতরাং পানের ডিবা তেমনিই পড়িয়া রহিল, কেহ মুখে দিতে পারিলেন না।

তারক আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার বাসায় যাইবার কথা, অথচ যায় নাই, কাছেই কোথাও অপেক্ষা করিতেছিল। যে কারণেই হোক, সে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকিতে চাহে না। তাহার এই অবাঞ্ছিত কৌতূহল রাখালের চোখে বিসদৃশ ঠেকিল, কিন্তু সে চুপ করিয়াই রহিল।

ব্রজবাবু বলিলেন, নতুন-বৌ, তোমার সেই মোটা বিছে-হারটা কি ভটচায্যি-মশায়ের ছোট মেয়েকে বিয়ের সময় দেবে বলেছিলে? বিয়ে অনেকদিন হয়ে গেছে, দুটি ছেলেমেয়েও হয়েছে, এতকাল সঙ্কোচে বোধ করি চাইতে পারেনি, কিন্তু এবার পূজোর সময়ে এসে সে হারটা চেয়েছিল—দেবো?

নতুন-বৌ বলিলেন, হাঁ, ওটা তাকে দিয়ো।

ব্রজবাবু কহিলেন, আর একটা কথা। তোমার যে-টাকাটা কারবারে লাগানো ছিল, সুদে-আসলে সেটা হাজার-পঞ্চাশ হয়েছে। কি করবে সেটা? তুলে তোমাকে পাঠিয়ে দেব?

তুলবে কেন, আরও বাড়ুক না।

না নতুন-বৌ, সাহস হয় না। বরিশালের চালানি সুপারির কাজে অনেক টাকা লোকসান গেছে—থাকলেই হয়তো টান ধরবে।

নতুন-বৌ একটু ভাবিয়া বলিলেন, এ ভয় আমার বরাবর ছিল। গোকুল সাহাকে সরিয়ে দিয়ে তুমি বীরেনকে পাঠাও। আমার টাকা মারা যাবে না।

ব্রজবাবুর চোখ দুটো হঠাৎ সজল হইয়া উঠিল। সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, নিজেও ত বুড়ো হলাম গো, আরও খাটবো কত কাল? ভাবচি সব তুলে দিয়ে এবার—

ঠাকুরঘর থেকে বার হবে না, এই তো? না, সে হবে না।

ব্রজবাবু নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, বহুক্ষণ পর্যন্ত একটি কথাও কহিলেন না। মনে মনে কি যে ভাবিতে লাগিলেন বোধহয় একটিমাত্র লোকই তাহার আভাস পাইল।

হঠাৎ এক সময়ে বলিয়া উঠিলেন, দেখ নতুন-বৌ, সোনাপুরের কতকটা অংশ দাদার ছেলেদের ছেড়ে দেওয়া তুমি উচিত মনে কর?

নতুন-বৌ বলিলেন, তাদের তো আর কিছুই নেই। সবটাই ছেড়ে দাও না।

সবটা?

ক্ষতি কি?

বেশ, তাই হবে। তোমার মনে আছে বোধ হয় দাদার বড়মেয়ে জয়দুর্গাকে কিছু দেবার কথা হয়েছিল। জয়দুর্গা বেঁচে নেই, কিন্তু তার একটি মেয়ে আছে, অবস্থা ভাল নয়, এরা ভাগ্‌নীকে কিছুই দিতে চায় না। তুমি কি বল?

নতুন-বৌ বলিলেন, সোনাপুরের আয় বোধ হয় হাজার টাকার ওপর। জয়দুর্গার মেয়েকে একশো টাকার মত ব্যবস্থা করে দিলে অন্যায় হবে না।

ভালো, তাই হবে।

আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল।

হাঁ নতুন-বৌ, তোমার গয়নাগুলো কি সব সিন্দুকেই পচবে? কেবল তৈরিই করালে, কখনো পরলে না। দেবো সেগুলো তোমাকে পাঠিয়ে?

নতুন-বৌ হঠাৎ বোধ হয় প্রস্তাবটা বুঝিতে পারেন নাই, তার পরে মাথা হেঁট করিলেন। একটু পরেই দেখা গেল টেবিলের উপরে টপটপ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল।

ব্রজবাবু শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন, থাক থাক, নতুন-বৌ, তোমার রেণু পরবে। ও-কথায় আর কাজ নেই।

মিনিট পাঁচ-ছয় পরে তিনি ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিলেন, সন্ধ্যা হয়ে আসচে, এবার তাহলে আমি উঠি।

তাঁহার সন্ধ্যা-আহ্নিক, গোবিন্দের সেবা—এই সকল নিত্যকর্তব্যের কোন কারণেই সময় লঙ্ঘন করা চলে না তাহা রাখাল জানিত। সে-ও ব্যস্ত হইয়া পড়িল। প্রৌঢ়কালে ব্রজবাবুর ইহাই যে প্রত্যহের প্রধান কাজ, নতুন-বৌ তাহা জানিতেন না। আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, রেণুর বিয়ের কথাটা তো শেষ হলো না মেজকর্তা।

ব্রজবাবু বলিলেন, তুমি যখন চাও না তখন ও-বাড়িতে হবে না।

নতুন-বৌ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, বাঁচলাম।

ব্রজবাবু বলিলেন, কিন্তু বিয়ে তো বন্ধ রাখা চলবে না। সুপাত্র পাওয়া চাই, দুটো খেতে-পরতে পায় তাও দেখা চাই। রাজু, তোমার তো বাবা অনেক বড়ঘরে যাওয়া-আসা আছে, তুমি একটি স্থির করে দিতে পারো না! এমন মেয়ে তো কেউ সহজে পাবে না।

রাখাল অধোমুখে মৌন হইয়া রহিল।

নতুন-বৌ বলিলেন, এত তাড়াতাড়ির দরকার কি মেজকর্তা?

ব্রজবাবু মাথা নাড়িলেন,—সে হয় না নতুন-বৌ। নির্দিষ্ট দিনে দিতেই হবে—দেশাচার অমান্য করতে পারবো না। তা ছাড়া, আরও অমঙ্গলের সম্ভাবনা।

কিন্তু এর মধ্যে সুপাত্র যদি না পাওয়া যায়?

পেতেই হবে।

কিন্তু না পাওয়া গেলে? পাগলের বদলে বাঁদরের হাতে মেয়ে দেবে?

সে মেয়ের কপাল।

তার চেয়ে হাত-পা বেঁধে ওকে জলে ফেলে দিও! তাই তো দিচ্ছিলে।

আলোচনা পাছে বাদানুবাদে দাঁড়ায় এই ভয়ে রাখাল মাঝখানে কথা কহিল, বলিল, মামাবাবু কি রাগারাগি করবেন মনে হয় কাকাবাবু?

ব্রজবাবু ম্লান হাসিয়া বলিলেন, মনে হয় বৈ কি। হেমন্তর স্বভাব তুমি জানোই ত রাজু। সহজে ছাড়বে না।

রাখাল খুব জানিত—তাই চুপ করিয়া রহিল।

নতুন-বৌ হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, তোমার মেয়ে, যেখানে ইচ্ছে বিয়ে দেবে, ইচ্ছে না হলে দেবে না, তাতে হেমন্তবাবু বাধা দেবেন কেন? দিলেই বা তুমি শুনবে কেন?

প্রত্যুত্তরে ব্রজবাবু 'না' বলিলেন বটে, কিন্তু গলায় জোর নাই, তাহা সকলেই অনুভব করিল। নতুন-বৌ বলিতে লাগিলেন, তোমার ছেলে নেই, শুধু দুটি মেয়ে। এরা যা পাবে তাতে খুঁজলে কলকাতা শহরে সুপাত্রের অভাব হবে না, কিন্তু সে কটা দিন তোমাকে স্থির হয়ে থাকতেই হবে। আশীর্বাদ, গায়ে-হলুদের ওজর তুলে ভূত-প্রেত পাগল-ছাগলের হাতে মেয়ে সম্প্রদান করা চলবে না। এর মধ্যে হেমন্তবাবু বলে কেউ নেই। বুঝলে মেজকর্তা?

ব্রজবাবু বিষণ্ণমুখে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ।

রাখাল কথা কহিল, বলিল, এ হলো সহজ যুক্তি ও ন্যায়-অন্যায়ের কথা মা, কিন্তু হেমন্তবাবুকে তো আপনি জানেন না। রেণু অনেক কিছু পাবে বলেই তার অদৃষ্টে আজ মামাবাবুর পাগল আত্মীয় জুটেছে, নইলে জুটতো না—ও নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পেতো। মামাবাবু এক কথায় হাল ছাড়বার লোক নয় মা।

কি করবেন তিনি শুনি?

রাখাল জবাব দিতে গিয়া হঠাৎ চাপিয়া গেল। ব্রজবাবু দেখিয়া বলিলেন, লজ্জা নেই রাজু, বলো। আমি অনুমতি দিচ্চি।

তথাপি রাখালের সঙ্কোচ কাটে না, ইতস্ততঃ করিয়া শেষে কহিল, ও-লোকটা গায়ে হাত দিতে পর্যন্ত পারে।

কার গায়ে হাত দিতে পারে রাজু? মেজকর্তার?

হাঁ, একবার ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, পনর-ষোল দিন কাকাবাবু উঠতে পারেন নি।

নতুন-মার চোখের দৃষ্টি হঠাৎ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল,—তার পরেও ও-বাড়িতে আছে? খাচ্চে পরচে?

রাখাল বলিল, শুধু নিজে নয়, মাকে পর্যন্ত এনেছেন। কাকাবাবুর শাশুড়ি। পরিবার নেই, মারা গেছেন, নইলে তিনিও বোধ করি এতদিনে এসে হাজির হতেন। শেকড় গেড়ে ওরা বসেছে মা, নড়ায় সাধ্য কার? আমাকে একদিন নিজে আশ্রয় দিয়ে এনেছিলেন বলে কেউ টলাতে পারেনি, কিন্তু মামাবাবুর একটা ভ্রূকুটির ভার সইলো না, ছুটে পালাতে হলো। সত্যি কথা বলি মা, রেণুর বিয়ে নিয়ে কাকাবাবুর সম্বন্ধে আমার মস্ত ভয় আছে।

নতুন-বৌ বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিলেন। নিরুপায় নিষ্ফল আক্রোশে তাঁহার চোখ দিয়া যেন আগুনের স্রোত বহিতে লাগিল।

রাখাল ইঙ্গিতে ব্রজবাবুকে দেখাইয়া বলিল, এখন হেমন্তবাবু বাড়ির কর্তা, তাঁর মা হলেন গিন্নী। এই দাবানলের মধ্যে এই শান্ত, নিরীহ মানুষটিকে একলা ঠেলে দিয়ে আমার কিছুতে ভয় ঘোচে না। অথচ পাগলের হাত থেকে রেণুকে বাঁচাতেই হবে। আজ আপনার মেয়ে, আপনার স্বামী বিপদে কূল-কিনারা পায় না মা, এ ভাবলেও আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করে।

নতুন-মা জবাব দিলেন না, শুধু সম্মুখের টেবিলের উপর ধীরে ধীরে মাথা রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

তারক উত্তেজনায় ছটফট করিয়া উঠিল। সংসারে এত বড় নালিশ যে আছে ইহার পূর্বে সে কল্পনাও করে নাই। আর ঐ নির্বাক, নিস্পন্দ পাষাণ-মূর্তি,—কি কথা সে ভাবিতেছে!

মিনিট দুই-তিন কাটিল, কে জানে আরও কতক্ষণ কাটিত,—বাহির হইতে রুদ্ধদ্বারে ঘা পড়িল। বুড়ি-ঝি মনে করিয়া রাখাল কপাট খুলিতেই একজন ব্যস্ত-ব্যাকুল বাঙালী চাকর ঘরে ঢুকিয়া পড়িল—মা?

নতুন-মা মুখ তুলিয়া চাহিলেন—তুই যে?

সে অত্যন্ত উত্তেজিত, কহিল, ড্রাইভার নিয়ে এলো মা। শিগগির চলুন, বাবু ভয়ানক রাগ করচেন।

কথাটা সামান্যই, কিন্তু কদর্যতার সীমা রহিল না। ব্রজবাবু লজ্জায় আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

চাকরটার বিলম্ব সহে না, তাগাদা দিয়া পুনশ্চ কহিল, উঠে পড়ুন মা, শিগগির চলুন। গাড়ি এনেচি।

কেন?

লোকটা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। স্পষ্টই বুঝা গেল বলিতে তাহার নিষেধ আছে।

বাবু কেন ডাকচেন?

চলুন না মা, পথেই বলবো।

আর তর্ক না করিয়া নতুন-মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, চললাম মেজকর্তা।

চললে?

হাঁ। এ কি তুমি ডেকে পাঠিয়েচো যে, জোর করে, রাগ করে বলবো, এখন যাবার সময় নেই, তুই যা? আমাকে যেতেই হবে। যাকে কখনো কিছু

বলোনি, তোমার সেই নতুন-বৌকে আজ একবার মনে করে দেখো তো মেজকর্তা, দেখো তো তাকে আজ চেনা যায় কিনা।

ব্রজবাবু মুখ তুলিয়া নির্নিমেষে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

নতুন-বৌ বলিলেন, মার্জনা ভিক্ষে চেয়েছিলাম, কিন্তু স্বীকার করোনি—উপেক্ষা করে বললে, এ নিয়ে তোমার হবে কি! কখনো তোমার কাছে কিছু চাইনি, চাইতে তোমার কাছে আমার লজ্জা করে, অভিমান হয়। কিন্তু আর যে-যাই বলুক মেজকর্তা, অমন কথা তুমি কখনো আমাকে বলো না। বলবে না বলো?

ব্রজবাবুর বুকের মধ্যে যেন ভূমিকম্প হইয়া গেল। বহু দিন পূর্বের একটা ঘটনা মনে পড়িল—তখন রেণুর জন্মের পর নতুন-বৌ পীড়িত। কি-একটা জরুরী কাজে তাঁহার ঢাকা যাইবার প্রয়োজন, সেদিনও এই নতুন-বৌ কণ্ঠস্বরে এমনি আকুলতা ঢালিয়াই মিনতি জানাইয়াছিল—ঘুমিয়ে পড়লে ফেলে রেখে আমাকে পালাবে না বলো? সেদিন বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়াই তাঁহাকে ঢাকা যাওয়া বন্ধ করিতে হইয়াছিল। সেদিনও স্ত্রৈণ বলিয়া তাঁহাকে গঞ্জনা দিতে লোকে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু আজ?

চাকরটা বুঝিল না কিছুই, কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া, হঠাৎ কেমন ভয় পাইয়া বলিয়া ফেলিল, মা, তোমার নীচের ভাড়াটে একজন আফিং খেয়ে মর-মর হয়েচে—তাই এসেচি ডাকতে।

নতুন-বৌ সভয়ে প্রশ্ন করিল, কে আফিং খেলে রে?

জীবনবাবুর স্ত্রী।

জীবনবাবু কোথায়?

চাকরটা বলিল, তাঁর সাত-আট দিন খোঁজ নেই। শুনেচি, আফিসের চাকরি গেছে বলে পালিয়েছে।

কিন্তু তোর বাবু করছেন কি? হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে?

চাকরটা বলিল, কিছুই হয়নি মা, পুলিশের ভয়ে বাবু দোকানে চলে গেছেন। তোমার বাড়ি, তোমার ভাড়াটে, তুমিই তার উপায় করো মা, বৌটা হয়তো বাঁচবে না।

রাখাল উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, দরকার হতে পারে মা, আমি কি আপনার সঙ্গে যেতে পারি?

নতুন-মা বলিলেন, কেন পারবে না বাবা, এসো। যাবার পূর্বে এবার তিনি হাত দিয়া স্বামীর পা-দুটি স্পর্শ করিয়া মাথায় ঠেকাইলেন।

সকলে বাহির হইলে রাখাল ঘরে তালা দিয়া নতুন-মার অনুসরণ করিল।

চার

নতুন-মা ডাকেন নাই, রাখাল নিজে যাচিয়া তাঁহার সাহায্য করিতে চলিয়াছে।

তখনকার দিনে রমণীবাবু রাখাল-রাজকে ভালো করিয়াই চিনিতেন। তাহার পরে দীর্ঘ তের বৎসর গত হইয়াছে এবং উভয় পক্ষেই পরিবর্তন ঘটিয়াছে বিস্তর, কিন্তু তাহাকে না চিনিবারও হেতু নাই; অন্ততঃ সেই সম্ভাবনাই সমধিক।

গাড়ির মধ্যে বসিয়া রাখাল ভাবিতে লাগিল, হয়তো তিনি দোকানে যান নাই, হয়তো ফিরিয়া আসিয়াছেন, হয়তো বাড়িতে না থাকার অপরাধে তাহারি সম্মুখে নতুন-মাকে অপমানের একশেষ করিয়া বসিবেন—তখন লজ্জা ও দুঃখ রাখিবার ঠাঁই থাকিবে না,—এইরূপ নানা চিন্তায় সে নতুন-মার পাশে বসিয়াও অস্থির হইয়া উঠিল। স্পষ্ট দেখিতে লাগিল তাঁহার এই অভাবিত আবির্ভাবে রমণীবাবুর ঘোরতর সন্দেহ জাগিবে এবং রেণুর বিবাহ ব্যাপারটা যদি নতুন-মা গোপনে রাখিবার সঙ্কল্পই করিয়া থাকেন ত তাহা নিঃসন্দেহে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কারণ, সত্য ও মিথ্যা অভিযোগের নিরসনে আসল কথাটা তাঁহাকে অবশেষে প্রকাশ করিতেই হইবে।

সেই অভদ্র চাকরটা ড্রাইভারের পাশে বসিয়াছিল; মনিবের ভয়ে তাহার তাগিদের উদ্‌ভ্রান্ত রুক্ষতা ও প্রত্যুত্তরে নতুন-মার বেদনাক্ষুব্ধ লজ্জিত কথাগুলি রাখালের মনে পড়িল, এবং সেই জিনিসেরই পুনরাবৃত্তি স্বয়ং মনিবের মুখ হইতে এখন কি আকার ধারণ করিবে ভাবিয়া অতিষ্ঠ হইয়া কহিল, নতুন-মা, গাড়িটা থামাতে বলুন, আমি নেবে যাই।

নতুন-মা বিস্ময়াপন্ন হইলেন—কেন বাবা, কোথাও কি খুব জরুরী কাজ আছে?

রাখাল বলিল, না, কাজ তেমন নেই,—কিন্তু আমি বলি আজ থাক।

কিন্তু মেয়েটাকে যদি বাঁচানো যায় সে তো আজই দরকার রাজু। অন্য দিনে ত হবে না।

বলা কঠিন। রাখাল সঙ্কোচ ও কুণ্ঠায় বিপন্ন হইয়া উঠিল, শেষে মৃদুকণ্ঠে বলিল, মা, আমি ভাবচি পাছে রমণীবাবু কিছু মনে করেন।

শুনিয়া নতুন-মা হাসিলেন—ওঃ, তাই বটে! কিন্তু কে-একটা লোক কি-একটা মনে করবে বলে মেয়েটা মারা যাবে বাবা? বড় হয়ে তোমার বুঝি এই বুদ্ধি হয়েছে! তা ছাড়া, শুন্‌লে তো তিনি বাড়ি নেই, পুলিশ-হাঙ্গামার ভয়ে পালিয়েছেন। হয়তো দু-তিনদিন আর এ-মুখো হবেন না।

রাখাল আশ্বস্ত হইল না। ঠিক বিশ্বাস করিতেও পারিল না, প্রতিবাদও করিল না। ইতিমধ্যে গাড়ি আসিয়া দ্বারে পৌঁছিল। দেখিল তাহার অনুমানই সত্য। একজন প্রৌঢ় গোছের ভদ্রলোক উপরের বারান্দায় থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, দ্রুতপদে নামিয়া আসিলেন। রাখাল মনে মনে প্রমাদ গণিল।

তাঁহার চোখে-মুখে কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ পরিপূর্ণ, কহিলেন, এলে? শুনেচো ত জীবনের স্ত্রী, কি সর্বনাশ —

কথাটা সম্পূর্ণ হইল না, সহসা রাখালের প্রতি চোখ পড়িতেই থামিয়া গেলেন।

নতুন-মা বলিলেন, রাজুকে চিনতে পারলে না?

তিনি একমুহূর্ত ঠাহর করিয়া বলিয়া উঠিলেন, ওঃ—রাজু! আমাদের রাখাল! বেশ, চিনতে পারবো না? নিশ্চয়।

রাখাল পূর্বেকার প্রথা-মতো হেঁট হইয়া নমস্কার করিল। রমণীবাবু তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, এতকাল একবার দেখা দিতে নেই হে! বেশ যা হোক সব। কিন্তু কি সর্বনাশ করলে মেয়েটা! পুলিশে এবার বাড়িসুদ্ধ সবাইকে

হয়রান করে মারবে। দুশ্চিন্তার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, বার বার তোমাকে বলি নতুন-বৌ, যাকে-তাকে ভাড়াটে রেখো না। লোকে বলে শূন্য গোয়াল ভালো। নাও, এবার সামলাও। একটা কথা যদি কখনো আমার শুনলে!

রাখাল কহিল, একে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন নি কেন?

হাসপাতালে? বেশ! তখন কি আর ছাড়ানো যাবে ভাবো? আত্মহত্যা যে!

রাখাল কহিল, কিন্তু তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করা চাই তো। নইলে, আত্মহত্যা যে তাঁকে বধ করায় গিয়ে দাঁড়াবে।

রমণীবাবু ভয় পাইয়া বলিলেন, সে ত জানি হে, কিন্তু হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে কিছু-একটা করে ফেললেই ত হবে না। একটা পরামর্শ করা ত দরকার? পুলিশের ব্যাপার কিনা।

নতুন-মা বলিলেন, তাহলে চলো; কোন ভালো এটর্নির অফিসে গিয়ে আগে পরামর্শ করে আসা যাক।

রমণীবাবু জ্বলিয়া গেলেন—তামাশা করলেই ত হয় না নতুন-বৌ, আমার কথা শুনলে আজ এ বিপদ ঘটতো না।

এ-সকল অনুযোগ অর্থহীন উচ্ছ্বাস ব্যতীত কিছুই নয়, তাহা নূতন লোক রাখালও বুঝিল। নতুন-মা জবাব দিলেন না, হাসিয়া শুধু রাখালকে কহিলেন, চলো ত বাবা, দেখি গে কি করা যায়। রমণীবাবুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, তুমি ওপরে গিয়ে বসো গে সেজোবাবু, ছেলেটাকে নিয়ে আমি যা পারি করি গে, কেবল এইটি করো, ব্যস্ত হয়ে লোকজনকে যেন বিব্রত করে তুলো না।

নীচের তলায় তিন-চারটি পরিবার ভাড়া দিয়া বাস করে। প্রত্যেকের দুখানি করিয়া ঘর, বারান্দায় একটা অংশ তক্তার বেড়া দিয়া এক সার রান্নাঘরের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে ইঁহাদের রন্ধন ও খাবার কাজ চলে। জলের কল, পায়খানা প্রভৃতি সাধারণের অধিকারে। ভাড়াটেরা সকলেই দরিদ্র ভদ্র কেরানী, ভাড়ার

হার যথেষ্ট কম বলিয়া মাসের শেষে বাসা বদল করার রীতি এ-বাটীতে নাই—সকলেই প্রায় স্থায়িভাবে বাস করিয়া আছেন।

শুধু জীবন চক্রবর্তী ছিল নূতন, এ বাড়িতে বোধ করি বছর-দুয়েকের বেশি নয়। তাহারই স্ত্রী আফিং খাইয়া বিভ্রাট বাধাইয়াছে। বৌটির নিজের ছেলেপুলে ছিল না বলিয়া সমস্ত ভাড়াটেদের ছেলেমেয়ের ভার ছিল তাহার 'পরে। স্নান করানো, ঘুম পাড়ানো, ছেঁড়া জামা-কাপড় সেলাই করা—এ-সব সে-ই করিত। গৃহিণীদের 'হাত-জোড়া' থাকিলেই ডাক পড়িত জীবনের বৌকে—কারণ, সে ছিল 'ঝাড়া-হাত-পা'র মানুষ, অতএব তাহার আবার কাজ কিসের? এত অল্প বয়সে কুঁড়েমি ভাল নয়,—বৌটির সম্বন্ধে এই ছিল সকল ভাড়াটের সর্ববাদিসম্মত অভিমত। সে যাই হোক, শান্ত ও নিঃশব্দ প্রকৃতির বলিয়া সবাই তাহাকে ভালবাসিত, সবাই স্নেহ করিত; কিন্তু স্বামীর যে তাহার পাঁচ-ছয় মাস ধরিয়া কাজ নাই এবং সে-ও যে আজ সাত-আটদিন নিরুদ্দেশ এ-খবর ইহাদের কানে পৌঁছিল শুধু আজ—সে যখন মরিতে বসিয়াছে; কিন্তু তবুও কাহারও বিশ্বাস হইতে চাহে না—জীবনের বৌ যে আফিং খাইতে পারে,—এ যেন সকলের স্বপ্নের অগোচর।

রাখালকে লইয়া নতুন-মা যখন তাহার ঘরে ঢুকিলেন তখন সেখানে কেহ ছিল না। বোধ করি পুলিশের হাঙ্গামার ভয়ে সবাই একটুখানি আড়ালে গা-ঢাকা দিয়াছিল। ঘরখানি যেন দৈন্যের প্রতিমূর্তি। দেওয়ালের কাছে দুখানি ছোট জলচৌকি, একটির উপরে দুইখানি পিতল-কাঁসার বাসন ও অন্যটির উপরে একটি টিনের তোরঙ্গ। অল্পমূল্যের একখানি তক্তপোশের উপরে জীর্ণ শয্যায় পড়িয়া বৌটি। তখনও জ্ঞান ছিল, পুরুষ দেখিয়া শিথিল হাতখানি মাথায় তুলিয়া আঁচলটুকু টানিয়া দিবার চেষ্টা করিল। নতুন-মা বিছানার একধারে বসিয়া আর্দ্রকণ্ঠে কহিলেন, কেন এ কাজ করতে গেলে মা, আমাকে সব কথা জানাও নি কেন? হাত দিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিলেন, বলিলেন, সত্যি করে বলো তো মা, কতটুকু আফিং খেয়েচো? কখন খেয়েচো?

এখন সাহস পাইয়া অনেকেই ভিতরে আসিতেছিল, পাশের ঘরের প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি বলিল, পয়সা তো বেশি ছিল না মা, বোধ হয় সামান্য একটুখানি খেয়েচে,—আর খেয়েচে বোধ হয় বিকেল বেলায়। আমি যখন জানতে পারলুম তখনও কথা কইছিল।

রাখাল নাড়ী দেখিল, হাত দিয়া চোখের পাতা তুলিয়া পরীক্ষা করিল, বলিল, বোধ হয় ভয় নেই নতুন-মা, আমি একখানা গাড়ি ডেকে আনি, হাসপাতালে নিয়ে যাই।

বৌটি মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানাইল।

রাখাল বলিল, এভাবে মরে লাভ কি বলুন তো? আর, আত্মহত্যার মতো পাপ নেই তা কি কখনো শোনেন নি? যে স্ত্রীলোকটি বলিতেছিল, বাড়িতে ডাক্তার আনিয়া চিকিৎসার চেষ্টা করা উচিত, রাখাল তাহার জবাবে নতুন-মাকে দেখাইয়া কহিল, ইনি যখন এসেছেন তখন টাকার জন্যে ভাবনা নেই—একজনের জায়গায় দশজন ডাক্তার এনে হাজির করে দিতে পারি, কিন্তু তাতে সুবিধে হবে না নতুন-মা। আর, হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রাণটা যদি ওঁর বাঁচানো যায়, পুলিশের হাত থেকে দেহটাকেও বাঁচানো যাবে, এ ভরসা আপনাদের আমি দিতে পারি।

নতুন-মা সম্মত হইয়া বলিলেন, তাই করো বাবা, গাড়ি আমার দাঁড়িয়েই আছে, তুমি নিয়ে যাও।

তাঁহার আদেশে একজন দাসী সঙ্গে গিয়া পৌঁছাইয়া দিতে রাজী হইল। নতুন-মা রাখালের হাতে কতকগুলা টাকা গুঁজিয়া দিলেন।

সন্ধ্যা শেষ হইয়াছে, আসন্ন রাত্রির প্রথম অন্ধকারে রাখাল অর্ধ-সচেতন এই অপরিচিতা বধূটিকে জোর করিয়া গাড়িতে তুলিয়া হাসপাতালের উদ্দেশে যাত্রা করিল। পথের মধ্যে উজ্জ্বল গ্যাসের আলোকে এই মরণপথযাত্রী নারীর মুখের চেহারা তাহার মাঝে মাঝে চোখ পড়িয়া মনে হইতে লাগিল যেন ঠিক এমনটি সে আর কখনও দেখে নাই। তাহার জীবনে মেয়েদের সে অনেক

দেখিয়াছে। নানা বয়েসের, নানা অবস্থার, নানা চেহারার। একহারা, দোহারা, তেহারা, চারহারা—খেংরা-কাঠির ন্যায়, ঢ্যাঙা, বেঁটে—কালো, সাদা, হলদে, পাঁশুটে—চুল-বালা, চুল-ওঠা—পাস-করা, ফেল-করা—গোল ও লম্বা মুখের—এমন কত।

আত্মীয়তার ও পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতায় অভিজ্ঞতা তাহার পর্যাপ্তেরও অধিক। এদের সম্বন্ধে এই বয়সেই তাহার আদেখ্‌লে-পনা ঘুচিয়াছে। ঠিক বিতৃষ্ণা নয়, একটা চাপা অবহেলা কোথায় তাহার মনের এককোণে অত্যন্ত সঙ্গোপনে পুঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল, কাল তাহাতে প্রথমে ধাক্কা লাগিয়াছিল নতুন-মাকে দেখিয়া। তের বৎসর পূর্বেকার কথা সে প্রায় ভুলিয়াই ছিল, কিন্তু সেই নতুন-মা যৌবনের আর একপ্রান্তে পা দিয়া কাল যখন তাহার ঘরের মধ্যে গিয়া দেখা দিলেন, তখন সকৃতজ্ঞ-চিত্তে আপনাকে সংশোধন করিয়া এই কথাটাই মনে মনে বলিয়াছিল যে, নারীর সত্যকার রূপ যে কতবড় দুর্লভ-দর্শন তাহা জগতের অধিকাংশ লোকে জানেই না। আজ গাড়ির মধ্যে আলো ও আঁধারের ফাঁকে ফাঁকে মরণাপন্ন এই মেয়েটিকে দেখিয়া ঠিক সেই কথাটাই সে আর একবার মনে মনে আবৃত্তি করিল। বয়স উনিশ-কুড়ি, সাজসজ্জা-আভরণহীন দরিদ্র ভদ্র গৃহস্থের মেয়ে, অনশন ও অর্ধাশনে পাণ্ডুর মুখের ’পরে মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে—কিন্তু রাখালের মুগ্ধ চক্ষে মনে হইল, মরণ যেন এই মেয়েটিকে একেবারে রূপের পারে পৌঁছাইয়া দিয়াছে।

কিন্তু ইহা দেহের অক্ষুণ্ণ সুষমায়, না অন্তরের নীরব মহিমায়, রাখাল নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিল না। হাসপাতালে সে তার যথাসাধ্য,—সাধ্যেরও অধিক করিবে সঙ্কল্প করিল, কিন্তু এই দুঃখসাধ্য প্রচেষ্টার বিফলতার চিন্তায় করুণায় তাহার চোখের জল আসিয়া পড়িল। হঠাৎ সঙ্গিনী স্ত্রীলোকটির কাঁধের উপর হইতে মাথাটা টলিয়া পড়িতেছিল, রাখাল শশব্যস্তে হাত বাড়াইয়াই তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলাইয়া ফেলিল।

এই অপরিচিতার তুলনায় তাহার কত বড়-ঘরের মেয়েদেরই না এখন মনে পড়িতে লাগিল। সেখানে রূপের লোলুপতায় কি উগ্র অনাবৃত ক্ষুধা। দীনতার আচ্ছাদনে কত বিচিত্র আয়োজন, কত মহার্ঘ প্রসাধন—কি তার অপব্যয়! পরস্পরের ঈর্ষা-কাতর নেপথ্য-আলোচনায় কি জ্বালাই না সে বার বার চোখে দেখিয়াছে।

আর, সমাজের আর-একপ্রান্তে এই নিরাভরণ বধূটি? এই কুণ্ঠিতশ্রী, এই অদৃষ্টপূর্ব মাধুর্য ইহাও কি অহঙ্কৃত আত্মম্ভরিতায় তাহার উপহাসে কলুষিত করিবে?

সে ভাবিতে লাগিল, কি-জানি দায়গ্রস্ত কোন্ ভিখারী মাতা-পিতার কন্যা এ, কোন্ দুর্ভাগা কাপুরুষের হাতে ইহাকে তাহারা বিসর্জন দিয়াছিল। কি জানি, কতদিনের অনাহারে এই নির্বাক্ মেয়েটি আজ ধৈর্য হারাইয়াছে, তথাপি যে সংসার তাহাকে কিছুই দেয় নাই, ভিক্ষাপাত্র হাতে তাহাকে দুঃখ জানাইতে চাহে নাই। যতদিন পারিয়াছে মুখ বুজিয়া তাহারি কাজ, তাহারি সেবা করিয়াছে। হয়তো সে শক্তি আর নাই—সে শক্তি নিঃশেষিত—তাই কি আজ এ ধিক্কারে, বেদনায়, অভিমানে তাঁহারি কাছে নালিশ জানাইতে চলিয়াছে যে-বিধাতা তাঁর রূপের পাত্র উজাড় করিয়া দিয়া একদিন ইহাকে এ সংসারে পাঠাইয়াছিলেন?

কল্পনার জাল ছিঁড়িয়া গেল। রাখাল চকিত হইয়া দেখিল, হাসপাতালের আঙ্গিনায় গাড়ি আসিয়া থামিয়াছে। স্ট্রেচারের জন্য ছুটিতেছিল, কিন্তু মেয়েটি নিষেধ করিল। অবশিষ্ট সমগ্র শক্তি প্রাণপণে সজাগ করিয়া তুলিয়া সে ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, আমাকে তুলে নিয়ে যেতে হবে না, আমি আপনিই যেতে পারবো, এই বলিয়া সে সঙ্গিনীর দেহের ’পরে ভর দিয়া কোনমতে টলিতে টলিতে অগ্রসর হইল।

এখানে বৌটি কি করিয়া বাঁচিল, কি করিয়া আইনের উপদ্রব কাটিল, রাখাল কি করিল, কি দিল, কাহাকে কি বলিল, এ-সকল বিস্তারিত বিবরণ

অনাবশ্যক। দিন চার-পাঁচ পরে রাখাল কহিল, কপালে দুঃখ যা লেখা ছিল তা ভোগ হলো, এখন বাড়ি চলুন।

মেয়েটি শান্ত কালো চোখদুটি মেলিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না। রাখাল কহিল, এখানকার শিক্ষিত, সুসভ্য সাম্প্রদায়িক বিধি-নিয়মে আপনার নাম হলো মিসেস চকারবুটি, কিন্তু এ অপমান আপনাকে করতে পারবো না। অথচ মুশকিল এই যে, কিছু-একটা বলে ডাকাও ত চাই।

শুনিয়া মেয়েটি একেবারে সোজা সহজ গলায় বলিল, কেন, আমার নাম যে সারদা। কিন্তু আমি কত ছোট, আমাকে আপনি বললে আমার বড় লজ্জা করে।

রাখাল হাসিয়া বলিল, করার কথাই ত। আমি বয়সে কত বড়। তা হলে, যাবার প্রস্তাবটা আমাকে এইভাবে করতে হয়—সারদা, এবার তুমি বাড়ি চলো।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, আমি আপনাকে কি বলে ডাকবো? নাম তো করা চলে না?

রাখাল বলিল, না চললেও উপায় আছে। আমার পৈতৃক নাম রাখাল—রাখাল-রাজ। তাই ছেলেবেলায় নতুন-মা ডাকতেন রাজু বলে। এর সঙ্গে একটা 'বাবু' জুড়ে দিয়ে তো অনায়াসে ডাকা চলে সারদা।

মেয়েটি মাথা নাড়িয়া বলিল, ও একই কথা। আর গুরুজনেরা যা বলে ডাকেন তাই হয় নাম। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণকে বলে দেবতা। আমিও আপনাকে দেব্‌তা বলে ডাকবো।

ইঃ! বলো কি? কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব আমার যে কানাকড়ির নেই সারদা!

নেই থাক। কিন্তু দেবতাত্ব যোল আনায় আছে। আর, ব্রাহ্মণের ভালো-মন্দর আমরা বিচার করিনে, করতেও নেই।

জবাব শুনিয়া, বিশেষ করিয়া বলার ধরনটায় রাখাল মনে মনে একটু বিস্মিত হইল।

সারদা পল্লীগ্রামের কোন্ এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের মেয়ে, সুতরাং যতটা অশিক্ষিতা ও অমার্জিতা বলিয়া সে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল ঠিক ততটা এখন মনে করিতে পারিল না। আর একটা বিষয় তাহার কানে বাজিল। পল্লীগ্রামে শূদ্ররাই সাধারণতঃ ব্রাহ্মণকে দেবতা বলিয়া সম্বোধন করে, তাহার নিজের গ্রামেও ইহার প্রচলন আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ-কন্যার মুখে এ যেন তাহার কেমন-কেমন ঠেকিল। তবে এক্ষেত্রে বিশেষ-কোন অর্থ যদি মেয়েটির মনে থাকে ত সে স্বতন্ত্র কথা। কহিল, বেশ, তাই বলেই ডেকো, কিন্তু এখন বাড়ি চলো। এরা আর তোমাকে এখানে রাখবে না।

মেয়েটি অধোমুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

রাখাল ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া কহিল, কি বলো সারদা, বাড়ি চলো?

এবার সে মুখ তুলিয়া চাহিল। আস্তে আস্তে বলিল, আমি বাড়ি-ভাড়া দেবো কি করে? তিন-চার মাসের বাকী পড়ে আছে, আমরা তাও ত দিতে পারিনি।

রাখাল হাসিয়া কহিল, সেজন্যে ভাবনা নেই।

সারদা সবিস্ময়ে কহিল, নেই কেন?

না থাকবার কারণ, বাড়ি-ভাড়া তোমার স্বামী দেবেন। লজ্জায়, অভাবের জ্বালায় বোধ হয় কোথাও লুকিয়ে আছেন, শীঘ্রই ফিরে আসবেন, কিংবা হয়তো এসেছেন, আমরা গিয়েই দেখতে পাবো।

না, তিনি আসেন নি।

না এসে থাকলেও আসবেন নিশ্চয়ই।

সারদা বলিল, না, তিনি আসবেন না।

আসবেন না? তোমাকে একলা ফেলে রেখে চিরকালের মতো পালিয়ে যাবেন—এ কি কখনো হতে পারে? নিশ্চয় আসবেন।

না।

না? তুমি জানলে কি করে?

আমি জানি।

তাহার কণ্ঠস্বরের প্রগাঢ়তায় তর্ক করিবার কিছু রহিল না। রাখাল স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বলিল, তা হলে হয় তোমার শ্বশুরবাড়ি, নয় তোমার বাপের বাড়িতে চলো। আমি পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেবো।

মেয়েটি নিঃশব্দ নতমুখে বসিয়া রহিল, উত্তর দিল না।

রাখাল একমুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া বলিল, কোথায় যাবে, শ্বশুরবাড়ি?

মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

তবে কি বাপের বাড়ি যেতে চাও?

সে তেমনি মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

রাখাল অধীর হইয়া উঠিল—এ তো বড় মুশকিল! এখানকার বাসাতেও যাবে না, শ্বশুরবাড়িতেও যাবে না, বাপের ঘরেও যেতে চাও না,—কিন্তু চিরকাল হাসপাতালে থাকবার ত ব্যবস্থা নেই সারদা। কোথাও যেতে হবে ত?

প্রশ্নটা শেষ করিয়াই সে দেখিতে পাইল মেয়েটির হাঁটুর কাছে অনেকখানি কাপড় চোখের জলে ভিজিয়া গেছে এবং এইজন্যই সে কথা না কহিয়া শুধু মাথা নাড়িয়াই এতক্ষণ প্রশ্নের উত্তর দিতেছিল।

ও কি সারদা, কাঁদচো কেন, আমি অন্যায় ত কিছু বলিনি!

শুনিবামাত্র সে তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিল, কিন্তু তখনি কথা কহিতে পারিল না। রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিতে সময় লাগিল, কহিল, আমি ভাবতে আর পারিনে—আমাকে মরতেও কেউ দিলে না।

রাখাল মনে মনে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু শেষ কথাটায় বিরক্ত হইল—এ অভিযোগটা যেন তাহাকেই। তথাপি কণ্ঠস্বর পূর্বের মতই সংযম রাখিয়া বলিল, মানুষে একবারই বাধা দিতে পারে সারদা, বার বার পারে না। যে মরতেই চায় তাকে কিছুতেই বাঁচিয়ে রাখা যায় না।আর ভাবতেই যদি চাও, তারও অনেক

সময় পাবে। এখন বরঞ্চ বাসায় চলো, আমি গাড়ি ডেকে এনে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। আমার আরো ত অনেক কাজ আছে।

খোঁচাগুলি মেয়েটি অনুভব করিল কিনা বুঝা গেল না, রাখালের মুখের পানে চাহিয়া বলিল, আমি যে ভাড়া দিতে পারবো না দেব্‌তা।

না পারো দিও না।

আপনি কি মাকে বলে দেবেন?

রাখাল কহিল, না। ছেলেবেলায় বাবা মারা গেলে তোমার মতো নিঃসহায় হয়ে আমিও একদিন তাঁর কাছে ভিক্ষে চাইতে যাই। ভিক্ষে কি দিলেন জানো? যা প্রয়োজন, যা চাইলাম,—সমস্ত। তারপরে হাত ধরে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে এলেন,—অন্ন দিয়ে বস্ত্র দিয়ে, বিদ্যে দান করে আমাকে এত বড় করলেন। আজ তাঁরই কাছে যাবো পরের হয়ে দয়ার আর্জি পেশ করতে? না, তা করব না। যা করা উচিত তিনি আপনি করবেন, কাউকে তোমার সুপারিশ ধরতে হবে না।

মেয়েটি অল্পক্ষণ মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, আপনাকে কখনো ত এ বাড়িতে দেখিনি?

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কতদিন এ বাড়িতে এসেছো?

প্রায় দু'বছর।

রাখাল কহিল, এর মধ্যে আমার আসার সুযোগ হয়নি।

মেয়েটি আবার কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিল, কলকাতায় কত লোকে চাকরি করে, আমার কি কোথাও একটা দাসীর কাজ যোগাড় হতে পারে না?

রাখাল বলিল, পারে। কিন্তু তোমার বয়স কম, তোমার উপর উপদ্রব ঘটতে পারে। তোমাদের ঘরের ভাড়া কত?

সারদা কহিল, আগে ছিল ছ' টাকা, কিন্তু এখন দিতে হয় শুধু তিন টাকা।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ কমে গেল কেন? বাড়ি-আলাদের তো এ স্বভাব নয়।

সারদা বলিল, জানিনে। বোধ হয় ইনি কখনো তাঁর দুঃখ জানিয়ে থাকবেন।

রাখাল লাফাইয়া উঠিল, বলিল, তবেই দেখো। আমি বলচি তোমার ভাবনা নেই, তুমি চল। আচ্ছা তোমার খেতে-পরতে মাসে কত লাগে?

সারদা চিন্তা না করিয়াই কহিল, বোধ হয় আরও তিন-চার টাকা লাগবে।

রাখাল হাসিল, কহিল, তুমি বোধ হয় একবেলা খাবার কথাই ভেবে রেখেচো সারদা, কিন্তু তা-ও কুলোবে না। আচ্ছা, তুমি কি বাংলা লেখাপড়া জানো না?

সারদা কহিল, জানি। আমার হাতের লেখাও বেশ স্পষ্ট।

রাখাল খুশি হইয়া উঠিল, কহিল, তা হলে তো কোন চিন্তাই নেই। তোমাকে আমি লেখা এনে দেবো, যদি নকল করে দাও, তোমাকে দশ-পনেরো-কুড়ি টাকা পর্যন্ত আমি স্বচ্ছন্দে পাইয়ে দিতে পারবো; কিন্তু যত্ন করে লিখতে হবে, বেশ স্পষ্ট আর নির্ভুল হওয়া চাই। কেমন, পারবে তো?

সারদা প্রত্যুত্তরে শুধু মাথা নাড়িল, কিন্তু আনন্দে তাহার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দেখিয়া রাখালের আর একবার চমক লাগিল। অন্ধকার গৃহের মধ্যে আকস্মিক বিদ্যুদ্দীপালোকে এই মেয়েটির আশ্চর্য রূপে যেন সে একটা অত্যাশ্চর্য মূর্তির সাক্ষাৎ লাভ করিল।

রাখাল কহিল, যাই, এবার গাড়ি ডেকে আনি গে?

মেয়েটি বলিল, হাঁ আনুন। আর আমার ভাবনা নেই। বোধ হয়, এইজন্যেই আমি যেতে পেলাম না, ভগবান আমাকে ফিরিয়ে দিলেন।

রাখাল গাড়ি আনিতে গেল, ভাবিতে ভাবিতে গেল, সারদা আমাকে বিশ্বাস করিয়াছে।

একদিকে এই কটি টাকা, আর একদিকে—? তুলনা করিতে পারে এমন কিছুই তাহার মনে পড়িল না।

বাসায় পৌঁছিয়া রাখাল নতুন-মার সন্ধানে উপরে গিয়া শুনিল তিনি বাড়ি নাই। কখন এবং কোথায় গিয়াছেন দাসী খবর দিতে পারিল না। কেবল এইটুকু বলিতে পারিল যে, বাড়ির মোটরখানা আস্তাবলেই পড়িয়া আছে, সুতরাং হয় তিনি আর কোন গাড়ি পথের মধ্যে ভাড়া করিয়া লইয়াছেন, না হয় পায়ে হাঁটিয়াই গেছেন।

রাখাল উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সঙ্গে কে গেছে?

দাসী কহিল, কেউ না। দরোয়ানজীকেও দেখলুম বাইরে বসে আছে।

আর নবীনবাবু?

দাসী কহিল, আমাদের বাবু, তিনি ত রোজ আসেন না। এলেও রাত্রি নটা-দশটা হয়।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, রোজ আসেন না তার মানে? না এলে থাকেন কোথায়?

দাসী একটুখানি মুখ টিপিয়া হাসিল, কহিল, কেন, তাঁর কি বাড়ি-ঘরদোর নেই নাকি?

রাখাল আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল না, মনে মনে বুঝিল আসল ব্যাপারটা ইহাদের অজানা নয়। নীচে আসিয়া দেখিল সারদাকে ঘিরিয়া সেখানে মেয়েদের প্রকাণ্ড ভিড়। আর শিশুর দল, যাহারা তখন পর্যন্ত ঘুমায় নাই, তাহাদের আনন্দ-কলরোলে হাট বসিয়া গেছে। তাহাকে দেখিয়া সকলেই সরিয়া গেল,—যে-প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটির জিম্মায় সারদার ঘরের চাবি ছিল সে আসিয়া তালা খুলিয়া দিয়া গেল।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, তোমার স্বামীর কোন খবর পাওয়া যায়নি?

সারদা কহিল, না।

আশ্চর্য!

না, আশ্চর্য এমন আর কি।

বলো কি সারদা, এর চেয়ে বড় আশ্চর্য আর কিছু আছে নাকি?

সারদা ইহার জবাব দিল না। কহিল, আমি আলোটা জ্বালি, আপনি আমার ঘরে এসে একটু বসুন। ততক্ষণ মাকে একবার প্রণাম করে আসি গে।

রাখাল কহিল, মা বাড়ি নেই।

সারদা কহিল, নেই? কোথাও গেছেন বোধ করি। হয় কালীঘাটে, নয় দক্ষিণেশ্বরে—এমন প্রায়ই যান—কিন্তু এখনি ফিরবেন। আমি আলোটা জ্বালি, হাত-মুখ ধোবার জল এনে দিই,—একটু বসুন, আমার ঘরে আপনার পায়ের ধুলো পড়ুক।

রাখাল সহাস্যে কহিল, পায়ের ধুলো পড়তে বাকি নেই সারদা, সে আগেই পড়ে গেছে।

সারদা বলিল, সে জানি। কিন্তু সে আমার অজ্ঞানে—আজ সজ্ঞানে পড়ুক আমি চোখে দেখি।

রাখাল কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। কথাটা অভাবনীয়ও নয়, অবাক হইবার মতোও নয়—সে তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচাইয়াছে, এবং বাঁচিবার পথ দেখাইয়া দিয়াছে—এই মেয়েটি পল্লীগ্রামের যত অল্প-শিক্ষিতাই হউক, তাহার সকৃতজ্ঞ চিত্ত-তলে এমন একটি সকরুণ প্রার্থনা নিতান্তই স্বাভাবিক; কিন্তু কথাটির জন্য ত নয়, বলিবার অপরূপ বিশিষ্টতায় রাখাল অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করিল, এবং বহু পরিচিত রমণীর মুখ ও বহু পরিচিত কণ্ঠস্বর তাহার চক্ষের পলকে মনে পড়িয়া গেল। একটু পরে বলিল, আচ্ছা, আলো জ্বালো; কিন্তু আজ আমার কাজ আছে—কাল-পরশু আবার আমি আসবো।

আলো জ্বালা হইলে সে ক্ষণকালের জন্য ভিতরে আসিয়া তক্তপোশে বসিল, পকেট হইতে কয়েকটা টাকা বাহির করিয়া পাশে রাখিয়া দিয়া কহিল, এটা তোমার পারিশ্রমিকের সামান্য কিছু আগাম সারদা।

কিন্তু আমাকে দিয়ে আপনার কাজ চলে তবেই ত? প্রথমে হয়তো খারাপ হবে কিন্তু আমি নিশ্চয় শিখে নেবো। দেখবেন আমার হাতের লেখা? আনবো কালি-কলম? বলিয়া সে তখনি উঠিতেছিল, কিন্তু রাখাল ব্যস্ত হইয়া বাধা দিল,— না না, এখন থাক। আমি জানি তোমার হাতের লেখা ভালো, আমার বেশ কাজ চলে যাবে।

সারদা একটুখানি শুধু হাসিল। জিজ্ঞাসা করিল, আপনার বাড়িতে কে কে আছেন দেব্‌তা?

রাখাল জবাব দিল, এখানে আমার তো বাড়ি নয়, আমার বাসা। আমি একলা থাকি।

তাঁদের আনেন না কেন?

রাখাল বিপদে পড়িল। এ প্রশ্ন তাহাকে অনেকেই করিয়াছে, জবাব দিতে সে চিরদিনই কুণ্ঠা বোধ করিয়াছে; ইহারও উত্তরে বলিল, শহরে আনা কি সহজ?

সহজ যে নয় এ কথা মেয়েটি নিজেই জানে। হয়তো তাহারও কোন পল্লী অঞ্চলের কথা মনে পড়িল, একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এখানে কে তবে আপনার কাজ করে দেয়?

রাখাল বলিল, ঝি আছে।

রাঁধে কে? বামুনঠাকুর?

রাখাল সহাস্যে কহিল, তবেই হয়েছে। সামান্য একটি প্রাণীর রান্নার জন্যে একটা গোটা বামুনঠাকুর? আমি নিজেই করে নিই। কুকার বলে একটা জিনিসের নাম শুনেচো? তাতে আপনি রান্না হয়। শুধু খাবার সামগ্রীগুলো সাজিয়ে রেখে দিলেই হোল।

সারদা বলিল, আমি জানি। তারপরে খাওয়া হয়ে গেলে ঝি মেজে-ধুয়ে রেখে দিয়ে যায়?

হাঁ, ঠিক তাই।

সে আর কি কি কাজ করে?

রাখাল কহিল, যা দরকার সমস্ত করে দেয়। আমি তাকে বলি নানী—আমাকে কোনকিছু ভাবতে হয় না। আচ্ছা, তোমার আজ কি খাওয়া হবে বলো তো? ঘরে জিনিসপত্র তো কিছু নেই, দোকান থেকে আনিয়ে দিয়ে যাবো?

সারদা বলিল, না। আজ আমার সকলের ঘরে নেমন্তন্ন। কিন্তু আপনাকে গিয়ে ত রান্নার চেষ্টা করতে হবে?

রাখাল কহিল, না, হবে না। যে করবার সে করে রেখেচে।

আচ্ছা, ধরুন যদি তার অসুখ হয়ে থাকে?

না হয়নি। তার বুড়ো-হাড় খুব মজবুত। তোমাদের মতো অল্পে ভেঙ্গে পড়ে না।

কিন্তু দৈবাতের কথা তো বলা যায় না, হতেও তো পারে—তা হলে?

রাখাল হাসিয়া বলিল, তা হলেও ভাবনা নেই। আমার বাসার কাছেই ময়রার দোকান, সে আমাকে ভালবাসে, কষ্ট পেতে দেয় না।

সারদা কহিল, আপনাকে সবাই ভালবাসে। তখনি বলিল, আপনি চা খেতে খুব ভালবাসেন—

কে তোমাকে বললে?

আপনি নিজেই সেদিন হাসপাতালে বলছিলেন। আপনার মনে নেই। অনেকক্ষণ তো কিছু খাননি, তৈরি করে আনবো? একটুখানি বসবেন?

কিন্তু চায়ের ব্যবস্থা তো তোমার ঘরে নেই, কোথায় পাবে?

সে আমি খুব পাবো, বলিয়া সারদা দ্রুতপদে উঠিয়া যাইতেছিল, রাখাল তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিল, এমন সময়ে চা আমি খাইনে সারদা, আমার সহ্য হয় না।

তবে কিছু খাবার আনিয়ে দিই—দেবো? অনেকক্ষণ কিছু খাননি, নিশ্চয় আপনার খুব ক্ষিদে পেয়েছে।

কিন্তু কে এনে দেবে? তোমার তো লোক নেই।

আছে। হারু আমার খুব কথা শোনে, তাকে বললেই ছুটে যাবে। বলিয়াই সে আবার তেমনি ব্যস্ত হইয়া উঠিতে যাইতেছিল, কিন্তু এবারও রাখাল বারণ করিল।

সারদা জিদ করিল না বটে, কিন্তু তাহার বিষণ্ণ মুখের পানে চাহিয়া রাখালের আবার সেই সকল বহু-পরিচিত মেয়েদের মুখ মনে পড়িল। ইহাদের মধ্যে তাহার অনেক আনাগোনা, অনেক জানাশুনা, অনেক সভ্যতা ভদ্রতার দেনা-পাওনা, কিন্তু ঠিক এই জিনিসটি সে যেন অনেকদিন হইল ভুলিয়া আছে।

তাহার নিজের জননীর স্মৃতি অত্যন্ত ক্ষীণ, অতি শৈশবেই তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন,—একখানি খোড়ো-ঘরের দাওয়ায় বেড়া দিয়া ঘেরা একটু ছোট্ট রান্নাঘর, সেখানে রাঙ্গা-পাড়ের কাপড়-পরা কে যেন রন্ধন করিতেন—হয়তো ইহাই সবটুকুই তাহার কল্পনা—কিন্তু সে তাহার মা—সেই মায়ের একান্ত অস্ফুট মুখের ছবিখানি আজ হঠাৎ যেন তাহার চোখে পড়িতে লাগিল। মনের ভিতরটা কেমনধারা করিয়া উঠিতেই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কিছু মনে করো না সারদা, আজ আমি যাই। আবার যেদিন সময় পাবো আমি নিজে চেয়ে তোমার চা, তোমার জলখাবার খেয়ে যাবো।

সারদা গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া বলিল, আমার লেখার কাজটা কবে এনে দেবেন?

এর মধ্যেই একদিন দিয়ে যাবো।

আচ্ছা।

তথাপি কিসের জন্য সে যেন ইতস্ততঃ করিতেছে অনুমান করিয়া রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আর কিছু বলবে?

সারদা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, প্রথমে হয়তো আমার ঢের ভুল হবে। আপনি কিন্তু রাগ করবেন না। রাগ করে আমাকে ফেলে দিলে আর আমার দাঁড়াবার জায়গা নেই।

তাহার সভয় কণ্ঠের সকাতর প্রার্থনায় করুণায় বিগলিত হইয়া রাখাল বলিল, না সারদা, আমি রাগ করবো না। তুমি কিন্তু শিখে নেবার চেষ্টা কোরো।

প্রত্যুত্তরে এবার সে শুধু মাথা নাড়িয়া সায় দিল। তারপরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ফিরিবার পথটা রাখাল হাঁটিয়াই চলিল। ট্রামের গাড়িতে অনেকের মধ্যে গিয়া বসিতে আজ তাহার কিছুতেই ইচ্ছা হইল না।

সে গরীব লোক, উল্লেখ করিবার মতো বিদ্যার পুঁজিও নাই, নাম করিবার মতো আত্মীয়-স্বজনও নাই, তবুও সে যে এই শহরে বহু গৃহে, বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারে আপনজন হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল সে কেবল তাহার নিজের গুণে। তাঁহাদের স্নেহ, সহৃদয়তার অভাব ছিল না, অনুকম্পাও প্রচুর ছিল, কিন্তু অন্তর্নিহিত একটা অনির্দিষ্ট উপেক্ষার ব্যবধানে কেহ তাহাকে এর চেয়ে কাছে টানিয়া কোনদিন লয় নাই। কারণ, সে ছিল শুধু রাখাল—তার বেশি নয়। ছেলে-ঠেলে পড়ায়, মেসে-টেসে থাকে। সেটা কোন্‌খানে না জানিলেও তাহার বাসার ঠিকানায় বরানুগমনের আমন্ত্রণলিপি ডাক-যোগে অনেক আসে। প্রীতিভোজের নিমন্ত্রণে নাম তাহার বাদ যায় না, এবং না গেলে সেদিনে না হউক, দু'দিন পরেও এ কথা তাঁহাদের মনে পড়ে। কাজের বাড়িতে তাহার অনুপস্থিতি বস্তুতঃই বড় বিসদৃশ; জীবনে অনেক বিবাহের ঘটকালি সে করিয়াছে, অনেক পাত্র-পাত্রী খুঁজিয়া বাছিয়া দিয়াছে—সে পরিশ্রমের সীমা নাই। হর্ষাপ্লুত পিতা-মাতা সাধুবাদে দুই কান পূর্ণ করিয়া তাহাকে বলিয়াছে, রাখাল বড় ভালো লোক, রাখাল বড় পরোপকারী। কৃতজ্ঞতার পারিতোষিক এমনি করিয়া চিরদিন এইখানেই সমাপ্ত হইয়াছে। এজন্য বিশেষ কোন অভিযোগ যে তাহার ছিল তাও নয়। শুধু, কখনো

হয়তো চাকরির নিষ্ফল উমেদারির দিনগুলা মাঝে মাঝে মনে পড়িত। কিন্তু সে এমনই বা কি!

ভিড়ের মধ্যে চলিতে চলিতে আজ আবার বার বার সেই-সকল বহু-পরিচিত মেয়েদের কথা মনে পড়িতে লাগিল। তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, হাবভাব, আলাপ-আলোচনা। পড়াশুনা, হাসি-কান্না—এমন কত কি! ব্যক্ত-অব্যক্ত কত না চঞ্চল প্রণয়কাহিনী, মিলন-বিচ্ছেদের কত না অশ্রুসিক্ত বিবরণ!

কিন্তু রাখাল? বেচারা বড় ভালো লোক, বড় পরোপকারী। ছেলে-টেলে পড়ায়—মেসে-টেসে থাকে।

আর আজ? কি বলিল সারদা? বলিল, দেব্‌তা, আমার অনেক ভুল হবে, কিন্তু তুমি ফেলে দিলে আমার আর দাঁড়াবার স্থান নেই।

হয়তো সত্যই নাই! কিংবা—? হঠাৎ তাহার ভারী হাসি পাইল। নিজের মনেই খিলখিল করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, রাখাল বড় ভালো লোক—রাখাল বড় পরোপকারী।

পাশের অপরিচিত পথিক অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া সেও হাসিয়া ফেলিল। লজ্জিত রাখাল আর একটা গলি দিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

পাঁচ

বাসায় পৌঁছিয়া রাখাল দুইখানা পত্র পাইল—দুই-ই বিবাহের ব্যাপার। একখানায় ব্রজবিহারী জানাইয়াছেন, রেণুর বিবাহ এখন স্থগিত রহিল এবং সংবাদটা নতুন-বৌকে যেন জানানো হয়। অন্যান্য কয়েকটা মামুলি কথার পরে তিনি চিঠির শেষের দিকে লিখিয়াছেন, নানা হাঙ্গামায় সম্প্রতি অতিশয় ব্যস্ত, আগামী শনিবারে বিকালের দিকে নিজে তোমার বাসায় গিয়া সমুদয় বিষয় বিস্তারিত মুখে বলিব। দ্বিতীয় পত্র আসিয়াছে কর্তার নিকট হইতে। অর্থাৎ যাঁহার ছেলে-মেয়েকে সে পড়ায়। ভাইপোর বিবাহ হঠাৎ স্থির হইয়াছে দিল্লীতে, কিন্তু অতদূরে যাওয়া তাঁহার নিজের পক্ষে সম্ভবপর নয় এবং তেমন বিশ্বাসী লোকও কেহ নাই, সুতরাং বরকর্তা সাজিয়া রাখালকেই রওনা হইতে হইবে। সামনের রবিবারে যাত্রা না করিলেই নয়, অতএব শীঘ্র আসিয়া দেখা করিবে। এই কয়দিনের কামাইয়ের জন্য যে তিনি ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার ক্ষতির উল্লেখ করেন নাই, ইহাই রাখাল যথেষ্ট মনে করিল। সেই যাই হউক, মোটের উপর দুইটি খবরই ভালো। রেণুর বিবাহব্যাপারে তাহার মনের মধ্যে যথেষ্ট উদ্বেগ ছিল। 'এখন স্থগিত' থাকার অর্থ বেশ স্পষ্ট না হইলেও, পাগল বরের সহিত বিবাহ হইয়া যে চুকিয়া যায় নাই, ইহাতেই সে পুলকিত হইল, দ্বিতীয়, দিল্লী যাওয়া। ইহাও নিরানন্দের নহে। সেখানে প্রাচীনদিনের বহু স্মৃতিচিহ্ন বিদ্যমান, এতদিন সে-সকল কথা কেবল পুস্তকে পড়িয়াছে ও লোকের মুখে শুনিয়াছে, এবার এই উপলক্ষে সমস্ত চোখে দেখা ঘটিবে।

পরদিন সকালেই সে চিঠি লইয়া নতুন-মার সঙ্গে দেখা করিল, তিনি হাসিমুখে জানাইলেন শুভ-সংবাদ পূর্বাহ্নেই অবগত হইয়াছেন, কিন্তু বিস্তারিত বিবরণের অপেক্ষায় অনুক্ষণ অধীর হইয়া আছেন। একটা প্রবল অন্তরায় যে

ছিলই তাহা নিঃসন্দেহ, তথাপি কি করিয়া যে ঐ শান্ত দুর্বল প্রকৃতির মানুষটি একাকী এতবড় বাধা কাটাইয়া উঠিল তাহা সত্যিই বিস্ময়কর।

রাখাল কহিল, রেণু নিশ্চয়ই তার বাপের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল নতুন-মা, নইলে কিছুতে এ বিয়ে বন্ধ করা যেতো না।

নতুন-মা আস্তে আস্তে বলিলেন, জানিনে তো তাকে, হতেও পারে বাবা।

রাখাল জোর দিয়া বলিল, কিন্তু আমি তো জানি। তুমি দেখে নিয়ো মা, আমার অনুমানই সত্যি। সে নিজে ছাড়া হেমন্তবাবুকে কেউ থামাতে পারতো না।

নতুন-মা আর তর্ক করিলেন না, বলিলেন, যাই হোক, শনিবার বিকালে আমিও তোমার ওখানে গিয়ে হাজির থাকবো রাজু, সব ঘটনা নিজের কানেই শুনবো। আরও একটা কাজ হবে বাবা, আর একবার তোমার কাকাবাবুর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে আসতে পারবো।

তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া সে নীচে একবার সারদার ঘরটা ঘুরিয়া গেল, দেখিল, ইতিমধ্যেই সে ছেলেদের কাছে কাগজ-কলম চাহিয়া লইয়া নিবিষ্ট মনে হাতের লেখা পাকাইতে বসিয়াছে। রাখালকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া এ-সকল সে লুকাইবার চেষ্টা করিল না, বরঞ্চ, যথোচিত মর্যাদার সহিত তাহাকে তক্তপোশে বসাইয়া কহিল, দেখুন তো দেব্‌তা, এতে কি আপনার কাজ চলবে?

সারদার হস্তাক্ষর যে এতখানি সুস্পষ্ট হইতে পারে রাখাল ভাবে নাই, খুশি হইয়া বার বার প্রশংসা করিয়া কহিল, এ আমার নিজের লেখার চেয়েও ভাল সারদা, আমাদের খুব কাজ চলে যাবে। তুমি যত্ন করে লেখাপড়া শেখ, তোমার খাওয়া-পরার ভাবনা থাকবে না। হয়তো, তুমিই কত লোকের খাওয়া-পরার ভার নেবে।

শুনিয়া অকৃত্রিম আনন্দে মেয়েটির মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। রাখাল মিনিট-দুই নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া পকেট হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া বলিল, টাকাটা তুমি কাছে রাখো সারদা, এ তোমারই। আমি এক

বন্ধুর বিয়ে দিতে দিল্লী যাচ্চি, ফিরতে বোধ হয় দশ-বারো দিন দেরি হবে—এসে তোমার লেখা এনে দেবো—কি বলো? কিচ্ছু ভেবো না—কেমন?

সারদা কহিল, আমার টাকার এখন দরকার ছিল না দেব্‌তা—সে-ই এখনও খরচ হয়নি।

তা হোক, তা হোক—এ টাকাও আপনিই শোধ হয়ে যাবে। যদি হঠাৎ আবশ্যক হয়, কার কাছে চাইবে বলো? কিন্তু আমার জন্যে চিন্তা কোরো না যেন, আমি যত শীঘ্র পারি চলে আসবো। এসেই তোমাকে লেখা দিয়ে যাবো।

সারদার নিকট বিদায় লইয়া রাখাল তাহার মনিব-বাটীতে উপস্থিত হইল, সেখানে কর্তা-গৃহিণী ও তাহাতে বহু বাদানুবাদের পর স্থির হইল, সমস্ত দলবল লইয়া তাহাকে রবিবার রাত্রির গাড়িতেই যাত্রা করিতে হইবে। গৃহিণী বলিয়া দিলেন, রাখাল, তোমার নিজের বন্ধু-বান্ধব কেউ যেতে চায় তো স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেয়ো,—সব খরচ তাদের। মনে রেখো, এ-পক্ষের তুমিই কর্তা, টাকাকড়ি, গয়নাগাঁটি, জিনিসপত্র, সমস্ত দায়িত্ব তোমার।

রাখালের সর্বাগ্রে মনে পড়িল তারককে। সে হুঁশিয়ার লোক, তাহাকে সঙ্গে লইতে হইবে, বিনা খরচায় এ সুযোগ নষ্ট করা হইবে না। কেবল একটা আশঙ্কা ছিল লোকটার একঝোঁকা নৈতিক বুদ্ধিকে। সেখানে উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন উঠিয়া পড়িলে তাহাকে রাজি করানো কঠিন হইবে; কিন্তু ইতিমধ্যে সে যে মাস্টারি লইয়া বর্ধমানে চলিয়া যাইতে পারে এ কথা তাহার মনেও হইল না। কারণ, তাহার ফিরিয়া আসার অপেক্ষা করিতে না পারুক, একখানা চিঠি লিখিয়াও রাখিয়া যাইবে না এমন হইতেই পারে না। রবিবারের এখনো তিনদিন বাকি, ইহার মধ্যে সে আসিয়া দেখা করিবেই, না হয় কাল একবার সময় করিয়া তাহাকে নিজেই তারকের মেসে গিয়া খবরটা দিয়া আসিতে হইবে। বাসায় ফিরিয়া রাখাল নানা কাজে ব্যাপৃত হইয়া পড়িল। সে শৌখিন মানুষ, এ-কয়দিনের অবহেলায় ঘরের বহু বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, যাবার পূর্বে সে-সকল ঠিক করিয়া

ফেলা চাই। সাহেববাড়ি হইতে একটা ভালো তোরঙ্গ কেনা প্রয়োজন, বিদেশে চাবি খুলিয়া কেহ কিছু চুরি করিতে না পারে। বরকর্তার উপযুক্ত মর্যাদার জামা-কাপড় আলমারিতে কি-কি আছে দেখা দরকার, না থাকিলে তাড়াতাড়ি তৈরি করাইয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক। আর শুধু তারক ত নয়, যোগেশবাবুকেও একবার বলিতে হইবে। তাঁহার পশ্চিমে যাইবার অনেকদিনের শখ, কেবল অর্থাভাবেই মিটাইতে পারেন না। অফিসের বড়বাবুকে ধরিয়া যদি দিন-দশেকের ছুটি মঞ্জুর করানো যায় তো যোগেশ আজীবন কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে। মনিবগৃহেও অন্ততঃ একবারও যাওয়া চাই, না হইলে ছোটখাটো ভুলচুক ধরা পড়িবে কেন? আলোচনা দরকার, কারণ বিদেশে সমস্ত দায়িত্বই যে একা তাহার। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে এত কাজ কি করিয়া যে সে সম্পন্ন করিবে ভাবিয়া পাইল না। শনিবারের বিকালটা তো কেবল নতুন-মা ও ব্রজবাবুর জন্যই রাখিতে হইবে, সেদিন হয়তো কিছুই করা যাইবে না। ইতিমধ্যে মনে করিয়া পোস্টাফিস হইতে কিছু টাকা তুলিতে হইবে, কারণ নিজের সম্বল না লইয়া পথ চলা বিপজ্জনক। কাজের ভিড়ে ও তাগাদায় রাখাল চোখে যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিল; কিন্তু একটা কান তাহার অনুক্ষণ দরজায় পড়িয়াই থাকে—তারকের কড়া নাড়া ও কণ্ঠস্বরের প্রতীক্ষায়, কিন্তু তাহার দেখা নাই। এদিকে বৃহস্পতিবার পার হইয়া শুক্রবার আসিয়া পড়িল। দুপুরবেলা পোস্টাফিসে গেল সে টাকা তুলিতে। কিছু বেশি তুলিতে হইবে। মনে ছিল, যদি তারক বলিয়া বসে তাহার বাহিরে যাইবার মতো জামা-কাপড় নাই, তা হইলে কোনমতে এই বাড়তি টাকাটা তাহার হাতে গুঁজিয়া দিতে হইবে। এতে মুশকিল আছে। সে না করে ধার, না চায় দান, না লয় উপহার। একটা আশা, রাখালের পীড়াপীড়িতে সে অবশেষে হার মানে। সময় নষ্ট করা চলিবে না। পোস্টাফিস হইতেই একটা ট্যাক্সি লইতে হইবে। তারক একটু রাগ করিবে বটে—তা করুক।

কিন্তু টাকা তুলিতে অযথা বিলম্ব ঘটিল। বিরক্ত-মুখে বাহিরে আসিয়া গাড়ি ভাড়া করিতেছে, পাড়ার পিয়ন হাতে একখানা চিঠি দিল। লেখা তারকের। খুলিয়া দেখিল, সে বর্ধমানের কোন্ এক পল্লীগ্রাম হইতে সেই হেডমাস্টারির খবর দিয়াছে এবং আসিবার পূর্বে দেখা করিয়া আসিতে পারে নাই বলিয়া দুঃখ জানাইয়াছে। নতুন-মা ও ব্রজবাবুকে প্রণাম নিবেদন করিয়াছে, এবং পত্রের উপসংহারে আশা করিয়াছে, অনতিকাল মধ্যেই দিন-কয়েকের ছুটি লইয়া না বলিয়া চলিয়া আসার অপরাধে স্বয়ং গিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিবে। ইহাও লিখিয়াছে যে রেণুর বিবাহ বন্ধ হওয়ার সংবাদ সে জানিয়াই আসিয়াছে। রাখাল চিঠিটা পকেটে রাখিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যাক ট্যাক্সিভাড়াটা বাঁচল।

পরদিন বিকালে রাখাল নূতন তোরঙ্গে কাপড়-চোপড় গুছাইয়া তুলিতেছিল, ফিরিতে দিন-দশেক দেরি হইবে, নতুন-মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাখাল প্রণাম করিয়া চৌকি অগ্রসর করিয়া দিল, তিনি বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কাল রাত্রেই তোমাদের যেতে হবে বুঝি বাবা?

হাঁ মা, কালই সবাইকে নিয়ে রওনা হতে হবে।

ফিরতে দিন-আষ্টেক দেরি হবে বোধ হয়?

হাঁ মা, আট-দশদিন লাগবে।

নতুন-মা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ক'টা বাজলো রাজু?

রাখাল দেয়ালের ঘড়ির পানে চাহিয়া বলিল, পাঁচটা বেজে গেছে। আমার ভয় ছিল আপনার আসতেই হয়তো বিলম্ব হবে, কিন্তু আজ কাকাবাবুই দেরি করলেন।

দেরি হোক বাবা, তিনি এলে বাঁচি।

রাখাল হাসিয়া বলিল, পাগলের সঙ্গে বিয়েটা যখন বন্ধ হয়ে গেছে তখন ভাবনার ত আর কিছু নেই মা! তিনি না আসতে পারলেও ক্ষতি নেই।

নতুন-মা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না বাবা, কেবল রেণুই ত নয়, তোমার কাকাবাবুও রয়েছেন যে। আমি কেবলই ভাবি, ঐ নিরীহ শান্ত মানুষটি না জানি একলা কত লাঞ্ছনা, কত উৎপীড়নই সহ্য করেছেন। বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

রাখাল মনে মনে মামাবাবু হেমন্তকুমারের চাকার মতো মস্ত মুখখানা স্মরণ করিয়া নীরব হইয়া রহিল। এ কাজ যে সহজে হয় নাই তাহা নিশ্চয়।

নতুন-মা বলিতে লাগিলেন, এ বিয়ে স্থগিত রইলো তিনি এইমাত্র লিখেচেন। কিন্তু কিছুদিনের জন্যে না চিরদিনের জন্যে সে ত এখনো জানতে পারা যায়নি রাজু।

রাখাল বলিয়া উঠিল, চিরদিনের জন্যে, মা, চিরদিনের জন্যে। ঐ পাগলদের ঘরে আপনার রেণু কখনো পড়বে না, আপনি নিশ্চিন্ত হোন।

নতুন-মা বলিলেন, ভগবান তাই করুন; কিন্তু ঐ দুর্বল মানুষটির কথা ভেবে মনের মধ্যে কিছুতে স্বস্তি পাচ্ছিনে রাজু। দিনরাত কত চিন্তা, কত রকমের ভয়ই যে হয় সে আর আমি বলবো কাকে?

রাখাল বলিল, কিন্তু ওঁকে কি আপনার খুব দুর্বল লোক বলে মনে হয় মা?

নতুন-মা একটুখানি ম্লান হাসিয়া কহিলেন, দুর্বল-প্রকৃতির উনি ত চিরদিনই রাজু। তাতে আর সন্দেহ কি!

রাখাল বলিল, দুর্বল লোকে কি এত আঘাত নিঃশব্দে সইতে পারে মা? জীবনে কত ব্যথাই যে কাকাবাবু সহ্য করেছেন সে আপনি জানেন না, কিন্তু আমি জানি। ঐ যে উনি আসচেন।

খোলা জানালার ভিতর দিয়া ব্রজবাবুকে সে দেখিতে পাইয়াছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল এবং তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলে সে

একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। নতুন-মা কাছে আসিয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ব্রজবাবু চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিলেন, বলিলেন, রেণুর বিয়ে ওখানে দিতে দিইনি, শুনেছো নতুন-বৌ।

হাঁ, শুনেচি। বোধ হয় খুব গোলমাল হলো?

সে তো হবেই নতুন-বৌ।

তুমি নির্বিরোধী শান্ত মানুষ, আমার বড় ভাবনা ছিল কি করে তুমি এ-বিয়ে বন্ধ করবে।

ব্রজবাবু বলিলেন, শান্তিই আমি ভালবাসি, বিরোধ করতে কিছুতে মন চায় না, এ কথা সত্যি। কিন্তু তোমার মেয়ে, অথচ তোমারই বাধা দেবার হাত নেই, কাজেই সব ভার এসে পড়লো আমার ওপর, একাকী আমাকেই তা বইতে হলো। সেদিন আমার বার বার কি কথা মনে হচ্ছিল জানো নতুন-বৌ, মনে হচ্ছিল আজ যদি তুমি বাড়ি থাকতে, সমস্ত বোঝা তোমার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে আমি গড়ের মাঠে একটা বেঞ্চিতে শুয়ে রাত কাটিয়ে দিতাম। তাদের উদ্দেশে মনে মনে বললাম, আজ সে থাকলে তোমরা বুঝতে জুলুম করার সীমা আছে—সকলের ওপরেই সবকিছু চালানো যায় না।

সবিতা অধোমুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। সেদিনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবার সাহস তাঁহার হইল না। রাখালও তেমনি নির্বাক স্তব্ধ হইয়া রহিল। ব্রজবাবু নিজে হইতে ইহার অধিক ভাঙ্গিয়া বলিলেন না।

মিনিট দুই-তিন সকলেই চুপ করিয়া থাকার পরে রাখাল বলিল, কাকাবাবু, আজ বড় আপনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

ব্রজবাবু বলিলেন, তার হেতুও যথেষ্ট আছে রাজু। এই ছ-সাতদিন কারবারের কাগজপত্র নিয়ে ভারী খাটতে হয়েচে।

রাখাল সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, সব ভালো ত কাকাবাবু?

ব্রজবাবু বলিলেন, ভালো একেবারেই নয়। সবিতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, তোমার সেই টাকাটা আমি বছর-খানেক আগে তুলে নিয়ে ব্যাঙ্কে রেখেছিলাম, ভেবেছিলাম, আমার নিজের কারবারের চেয়ে বরঞ্চ এদের হাতেই ভয়ের সম্ভাবনা কম। এখন দেখচি ঠিকই ভেবেছিলাম। এখন এর ওপরেই ভরসা নতুন-বৌ, এটা না নিলেই এখন নয়।

সবিতা এবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, না নিলে কি নষ্ট হবার ভয় আছে?

আছে বৈ কি নতুন-বৌ—বলা তো যায় না।

সবিতা চুপ করিয়া রহিলেন।

ব্রজবাবু কহিলেন, কি বলো নতুন-বৌ, চুপ করে রইলে যে?

সবিতা মিনিট-দুই নিরুত্তরে থাকিয়া বলিলেন, আমি আর কি বলবো মেজকর্তা! টাকা তুমিই দিয়েছিলে, তোমার কাজেই যদি যায় ত যাবে। কিন্তু আমারো ত আর কিছু নেই।

শুনিয়া ব্রজবাবু যেন চমকাইয়া গেলেন। খানিক পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, ঠিক কথা নতুন-বৌ, এ দুঃসাহস করা আমার চলে না। তোমার টাকা আমি তোমাকেই ফিরিয়ে দেবো। কাল একবার আসবে?

যদি আসতে বলো আসবো।

আর তোমার গয়নাগুলো?

তুমি কি রাগ করে বলচো মেজকর্তা?

ব্রজবাবু সহসা উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহার চোখের দৃষ্টি বেদনায় মলিন হইয়া উঠিল, তারপরে বলিলেন, নতুন-বৌ, যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিতে যাচ্চি আমি রাগ করে—এমন কথা আজ তুমিও ভাবতে পারলে?

সবিতা নতমুখে নীরবে হইয়া রহিলেন।

ব্রজবাবু বলিলেন, আমি একটুও রাগ করিনি নতুন-বৌ, সরল মনেই ফিরিয়ে দিতে চাইচি। তোমার জিনিস তোমার কাছেই থাক, ও ভার বয়ে বেড়াবার আর আমার সামর্থ্য নেই।

সবিতা এখনও তেমনি নির্বাক হইয়া রহিলেন, কোন জবাবই দিতে পারিলেন না।

সন্ধ্যা হয়, ব্রজবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, আজ তা হলে যাই। কাল এমনি সময়ে একবার এসো—আমার অনুরোধ উপেক্ষা করো না নতুন-বৌ।

রাখাল তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, একটি বন্ধুর বিয়ে দিতে কাল রাতের গাড়িতে আমি দিল্লী যাচ্চি কাকাবাবু, ফিরতে বোধ করি আট-দশদিন দেরি হবে।

ব্রজবাবু বলিলেন, তা হোক, কিন্তু বিয়ে কি কেবল দিয়েই বেড়াবে রাজু; নিজে করবে না?

রাখাল সহাস্যে কহিল, আমাকে মেয়ে দেবে এমন দুর্ভাগা সংসারে কে আছে কাকাবাবু?

শুনিয়া ব্রজবাবুও হাসিলেন, বলিলেন, আছে রাজু। যারা আমাকে মেয়ে দিয়েছিল সংসারে তারা আজও লোপ পায়নি। তোমাকে মেয়ে দেবার দুর্ভাগ্য তাদের চেয়ে বেশী নয়। বিশ্বাস না হয় তোমার নতুন-মাকে বরঞ্চ আড়ালে জিজ্ঞাসা করো, তিনি সায় দেবেন। চললাম নতুন-বৌ, কাল আবার দেখা হবে।

সবিতা কাছে আসিয়া পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিলেন; তিনি অস্ফুটে বোধ হয় আশীর্বাদ করিতে করিতেই বাহির হইয়া গেলেন।

পরদিন ঠিক এমনি সময়ে ব্রজবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হাতে তাঁহার শিলমোহর করা একটা টিনের বাক্স। সবিতা পূর্বাহ্নেই আসিয়াছিলেন, বাক্সটা তাঁহার সামনে টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিলেন, এটা এতদিন

ব্যাঙ্কেই জমা ছিল, এর ভেতরে তোমার সমস্ত গহনাই মজুত আছে দেখতে পাবে। আর এই নাও তোমার বায়ান্ন হাজার টাকার চেক। আজ আমি খালাস পেলাম নতুন-বৌ, আমার বোঝা বয়ে বেড়াবার পালা সাঙ্গ হলো।

কিন্তু তুমি যে বলেছিলে এ-সব গয়না তোমার রেণু পরবে?

ব্রজবাবু কহিলেন, গয়না তো আমার নয় নতুন-বৌ, তোমার। যদি সেদিন কখনো আসে তাকে তুমিই দিও।

রাখাল বারে বারে ঘড়ির প্রতি চাহিয়া দেখিতেছিল, ব্রজবাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমার বোধ করি সময় হয়ে এলো রাজু?

রাখাল সলজ্জে স্বীকার করিয়া বলিল, ও-বাড়ি হয়ে সকলকে নিয়ে স্টেশনে যেতে হবে কিনা—

তবে আমি উঠি। কিন্তু ফিরে এসে একবার দেখা করো রাজু। এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হঠাৎ কথাটা মনে পড়ায় কহিলেন, কিন্তু আজ ত তোমার নতুন-মার একলা যাওয়া উচিত নয়। কেউ পৌঁছে না দিলে—

রাখাল বলিল, একলা নয় কাকাবাবু। নতুন-মার দরোয়ান, নিজের মোটর, সমস্ত মোড়েই দাঁড়িয়ে আছে।

ওঃ—আছে? বেশ, বেশ। নতুন-বৌ, যাই তাহলে?

সবিতা কাছে আসিয়া কালকের মতো প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইলেন, আস্তে আস্তে বলিলেন, আবার কবে দেখা পাবো মেজকর্তা?

যেদিন বলে পাঠাবে আসবো। কোন কাজ আছে কি নতুন-বৌ?

না, কাজ কিছু নেই।

ব্রজবাবু হাসিয়া বলিলেন, শুধু এমনিই দেখতে চাও?

এ প্রশ্নের জবাব কি! সবিতা ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন।

ব্রজবাবু বলিলেন, আমি বলি এ-সবের প্রয়োজন নেই নতুন-বৌ। আমার জন্যে মনের মধ্যে আর তুমি অনুশোচনা রেখো না, যা কপালে লেখা ছিল

ঘটেছে—গোবিন্দ মীমাংসাও তার একরকম করে দিয়েচেন,—আশীর্বাদ করি তোমরা সুখী হও, আমাকে অবিশ্বাস করো না নতুন-বৌ, আমি সত্যি কথাই বলচি।

সবিতা তেমনিই আধোমুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাখালের মনে পড়িল আর বিলম্ব করা সঙ্গত নয়। অবিলম্বে গাড়ি ডাকিয়া তোরঙ্গটা বোঝাই দিতে হইবে। এবং এই কথাটাই বলিতে বলিতে সে ব্যস্তসমস্তে বাহির হইয়া গেল।

সবিতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন, তাঁহার দুই চোখে অশ্রুর ধারা বহিতেছিল। ব্রজবাবু একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, তোমার রেণুকে একবার দেখতে চাও কি নতুন-বৌ?

না মেজকর্তা, সে প্রার্থনা আমি করিনে।

তবে কাঁদচো কেন? কি আমার কাছে তুমি চাও?

যা চাইবো দেবে বলো?

ব্রজবাবু উত্তর দিতে পারিলেন না, শুধু তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সবিতা কহিলেন, কতকাল বাঁচবো মেজকর্তা, আমি কি নিয়ে থাকবো?

ব্রজবাবু এ জিজ্ঞাসারও উত্তর দিতে পারিলেন না, ভাবিতে লাগিলেন। এমনি সময়ে বাহিরে রাখালের শব্দ-সাড়া পাওয়া গেল, সবিতা তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিলেন এবং পরক্ষণেই দ্বার ঠেলিয়া সে ঘরে প্রবেশ করিল। কহিল, নতুন-মা, আপনার ড্রাইভার জিজ্ঞেসা করছিল, আর দেরি কতো? চলুন না ভারী বাক্সটা আপনার গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি?

নতুন-মা বলিলেন, রাজু আমাকে বিদায় করতে পারলেই বাঁচে, আমি ওর আপদবালাই।

রাখাল হাতজোড় করিয়া জবাব দিল, মায়ের মুখে ও-নালিশ অচল নতুন-মা। এই রইলো আপনার রাজুর দিল্লী যাওয়া—ছেলেবেলার মতো আর একবার আজ মার কোলেই আশ্রয় নিলাম। এখান থেকে আর যেতে দিচ্চিনে মা—যত কষ্টই ছেলের ঘরে হোক।

সবিতা লজ্জায় যেন মরিয়া গেলেন। রাখাল বলিয়া ফেলিয়াই নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছিল, কিন্তু ভালোমানুষ ব্রজবাবু তাহা লক্ষ্যও করিলেন না। বরঞ্চ বলিলেন, বেলা গেছে নতুন-বৌ, বাক্সটা তোমার গাড়িতে রাজু তুলে দিয়ে আসুক, আমি ততক্ষণ ওর ঘর আগলাই। এই বলিয়া নিজেই বাক্সটা তাহার হাতে তুলিয়ে দিলেন।

প্রশ্নের উত্তর চাপা পড়িয়া রহিল, রাখালের পিছনে পিছনে নতুন-মা নীরবে বাহির হইয়া গেলেন।

ছয়

বিবাহ দিয়া রাখাল দিন দশ-বার পরে দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিল। বলা বাহুল্য, বরকর্তার কর্তব্যে তাহার ত্রুটি ঘটে নাই এবং কর্তা-গিন্নী অর্থাৎ মনিব ও মনিব-গৃহিণী তাহার কার্যকুশলতায় যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ করিলেন।

কিন্তু তাহার এই কয়টা দিনের দিল্লী প্রবাস কেবল এইটুকুমাত্র ঘটনাই নয়, তথায় সে রীতিমত প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া আসিয়াছে। তাহার একটা ফল এই হইয়াছে যে, বিবাহযোগ্য আকাঙ্ক্ষিত পাত্র হিসাবে তাহাকে কয়েকটি মেয়ে দেখানো হইয়াছে। সাদামাটা সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে, পশ্চিমে থাকিয়া তাহাদের স্বাস্থ্য ও বয়স বাড়িয়াছে, কিন্তু অভিভাবকগণের নানা অসুবিধায় এখনো পাত্রস্থ করা হয় নাই। পীড়াপীড়ির উত্তরে রাখাল বলিয়া আসিয়াছে যে, কলিকাতায় তাহার কাকাবাবু ও নতুন-মার অভিমত জানিয়া পরে চিঠি লিখিবে। তাহার এ সৌভাগ্যের কারণ বন্ধু যোগেশ। সে বরযাত্রীর দলে ভিড়িয়া নিখরচায় দিল্লী, হস্তিনাপুর, কেল্লা, কুতুব মিনার ইত্যাদি এ-যাবৎ লোকমুখে শুনা দ্রষ্টব্য বস্তুনিচয় দেখিতে পাইয়াছে, অতএব বন্ধুকৃত্য বাকী রাখে নাই, কৃতজ্ঞতার ঋণ ষোল আনায় পরিশোধ করিয়াছে। লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, রাখালবাবু আজও বিবাহ করেন নাই কেন? যোগেশ জবাব দিয়াছে, ওর শখ। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সঙ্গে ওদের মিলবে এমন আশা করাই যে অন্যায়। কন্যাপক্ষীয় সসঙ্কোচে প্রশ্ন করিয়াছে, উনি কলিকাতায় করেন কি? যোগেশ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিয়াছে, বিশেষ কিছুই নয়। তার পর মুচকিয়া হাসিয়া কহিয়াছে, করার দরকারই বা কি!

এ কথার নানা অর্থ।

কলিকাতার বিশিষ্ট লোকদের বিবিধ তথ্য রাখালের মুখে-মুখে। বাড়ির মেয়েদের পর্যন্ত নাম জানা। নূতন ব্যারিস্টার, সদ্য পাস-করা আই-সি-এস-দের উল্লেখ সে ডাক-নাম ধরিয়া করে। পচু বোস, ডম্বল সেন, পটল বাঁড়ুয্যে—শুনিয়া অত দূরপ্রবাসের সামান্য চাকরিজীবী বাঙালীরা অবাক হইয়া যায়; কিন্তু এতকাল বিবাহের কথায় রাখাল শুধু যে মুখেই আপত্তি করিয়াছে তাই নয়, মনের মধ্যেও তার ভয় আছে। কারণ, নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সে অচেতন নয়। সে জানে, এই কলিকাতা শহরে তাহার পরিচিত বন্ধু-পরিধি যথেষ্ট সঙ্কুচিত না করিয়া পরিবার প্রতিপালন করা তাহার সাধ্যাতীত। যে-পরিবেষ্টনে এতকাল সে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়াছে, সেখানে ছোট হইয়া থাকার কল্পনা করিতেও সে পরাঙ্মুখ। তথাপি, নিঃসঙ্গ জীবনের নানা অভাব তাহাকে বাজে।

বসন্তে বিবাহোৎসবের বাঁশি মাঝে মাঝে তাহাকে উতলা করে, বরানুগমনের সাদর আমন্ত্রণে মনটা হয়তো হঠাৎ বিরূপ হইয়া উঠে, সংবাদপত্রে কোথায় কোন্ আত্মঘাতিনী অনূঢ়া কন্যার পাণ্ডুর মুখ অনেক সময়ে তাহাকে যেন দেখা দিয়া যায়, হয়তো বা অকারণ অভিমানে কখনো মনে হয়, সংসারে এত প্রাচুর্য, এত অভাব, এত সাধারণ, এত নিরন্তরের মধ্যে শুধু সেই কি কাহারো চোখে পড়ে না? শুধু তাহাকেই মালা দিতে কোথাও কোন কুমারীই কি নাই?

কিন্তু এ-সকল তাহার ক্ষণিকের। মোহ কাটিয়া যায়, আবার সে আপনাকে ফিরিয়া পায়—হাসে, আমোদ করে, ছেলে পড়ায়, সাহিত্যালোচনায় যোগ দেয়,—আহ্বান আসিলে বিবাহের আসর সাজাইতে ছোটে, নব বর-বধূকে ফুলের তোড়া দিয়া শুভকামনা জানায়। আবার দিনের পর দিন যেমন কাটিতেছিল তেমনি কাটে। এতদিনের এই মনোভাবের এবার একটু পরিবর্তন ঘটিয়াছে দিল্লী হইতে ফিরিয়া। এবারে সে দেখিয়াছে কলিকাতাই সমস্ত দুনিয়া নয়, ইহারও বাহিরে বাঙালী বাস করে, তাহারাও ভদ্র,—তাহারাও মানুষ। তাহাকেও কন্যা দিতে প্রস্তুত এমন পিতা-মাতা আছে। কলিকাতায় যে-সমাজ ও যে-মেয়েদের সংস্পর্শে সে

এতকাল আসিয়াছে, প্রবাসের সাধারণ ঘরের সে মেয়েগুলি হয়তো অনেক বিষয়ে খাটো। স্ত্রী বলিয়া পরিচয় করাইয়া দিতে হয়তো আজও তাহার লজ্জা করিবে, তথাপি এই নূতন অভিজ্ঞতা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছে, বল দিয়াছে, ভরসা দিয়াছে।

সংসারে কাহারো ভার গ্রহণের শক্তি তাহার নাই। পরের মুখে-শেখা এই আত্ম-অবিশ্বাস এতদিন সকল বিষয়েই তাহাকে দুর্বল করিয়াছে। সে ভাবিয়াছে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা—তাহাদের কতদিকে কতরকমে প্রয়োজন, খাওয়া-পরা বাড়ি-ভাড়া হইতে আরম্ভ করিয়া রোগ শোক বিদ্যা অর্জন—দাবীর অন্ত নাই! এ মিটাইবে সে কোথা হইতে? কিন্তু তাহার এই সংশয়ে প্রথম কুঠার হানিয়াছে সারদা,— অকূল সমুদ্র-মাঝে সে যেদিন তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে—প্রত্যুত্তরে তাহাকেও যেদিন সে অভয় দিয়া বলিয়াছে, তোমার ভয় নেই সারদা, আমি তোমার ভার নিলাম। সারদা তাহাকে বিশ্বাস করিয়া ঘরে ফিরিয়াছে,—বাঁচিতে চাহিয়াছে। এই পরের বিশ্বাসই রাখালকে এতদিনে নিজের প্রতি বিশ্বাসবান্ করিয়াছে। আবার এই বস্তুটাই তাহার বহুগুণে বাড়িয়া গেছে, এবার প্রবাস হইতে ফিরিয়া। তাহার কেবলই মনে হইয়াছে সে অক্ষম নয়, দুর্বল নয়, সংসারে অনেকের মতো সেও অনেক-কিছু পারে। এই নবজাগ্রত চেতনার বলিষ্ঠ চিত্ত লইয়া সে প্রথমেই দেখা করিতে গেল সারদার সঙ্গে। ঘরে তালা বন্ধ। একটি ছোট ছেলে খেলা করিতেছিল; সে বলিল, বৌদি গেছে ওপরে গিন্নীমার ঘরে—রাত্তিরে আমাদের সক্কলের নেমন্তন্ন।

রাখাল উপরে গিয়া দেখিল সমারোহ ব্যাপার, লোক-খাওয়ানোর বিপুল আয়োজন চলিতেছে। রমণীবাবু অকারণে অতিশয় ব্যস্ত, কাজের চেয়ে অকাজই বেশি করিতেছেন এবং সারদা কোমরে কাপড় জড়াইয়া জিনিসপত্র ভাঁড়ারে গুছাইয়া তুলিতেছে। রমণীবাবু যেন বাঁচিয়া গেলেন—এই যে রাজু এসেছে! নতুন-বৌ?

সবিতা অন্যত্র ছিলেন, চিৎকারে কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রমণীবাবু হাঁফ ছাঁড়িয়া বলিলেন, যাক বাঁচা গেছে—রাজু এসে পড়েছেন। বাবা, এখন থেকে সব ভার তোমার।

সবিতা বলিলেন, সেই ভালো, তুমি এখন ঘরে গিয়ে একটু জিরোও গে, আমরা নিস্তার পাই।

সারদা অলক্ষ্যে একটু হাসিল; রাখালকে জিজ্ঞাসা করিল, কবে এলেন?

কাল।

কাল? তবে কালকেই এলেন না যে বড়ো?

অনেক কাজ ছিল, সময় পাইনি।

সবিতা সহাস্যে বলিলেন, ওকে মরা বাঁচিয়েছে বলে রাজুর ওপর মস্ত দাবী।

সারদা সন্দেশের ঝুড়িটা তুলিয়া লইয়া গেল।

রাখাল রমণীবাবুকে নমস্কার করিল এবং সবিতাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এত ধুমধাম কিসের নতুন-মা?

সবিতা স্মিতমুখে কহিলেন, এমনিই।

রমণীবাবু বলিলেন, হুঁ—এমনিই বটে, সেই মেয়ে তুমি! পরে তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন, উনি আধামূল্যে একটা মস্ত সম্পত্তি খরিদ করলেন, এ তারই খাওয়া। আমার সিঙ্গাপুরের পার্টনার এসেছে কলিকাতায়—বি.সি. ঘোষ নাম শুনেছো? শোনোনি—আচ্ছা, আজ রাত্তিরে তাকে দেখতে পাবে, কোটি টাকার মালিক। আরও আছে আমার এখানকার বন্ধু-বান্ধব উকিল-এটর্নী মায় দু-তিনজন ব্যারিস্টার পর্যন্ত। একটু গান-বাজনাও হবে—খাসা গাইছে আজকাল মালতীমালা—শুনে সুখ পাবে হে। সবিতা একটু বাধা দিবার চেষ্টা করিতেই বলিয়া উঠিলেন, নাও, ছলনা রাখো। কিন্তু কপাল করেছিলে বটে! দেশে থাকতে কোন্ এক শালাকে অনেক টাকা ধার দিয়েছিলেন, সেইটেই হঠাৎ আদায় হয়ে গেল।

ডোবা কড়ি বাবাজী, ডোবা কড়ি,—এমন কখনো হয় না। নিতান্তই বরাতের জোর! ব্যাটা ভয়ে পড়ে কেমন দিয়ে ফেললে! কিন্তু তাতেই কি কুলোলো? হাজার-দশেক কম পড়ে যায়, আমাকে আবদার ধরলেন, সেজবাবু, ওটা তুমি দিয়ে দাও। বললুম, শ্রীচরণে অদেয় কি আছে বলো? এ দেহ-মন-প্রাণ সবই তো তোমার! এই বলিয়া তিনি অত্যন্ত অরুচিকর স্থূল রসিকতার আনন্দে নিজেই হিঃ হিঃ হিঃ করিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিলেন। রাখাল লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া রহিল।

রমণীবাবু চলিয়া গেলে সবিতা বলিলেন, বেলা হলো, এইখানেই স্নান করে দুটি খেয়ে নাও বাবা, ও-বেলায় তোমাকে আবার অনেক খাটতে হবে। অনেক কাজ।

রাখাল কহিল, কাজে ভয় পাইনে মা, খাটতেও রাজী আছি, কিন্তু এ-বেলাটা নষ্ট করতে পারবো না। আমাকে ও-বাড়িতে একবার যেতে হবে।

কাল গেলে হয় না?

না।

তবে কখন আসবে বলো?

আসবো নিশ্চয়ই, কিন্তু কখন কি করে বলবো মা?

তারক এখানে নেই বুঝি?

না, সে তার বর্ধমানের মাস্টারিতে গিয়ে ভর্তি হয়েছে। থাকলেও হয়তো আসতো না।

তাহার তীব্র ভাবান্তর সবিতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, একটু প্রসন্ন করিতে কহিলেন, ওঁর ওপর রাগ করো না রাজু, ওঁদের কথাবার্তাই এমনি।

এই ওকালতিতে রাখাল মনে মনে আরও চটিয়া গেল, বলিল, না মা, রাগ নয়, একটা গরুর ওপর রাগ করতে যাবোই বা কিসের জন্যে। বলিয়াই চলিয়া গেল। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে কহিল, নাঃ—কৃতজ্ঞতার ঋণ মনে রাখা কঠিন।

যদিচ, রাখাল মনে মনে বুঝিয়াছে, যে-লোকটি নতুন-মার অত টাকার দেনা শোধ করিয়াছে তাহার নাম রমণীবাবু জানে না, তথাপি সেই ধর্মপ্রাণ সদাশয় মানুষটির প্রতি এই অশিষ্ট ভাষা সে ক্ষমা করিতে পারিল না। অথচ নতুন-মা আমলই দিলেন না, যেন কথাটা কিছুই নয়। পরিশেষে তাঁহারই প্রতি লোকটার কদর্য রসিকতা। কিন্তু এবার আর তাহার রাগ হইল না; বরঞ্চ উহাই যেন তাহার মনের জ্বালাটাকে হঠাৎ হালকা করিয়া দিল। সে মনে মনে বলিল, এ ঠিকই হয়েছে। এই ওঁর প্রাপ্য। আমি মিথ্যে জ্বলে মরি।

বৌবাজারে ট্রাম হইতে নামিয়া গলির মধ্যে ঢুকিয়া ব্রজবিহারীবাবুর বাটীর সম্মুখে আসিয়া রাখালের মনে হইল তাহার চোখে ধাঁধা লাগিয়াছে—সে আর কোথাও আসিয়া পড়িয়াছে। এ কি! দরজায় তালা দেওয়া, উপরের জানালাগুলো সব বন্ধ—একটা নোটিশ ঝুলিতেছে—বাড়ি ভাড়া দেওয়া হইবে। সে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া গলির মোড়ে মুদির দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দোকানী অনেকদিনের, এ-অঞ্চলের সকল ভদ্রগৃহেই সে মাল যোগায়। গিয়া ডাকিল, নবদ্বীপ, কাকাবাবুর বাড়ি ভাড়া কি-রকম?

নবদ্বীপ তাহাকে ভিতরে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি কিছু জানেন না রাখালবাবু?

না, আমি এখানে ছিলাম না।

নবদ্বীপ কহিল, দেনার জন্য বাবু বাড়িটা বিক্রি করে দিলেন যে।

বাড়ি বিক্রি করে দিলেন! কিন্তু তাঁরা সব কোথায়?

গিন্নী নিজের মেয়ে নিয়ে গেছেন ভায়ের বাড়ি। ব্রজবাবু রেণুকে নিয়ে বাসা ভাড়া করেছেন।

বাসাটা চেনো নবদ্বীপ?

চিনি, বলিয়া সে হাত দিয়া দেখাইয়া কহিল, এই সোজা গিয়ে বাঁ-হাতি গলিটার দুখানা বাড়ির পরেই সতের নম্বরের বাড়ি।

সতের নম্বরে আসিয়া রাখাল দরজায় কড়া নাড়িল, দাসী খুলিয়া দিয়া তাহাকে দেখিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, ফটিকের মা, কাকাবাবু কোথায়?

ওপরে রান্না করচেন।

বামুন নেই?

না!

চাকর?

মধু আছে, সে গেছে ওষুধ আনতে।

ওষুধ কেন?

দিদিমণির জ্বর, ডাক্তার দেখ্‌চে।

রাখাল কহিল, জ্বরের অপরাধ নেই। কবে এখানে আসা হলো?

দাসী বলিল, চার দিন। চার দিনই জ্বরে পড়ে।

ভিজা স্যাঁতসেঁতে উঠানময় জিনিসপত্র ছড়ানো, সিঁড়িটা ভাঙ্গা, রাখাল উপরে উঠিয়া দেখিল সামনের বারান্দার এককোণে লোহার উনুন জ্বালিয়া ব্রজবাবু গলদঘর্ম। সাগু নামিয়াছে, রান্নাও প্রায় শেষ হইয়াছে, কিন্তু হাত পুড়িয়াছে, তরকারি পুড়িয়াছে, ভাত ধরিয়া চোঁয়া গন্ধ উঠিয়াছে।

রাখালকে দেখিয়া ব্রজবাবু লজ্জা ঢাকিতে বলিয়া উঠিলেন, এই দ্যাখো রাজু, ফটিকের মার কাণ্ড! উনুনে এত কয়লা ঢেলেছে যে আঁচটা আন্দাজ করতে পারলাম না। ফ্যানটা যেন—একটু গন্ধ মনে হচ্ছে, না?

রাখাল কহিল, তা হোক। আপনি উঠুন ত কাকাবাবু, বেলা বারোটা বেজে গেছে—গোবিন্দর পূজোটি সেরে নিন, আমি ততক্ষণ নতুন করে ভাতটা চড়িয়ে দিই—ফুটে উঠতে দশ মিনিটের বেশি লাগবে না। রেণু কৈ? বলিয়া সে পাশের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল সে নিজের বিছানায় শুইয়া। রাজুদাকে দেখিয়া তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। রাখাল কোনমতে নিজেরটা সামলাইয়া লইয়া বলিল,

কান্নাটা কিসের? জ্বর কি কারো হয় না? ও দু'দিনে সেরে যাবে, আর আমি ত মরিনি রেণু, ভাবনার কি আছে? উঠে বসো। মুখ-ধোয়া, কাপড়-ছাড়া হয়েছে ত?

রেণু মাথা নাড়িতেই রাখাল চেঁচাইয়া ডাকিল, ফটিকের মা, তোমার দিদিমণিকে সাগু দিয়ে যাও—বড্ড দেরি হয়ে গেছে। সে আসিলে বলিল, ভাতটা ধরে গেছে ফটিকের মা, ওতে চলবে না। তুমি, আমি, মধু আর কাকাবাবু—চারজনের মতো চাল ধুয়ে ফেলো, আমি নীচে থেকে চট করে স্নানটা সেরে আসি। কাঁচা আনাজ কিছু আছে ত?

আছে।

বেশ, তাও দুটো কুটে দাও দিকি, একটা চচ্চড়ি রেঁধে নিই,—আমি আবার এক তরকারি দিয়ে ভাত খেতে পারিনে।

রেলিঙের উপর কাচা-কাপড় শুকাইতেছিল, রাখাল টানিয়া লইয়া নীচে চলিল, বলিতে বলিতে গেল, কাকাবাবু, দেরি করবেন না, শিগগির উঠুন। রেণু, নেয়ে এসে যেন দেখতে পাই তোমার খাওয়া হয়ে গেছে। মধু এসে পড়লে যে হয়—

বিষণ্ণ, নীরব গৃহের মাঝে হঠাৎ কোথা হইতে যেন একটা চেঁচামেচির ঝড় বহিয়া গেল।

স্নানের ঘরে ঢুকিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখাল ভিজা মেজেয় পড়িয়া মিনিট দুই-তিন হাউ হাউ করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল—ছেলেবেলায়, অকস্মাৎ যেদিন বিসূচিকায় তাহার বাপ মরিয়াছিল ঠিক সেদিনের মতো। তার পরে উঠিয়া বসিল; ঘটি-কয়েক জল মাথায় ঢালিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। একেবারে সহজ মানুষ,—কে বলিবে ঘরে কপাট দিয়া এইমাত্র সে বালকের মতো মাটিতে পড়িয়া কি কাণ্ডই করিতেছিল।

রাঁধা-বাড়ায় রাখাল অপটু নয়। নিজের জন্য এ কাজ তাহাকে নিত্য করিতে হয়। সে অল্পক্ষণেই সমস্ত সারিয়া ফেলিল। তাহার তাড়ায় ঠাকুরের পূজা,

ভোগ প্রভৃতি সমাধা হইতেও আজ অযথা বিলম্ব ঘটিল না। রাখাল পরিবেশন করিয়া সকলকে খাওয়াইয়া, নিজে খাইয়া নীচে হইতে গা ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া, আবার যখন উপরে আসিল তখন বেলা তিনটা বাজিয়াছে। রেণু অদূরে বসিয়া সমস্ত দেখিতেছিল, শেষ হইতে বলিল, রাজুদা, তুমি আমাদেরও হারিয়েছো। তোমার যে বৌ হবে সে ভাগ্যবতী; কিন্তু বিয়ে কি তুমি করবে না?

রাখাল হাসিয়া বলিল, কি করে করবো ভাই, অতবড় ভাগ্যবতীর দেখা মিলবে তবে ত?

না, সে হবে না। বাবাকে ধরে এবার আমি নিশ্চয় তোমার একটি বিয়ে দিয়ে দেবো।

তাই দিও, আগে সেরে ওঠো। বিনোদ ডাক্তার আজ কি বললে? জ্বরটা ছাড়চে না কেন?

ফটিকের মা দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, ডাক্তারবাবু আজ ত আসেন নি, এসেছিলেন পরশু। সেই এক ওষুধই চলচে।

শুনিয়া রাখাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার শঙ্কিত মুখের প্রতি চাহিয়া রেণু লজ্জা পাইয়া কহিল, রোজ ওষুধ বদলানো বুঝি ভালো! আর মিছামিছি ডাক্তারকে টাকা দিতে থাকলেই বুঝি অসুখ সেরে যায় ফটিকের মা? আমি এতেই ভালো হয়ে যাবো তোমরা দেখে নিও।

রাখাল কথা কহিল না, বুঝিল দুর্দশায় পড়িয়া সামান্য গুটিকয়েক টাকাও আর সে পিতার খরচ করাইতে চাহে না।

তুমি কি চলে যাচ্ছো রাজুদা?

আজ যাই ভাই, কাল সকালেই আবার আসবো।

নিশ্চয় আসবে ত?

নিশ্চয় আসবো। আমি না আসা পর্যন্ত কাকাবাবুকে উনুনের কাছেও যেতে দিও না রেণু।

শুনিয়া রেণু কত যেন কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল, বলিল, কাল যদি আমার জ্বর না থাকে আমি রাঁধবো রাজুদা?

কিছুতেই না। ঝিকে সাবধান করিয়া দিয়া কহিল, আমি না এলে কাউকে কিছু করতে দিও না ফটিকের মা। এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

বিনোদ ডাক্তার পাড়ার লোক, একটু দূরে বাড়ি—নীচের তলায় ডিস্‌পেনসারি, সেখানে তাঁহার দেখা মিলিল; রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, রেণুর জ্বরটা কি রকম ডাক্তারবাবু? আজও ছাড়েনি কেন?

বিনোদবাবু বলিলেন, আশা করি সহজ। কিন্তু আজও যখন—তখন দিন-দুই না গেলে ঠিক বলা যায় না রাখাল।

ডাক্তার এই পরিবারের বহুদিনের চিকিৎসক, সকলকেই জানেন। ইহার পর ব্রজবাবুর আকস্মিক দুর্ভাগ্য লইয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিলেন, বিস্ময় প্রকাশ করিলেন, শেষে বলিলেন, তুমি যখন এসে পড়েচো রাখাল, তখন ভাবনা নেই। আমি সকালেই যাবো।

নিশ্চয় যাবেন ডাক্তারবাবু, আমাদের ডাকবার লোক নেই।

ডাকবার দরকার নেই রাখাল, আমি আপনিই যাবো।

সেখান হইতে ফিরিয়া রাখাল নিজের বাসায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ব্রজবাবুর দুর্দশা যে কত বৃহৎ ও সর্বনাশের পরিমাণ যে কিরূপ গভীর, নানা কাজের মধ্যে এ কথা এখনো সে ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পায় নাই, নির্জনে ঘরের মধ্যে এইবার তাহার দু'চোখ বাহিয়া হুহু করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কোথায় যে ইহার কূল এবং এই দুঃখের দিনে সে যে কি করিতে পারে ভাবিয়া পাইল না। কি করিয়া যে এত শীঘ্র এমনটি ঘটিল তাহা কল্পনার অগোচর। তার উপর রেণু পীড়িত। পাড়ায় টাইফয়েড জ্বর হইতেছে সে জানিত, ডাক্তারের কথার মধ্যেও এমনি একটা সন্দেহের ইঙ্গিত সে লক্ষ্য করিয়াছে। উপদেশ দিবার লোক নাই, শুশ্রূষা করিতে কেহ নাই, চিকিৎসা

করাইবার অর্থও হয়তো হাতে নাই। এই নিরীহ নির্বিরোধী মানুষটির কথা আগাগোড়া চিন্তা করিয়া তাহার সংসারে ধর্মবুদ্ধি, ভগবৎভক্তি, সাধুতা সকলের পরেই যেন ঘৃণা ধরিয়া গেল। সে ভাবিতেছিল, দিল্লী হইতে ফিরিয়া নানাবিধ অপব্যয়ে তাহার নিজের হাতও শূন্য, পোস্টাফিসে সামান্য যাহা অবশিষ্ট আছে তাহার 'পরে একটা দিনও নির্ভর করা চলে না, অথচ, এই রেণু তাহার কাছেই একদিন মানুষ হইয়াছে। কিন্তু সে কথা আজ থাক। তাহারই চিকিৎসায় তাহারই কাছে গিয়া হাত পাতিবে সে কি করিয়া? যদি না থাকে? সে জানে, যে-বাটিতে সে ছেলে পড়ায় তাঁহারা অত্যন্ত কৃপণ। বন্ধু-বান্ধব অনেক আছে সত্য, কিন্তু সেখানে আবেদন করা তেমনি নিষ্ফল। অনেক 'বড়লোক' গোপনে তাহারই কাছে ঋণী, সে-ঋণ নিজে সে না ভুলিলেও তাঁহারা ভুলিয়াছেন।

সহসা মনে পড়িল নতুন-মাকে। কিন্তু দীপশিখা জ্বলিয়াই স্তিমিত হইয়া আসিল—সেখানে দাও বলিয়া দাঁড়ানোর কল্পনাও তাহাকে কুণ্ঠিত করিল। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবেই বা কি এবং বলিবেই বা কি করিয়া। এ পথ নয়, কিন্তু আর-একটা পথও তাহার চোখে পড়িল না; কিন্তু সে বলিলে ত চলিবে না, পথ তাহার চাই-ই—তাহাকে পাইতেই হবে।

দাসী আসিয়া খাবার কথা বলিলে সে নিষেধ করিয়া জানাইল তাহার অন্যত্র নিমন্ত্রণ আছে। এমন প্রায়ই থাকে।

ঝি চলিয়া গেলে সে-ও দ্বারে চাবি দিল। রাখাল শৌখিন লোক, বেশভূষার সামান্য অপরিচ্ছন্নতাও তাহার সহ্য হয় না, কিন্তু আজ সে কথা তাহার মনেই পড়িল না, যেমন ছিল তেমনিই বাহির হইয়া গেল।

নতুন-মার বাটীতে আসিয়া যখন পৌঁছিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। সম্মুখে খানকয়েক মোটর দাঁড়াইয়া, বৃহৎ অট্টালিকা বহুসংখ্যক বিদ্যুৎ-দীপালোকে সমুজ্জ্বল, দ্বিতলের বড় ঘরে বাদ্যযন্ত্র বাঁধাবাঁধির শব্দ উঠিয়াছে, গৃহস্বামিনী নিরতিশয় ব্যস্ত—ভাগ্যবান আমন্ত্রিতগণের আদর-আপ্যায়নে ত্রুটি না ঘটে—

রাখালকে দেখিয়া একমুহূর্ত থমকিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন, এতক্ষণে বুঝি আমাদের মনে পড়লো বাবা?

এ-কয়দিনে যে নতুন-মাকে সে দেখিয়াছে, এ যেন সে নয়, অভিনব ও বহুমূল্য বেশভূষার পারিপাট্যে তাঁহার বয়সটাকে যেন দশ বৎসর পিছনে ঠেলিয়া দিয়াছে, রাখাল কেমন একপ্রকার হতবুদ্ধির মতো চাহিয়া রহিল, সহসা উত্তর দিতে পারিল না। তিনি তখনই আবার বলিলেন, আজ একটু কাজ করে দিতে বলেছিলুম বলে বুঝি একেবারে রাত্তির করে এলে রাজু?

রাখাল নম্রভাবে বলিল, কাজ সারতে দেরি হয়ে গেল মা। তা ছাড়া আমার না-আসতে পারায় ক্ষতি ত কিছুই হয়নি।

না, ক্ষতি হয়নি সত্যি, কিন্তু তখন বলে গেলেই ভালো হতো। তাঁহার কণ্ঠস্বরে এবার একটু বিরক্তির সুর মিশিল।

রাখাল বলিল, তখন নিজেও জানতাম না নতুন-মা। তারপরে আর সময় পেলাম না।

কে-একজন ডাকিতে সবিতা চলিয়া গেলেন, মিনিট–পাঁচেক পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন রাখাল তেমনি দাঁড়াইয়া আছে, বলিলেন, দাঁড়িয়ে কেন রাজু, ঘরে গিয়ে বসো গে।

রাখাল কিছুতেই সঙ্কোচ কাটাইতে পারে না, কিন্তু তাহার না বলিলেই নয়, শেষে আস্তে আস্তে বলিল, একটা বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি নতুন-মা, আমাকে আজ কিছু টাকা দিতে হবে।

সবিতা সবিস্ময়ে চাহিলেন, বলিতে বোধ হয় তাঁহারও বাধিল, কিন্তু বলিলেন, টাকা? টাকা ত নেই রাজু—যা ছিল ওটা কিনতেই সব খরচ হয়ে গেছে, ও-বেলাই ত শুনে গেলে?

কিছুই নেই মা?

না থাকার মধ্যেই। ঘর করতে সামান্য যদি কিছু থাকেও খুঁজে দেখতে হবে। সে অবসর ত নেই।

সারদা নানা কাজে আনাগোনা করিতেছিল, কথাটা শুনিতে পাইয়া কাছে আসিয়া বলিল, আমার কাছে দশ টাকা আছে, এনে দেবো?

রাখাল তাহার মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তুমি দেবে? আচ্ছা, দাও।

সারদা বলিল, মিনুর দিদিমার হাতে টাকা আছে, জিনিস রাখলে ধার দেয়।

তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে যেতে পারো সারদা?

কেন পারব না—তিনি ত বুড়োমানুষ। কিন্তু আমার তো জিনিস কিছু নেই—

তবু চলো না দেখি গে।

আসুন।

তাহাদের যাইবার সময় সবিতা বলিলেন, তা বলে না খেয়ে নীচে থেকেই যেন চলে যেও না রাজু—

রাখাল ফিরিয়া দাঁড়াইল, কহিল, আজ বড় অ-বেলায় খাওয়া হয়েছে নতুন-মা, ক্ষিদের লেশ নেই। আজ আমাকে ক্ষমা করতে হবে। এই বলিয়া সে সারদার পিছনে নীচে নামিয়া গেল। সবিতা আর তাহাকে অনুরোধ করিলেন না।

রাখাল চলিয়া গেছে, সারদা নিজের ঘরের দুই-একটা বাকি কাজ সারিয়া লইয়া পুনরায় উপরে যাইবার উপক্রম করিতেছে, সবিতা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাহার বিছানায় বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, একটা পান দাও ত মা, খাই।

এ ভাগ্য কখনো সারদার হয় নাই, সে বর্তিয়া গেল। তাড়াতাড়ি হাতটা ধুইয়া ফেলিয়া পান সাজিতে বসিতেছে, তিনি বলিলেন, রাজু না খেয়ে রাগ করে চলে গেল?

এত কাজের মধ্যেও ব্যাপারটা ভিতরে ভিতরে তাঁহাকে বিঁধিতেছিল, ঝাড়িয়া ফেলিতে পারেন নাই।

সারদা মুখ তুলিয়া কহিল, না মা, রাগ করে ত নয়।

রাগ করে বৈ কি। ও সকাল থেকেই একটু রেগে ছিল, তাতে আবার টাকা দিতে পারিনি—তুমি বুঝি দশ টাকা তারে দিলে?

না মা, আমার কাছে নিলেন না, মিনুর দিদিমার কাছ থেকে এক শ' টাকা এনে দিলুম।

এমনি? শুধু-হাতে সে দিল যে বড়ো?

সারদা বলিল, না, এমনি তো নয়। উনি হাতের সোনার ঘড়িটা আমাকে খুলে দিয়ে বললেন, এর দাম তিন শ' টাকা, তিনি যা দেন নিয়ে এসো। ওঁর চা-বাগানের কিছু কাগজ আছে, তাই বিক্রি করে এই মাসেই শোধ দেবেন বললেন।

সবিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, হঠাৎ টাকার দরকার ওর হলো কিসে?

সারদা কহিল, কে-একটি মেয়ে বড় পীড়িত, তারই চিকিৎসার জন্যে।

মেয়েটি কে যে তার জন্যে রাতারাতি ওকে ঘড়ি বন্ধক দিতে হয়?

সে ত জানিনে মা! কিন্তু, বোধ হয় তার খুব শক্ত অসুখই হয়েছে। টাকার অভাবে পাছে মারা যায়, এই তাঁর ভয়। মেয়েটির বাপ নাকি ছেলেবেলায় ওঁকে মানুষ করেছিলেন।

সবিতা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, ছেলেবেলায় ওকে মানুষ করেছিল বললে? এ ওর বানানো গল্প। রাজুকে কে মানুষ করেচে আমি জানি। তাঁর মেয়ের চিকিৎসায় পরকে ঘড়ি বাঁধা দিতে হয় না।

সারদা তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, বানানো গল্প বলে ত মনে হয় না মা। বলতে গিয়ে চোখে জল এলো— বললেন, এঁদেরও বিত্ত-বিভব অনেক ছিল, কিন্তু হঠাৎ ব্যবসা নষ্ট হয়ে দেনার জন্যে বাড়ি-ঘর পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে হলো, অথচ দিল্লী যাবার আগেও এমন দেখে যাননি। আজ গিয়ে দেখেন শয্যাগত

মেয়েটিকে দেখবার কেউ নেই—বুড়ো বাপ আপনি বসেছে রাঁধতে-কিন্তু জানে না কিছুই—হাত পুড়েচে, ভাত পুড়েচে, তরকারি পুড়ে গন্ধ উঠেছে—রাখালবাবুকে সমস্ত আবার রাঁধতে হলো, তবে সকলের খাওয়া হয়। তাই এখানে আসতে তাঁর দেরি। আমাকে বলেছিলেন এ দুঃসময়ে তাদের সাহায্য করতে। মেয়েটির ত মা নেই—তাকে একটু দেখতে। আমি রাজী হয়ে বলেচি, যা আপনি আদেশ করবেন তাই আমি করব।

সারদা পান দিল। সেটা তাঁর হাতে ধরাই রহিল; জিজ্ঞাসা করলেন; রাজু বললে হঠাৎ ব্যবসা নষ্ট হয়ে দেনার দায়ে তাঁর বাড়ি পর্যন্ত বিক্রি হয়ে গেল? দিল্লী যাবার আগেও তা দেখে যায়নি?

হাঁ, তাই ত বললেন।

অসম্ভব।

সারদা চুপ করিয়া রহিল। সবিতা পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, রাজু বললে মেয়েটির মা নেই—মারা গেছে বুঝি?

সারদা বলিল, মা যখন নেই তখন মরে গেছে নিশ্চয়, আর কি হতে পারে মা?

সবিতা উঠিয়া গেলেন। মিনিট পাঁচ-ছয় পরে সারদা প্রদীপ নিবাইয়া ঘর বন্ধ করিতেছিল, তিনি ফিরিয়া আসিলেন। পরনে সে বস্ত্র নাই, গায়ে সে-সব আভরণ নাই, মুখ উদ্বেগে ম্লান,—বলিলেন, আমার সঙ্গে তোমাকে একবার বাইরে যেতে হবে।

কোথায় মা?

রাজুর বাসায়।

এই রাত্তিরে? আমি নিশ্চয় বলচি মা, তিনি দুঃখ একটু করেছেন, কিন্তু রাগ করে চলে যাননি। তা ছাড়া, বাড়িতে কত কাজ, কত লোক এসেচে, সবাই খুঁজবে যে মা?

কেউ জানতে পারবে না সারদা, আমরা যাবো আর আসবো।

সারদা সন্দিগ্ধ-স্বরে কহিল, ভাল হবে না মা, হয়তো একটা গোলমাল উঠবে। বরঞ্চ কাল দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পরে গেলে কেউ জানতেও পারবে না।

সবিতা কয়েক-মুহূর্ত তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, আজ রাত্তির যাবে, কাল সকাল যাবে, তারপরে দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়া সেরে তবে যাবো? ততক্ষণে যে পাগল হয়ে যাবো সারদা?

এই উৎকণ্ঠার হেতু সারদা বুঝিল না, কিন্তু আর আপত্তিও করিল না,—নীরব হইয়া রহিল।

যে-দরজায় ভাড়াটেরা যাতায়াত করে সেখানে আসিয়া উভয়ে উপস্থিত হইলেন এবং মিনিট-দুই পরে পথচারী একটা খালি ট্যাক্সি ডাকিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলেন। চোখ পড়িল ঠিক উপরেই—আলোকোজ্জ্বল প্রশস্ত কক্ষটি তখন সঙ্গীতে হাস্যে ও আনন্দ-কলরবে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। একটি রুমালে বাঁধা বান্ডিল সারদার হাতে দিয়া সবিতা বলিলেন, আঁচলে বেঁধে রাখো ত মা, রাজু আমার হাত থেকে হয়তো নেবে না—তুমি তাকে দিও।

দশ মিনিট পরে তাঁহারা পায়ে হাঁটিয়া রাখালের ঘরের সম্মুখে আসিয়া দেখিলেন বাহিরে হইতে কবাট বন্ধ, ভিতরে কেহ নাই। দুজনে নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিয়া গাড়িতে বসিলেন এবং আরো মিনিট-পাঁচেক পরে বৌবাজারের একটা বৃহৎ বাটীর সম্মুখে আসিয়া তাঁহাদের গাড়ি থামিল। নামিতে হইল না, দেখা গেল সে গৃহেরও দ্বার রুদ্ধ। পথের আলো উপরের অবরুদ্ধ জানালায় গিয়া পড়িয়াছে; সেখানে বড় বড় লাল অক্ষরে নোটিশ ঝুলিতেছে—বাড়ি ভাড়া দেওয়া হইবে।

নিদারুণ বিপদের মুখে নিজেকে মুহূর্তে সামলাইয়া ফেলিবার শক্তি সবিতার অসাধারণ। তাঁহার মুখ দিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পর্যন্ত পড়িল না, গৃহে

ফিরিবার আদেশ দিয়া গাড়ির কোণে মাথা রাখিয়া পাষাণ মূর্তির ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

ঠিক কি হইয়াছে অনুমান করা সারদার কঠিন, কিন্তু সে এটা বুঝিল যে, রাখাল মিথ্যা বলিয়া আসে নাই এবং সত্যই ভয়ানক কি-একটা ঘটিয়াছে।

ফিরিবার পথে সে সবিতার শিথিল হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ কার বাড়ি মা? এই বাড়িই বিক্রি হয়ে গেছে?

হাঁ।

এঁর মেয়ের অসুখের কথাই তিনি বলছিলেন?

জবাব না পাইয়া সে আবার আস্তে আস্তে বলিল, কোথায় তাঁরা আছেন খোঁজ নেওয়া যে দরকার।

কোথায়, কার কাছে খোঁজ নেবো সারদা?

কাল নিশ্চয় রাখালবাবু আমাকে নিতে আসবেন।

কিন্তু যদি না আসে? আমার বাড়িতে আর যদি সে পা দিতে না চায়?

সারদা চুপ করিয়া রহিল। রাখাল টাকা চাহিয়াছে, তিনি দিতে পারেন নাই; এইটুকু মাত্রকে উপলক্ষ করিয়া নতুন-মার এতবড় উৎকণ্ঠা আবেগ ও আত্মগ্লানিতে তাহার মনের মধ্যে অত্যন্ত ধাঁধা লাগিল; তাহার সন্দেহ জন্মিল বিষয়টা বস্তুতঃ এই নয়, ভিতরে কি একটা নিষ্ঠুর রহস্য আছে। সবিতা যে রমণীবাবুর পত্নী নয়—এ কথা না জানার ভান করিলেও বাটীর সকলেই মনে মনে বুঝিত। তাহারা ভান করিত ভয়ে নয়, শ্রদ্ধায়। সবাই জানিত এ কোন বড়ঘরের মেয়ে, বড়ঘরের বৌ—আচারে আচরণে বড়, হৃদয় বড়, দয়া-দাক্ষিণ্যে ও সৌজন্যে আরও বড়, তাই তাঁহার এ দুর্ভাগ্যে কাহারও উল্লাসের বস্তু ছিল না, ছিল পরিতাপ ও গভীর লজ্জার। দীর্ঘদিন একত্র বাস করিয়া সকলে তাঁহাকে এতই ভালবাসিত।

গলির মোড় ঘুরিতে কোন-একটা দোকানের তীব্র আলোর রেখা আসিয়া পলকের জন্য সবিতার মুখের 'পরে পড়িল; সারদা দেখিল, তাতে যেন প্রাণ নাই, হাতের তালুটা হঠাৎ মনে হইল, অতিশয় শীতল, সে সভয়ে একটা নাড়া দিয়া ডাকিল, মা?

কেন মা?

বহুক্ষণ পর্যন্ত আর কোন সাড়া নাই—অন্ধকারেও সারদার মনে হইল, তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে, সে সাহস করিয়া হাত বাড়াইয়া দেখিল তাই বটে। সযত্নে আঁচলে মুছাইয়া দিয়া বলিল, মা, আমি আপনার মেয়ে, আমার আপনার বলতে সংসারে কেউ নেই, আমাকে যা করতে বলবেন আমি তাই করবো।

কথাগুলি সামান্যই। সবিতা উত্তরে কিছুই বলিলেন না, শুধু হাত বাড়াইয়া তাহাকে বুকের 'পরে টানিয়া লইলেন। অশ্রুবাষ্পের নিরুদ্ধ আবেগে সমস্ত দেহটা তাঁহার বার-কয়েক কাঁপিয়া উঠিল, তার পরে বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা সারদার মাথার উপরে একটি একটি করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

দুজনে বাড়ি ফিরিয়া যখন আসিলেন তখনও মালতীমালার গান চলিতেছে—তাঁহাদের স্বল্পকালের অনুপস্থিতি কেহ লক্ষ্য করে নাই। সবিতা নীচে হইতে স্নান করিয়া গিয়া উপরে উঠিতে ঝি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, মা, এখন নেয়ে এলে? মাথা ঘুরছিল বোধ করি?

হাঁ।

তাহলে কাপড় ছেড়ে একটু শুয়ে পড়ো গে মা, সারাদিন যে খাটুনি হয়েছে।

সারদা কহিল, এদিকে আমি আছি মা, কোন ভাবনা নেই। দরকার হলেই আপনাকে ডেকে আনবো।

তাই এনো সারদা, আমি একটু শুই গে।

সে রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা কোনমতে চুকিল, অভ্যাগতেরা একে একে বিদায় লইয়া গেলেন, খাটের শিয়রে বসিয়া সারদা ধীরে ধীরে সবিতার মাথায়, কপালে হাত বুলাইয়া দিতেছিল; ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে রমণীবাবু প্রবেশ করিয়া তিক্তস্বরে কহিলেন, আচ্ছা খেলাই খেললে! বাড়িতে কোন একটা কাজ হলে তোমারও কোন-একটা ঢং করা চাই। এ তোমার স্বভাব। লোকেরা গেছে—এবার নাও, ছলা-কলা রেখে একটু উঠে বসো,—একখানা ভালো কাপড় অন্ততঃ পরো—বিমলবাবু দেখা করতে আসচেন।

এরূপ উক্তি অভাবিত নয়, নূতনও নয়। বস্তুতঃ এমনিই কিছু একটা সবিতা মনে মনে আশঙ্কা করিতেছিল, ক্লান্তস্বরে বলিল, দেখা কিসের জন্যে?

কিসের জন্যে! কেন, তারা কি ভিখিরী যে খেতে পায় না? বাড়িতে নেমন্তন্ন অথচ বাড়ির গিন্নীরই দেখা নেই। বেশ বটে!

সবিতা কহিল, নেমন্তন্ন হলেই কি বাড়ির গিন্নীর সঙ্গে দেখা করা প্রথা নাকি?

রমণীবাবু বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, প্রথা নাকি? প্রথা নয় জানি—স্ত্রী হলে আলাপ-পরিচয় করতে কেউ চায় না—কিন্তু তারা সব জানে।

সারদার সম্মুখে সবিতা লজ্জায় মরিয়া গেল। সারদা নিজেও পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু উঠিতে পারিল না। এদিকে উত্তেজনা পাছে হাঁকাহাঁকিতে দাঁড়ায়, এই ভয় সবিতার সবচেয়ে বেশি, তাই নম্রভাবেই কহিল, আমি বড় অসুস্থ, তাঁকে বলো গে আজ দেখা হবে না।

কিন্তু ফল হইল উলটা। এই সহজ কণ্ঠের অস্বীকারে রমণীবাবু ক্ষেপিয়া গেলেন, চেঁচাইয়া উঠিলেন—আলবৎ দেখা হবে। সে কোটিপতি লোক তা জানো? বছরে আমার কত টাকার মাল কাটায় খবর রাখো? আমি বলছি—

দরজার বাইরে জুতার শব্দ শুনা গেল এবং চাকরটা সম্মুখে আসিয়া হাত দিয়া দেখাইয়া দিল।

সবিতা মাথার কাপড়টা কপাল পর্যন্ত টানিয়া দিয়া উঠিয়া বসিল। বিমলবাবু ঘরে ঢুকিয়া নমস্কার করিয়া নিজেই একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বলিলেন, শুনতে পেলুম আপনি হঠাৎ বড় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, কিন্তু কালই বোধ হয় আমাকে কানপুরে যেতে হবে, হয়তো আর ফিরতে পারবো না, অমনি বোম্বাই হয়ে জাহাজে সোজা কর্মস্থলে রওনা হতে হবে। ভাবলুম, মিনিট-খানেকের জন্যে হলেও একবার সাক্ষাৎ করে জানিয়ে যাই আপনার আতিথ্যে আজ বড় তৃপ্তিলাভ করেচি।

সবিতা আস্তে আস্তে বলিল, আমার সৌভাগ্য।

লোকটির বয়স চল্লিশ, চুলে পাক ধরিতে শুরু করিয়াছে, কিন্তু সযত্ন-সতর্কতায় দেহ স্বাস্থ্য ও রূপে পরিপূর্ণ; কহিলেন, খবর পেলুম রমণীবাবু আজকাল প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়েন, আর আপনার শরীরও যে ভালো থাকে না সে তো স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি। আপনার আর বছরের ফটোর সঙ্গে আজ মিল খুঁজে পাওয়া দায়—এমনি হয়েছে চেহারা।

শুনিয়া সবিতা মনে মনে লজ্জা পাইল, বলিল, আমার ফটো আপনি দেখেছেন নাকি?

দেখেচি বৈ কি! আপনাদের একসঙ্গে তোলা ছবি রমণীবাবু পাঠিয়েছিলেন। তখন থেকেই ভেবে রেখেচি, ছবির মালিককে একবার চোখে দেখবো। সে সাধ আজ মিটলো। চলুন না একবার আমাদের সিঙ্গাপুরে, দিন-কয়েক সমুদ্র-যাত্রাও হবে, আর দেহটাও একটু বদলাবে। আমার ক্রস স্ট্রীটে একখানি ছোট বাড়ি আছে, তার উপর তলায় দিনরাত সাগরের হাওয়া বয়, সকাল-সন্ধ্যায় সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত দেখতে পাওয়া যায়। রমণীবাবু যেতে রাজী হয়েছেন, শুধু আপনার সম্মতি আদায় করে নিয়ে যদি যেতে পারি ত জানবো এবার দেশে আসা আমার সার্থক হলো।

রমণীবাবু উল্লাসভরে বলিয়া উঠিলেন, আপনাকে ত কথা দিয়েছি বিমলবাবু আমি আসছে সপ্তাহেই রওনা হতে পারবো। সমুদ্রের জল-বাতাসের আমার বিশেষ প্রয়োজন। শরীরের স্বাস্থ্য—আপনি বলেন কি! ও হলো সকলের আগে।

বিমলবাবু কহিলেন, সে সৌভাগ্য হলে হয়তো এক জাহাজেই আমরা যাত্রা করতে পারবো। সবিতার উদ্দেশে স্মিতমুখে বলিলেন, অনুমতি হয় ত উদ্যোগ সআয়োজন করি—আমার অফিসেও একটা তার করে দিই—বাড়িটার কোথাও যেন কোন ত্রুটি না থাকে? কি বলেন?

সবিতা মাথা নাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, না, এখন কোথাও যাবার আমার সুবিধে হবে না।

শুনিয়া রমণীবাবু আর একবার গরম হইয়া উঠিলেন—কেন সুবিধে হবে না, শুনি? লেখা-পড়া কাল-পরশু শেষ হয়ে যাবে, দরোয়ান-চাকর বাড়িতে রইলো, ভাড়াটেরা রইলো, যাবার বাধাটা কি? না সে হবে না বিমলবাবু, সঙ্গে নিয়ে আমি যাবোই। না বললেই হবে? আমার শরীর খারাপ—আমার দেখাশোনা করবে কে? আপনি স্বচ্ছন্দে টেলিগ্রাম করে দিন।

বিমলবাবু পুনশ্চ সবিতাকেই লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, দিই একটা তার করে?

জবাব দিতে গিয়া এবার দুজনের চোখাচোখি হইয়া গেল, সবিতা সলজ্জে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি আনত করিয়া কহিল, না। আমি যেতে পারবো না।

রমণীবাবু ভয়ানক রাগিয়া উঠিলেন—না কেন? আমি বলচি তোমাকে যেতে হবে। আমি সঙ্গে নিয়ে যাবোই।

বিমলবাবুর মুখ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, বলিলেন, কি করে নিয়ে যাবেন রমণীবাবু, বেঁধে?

হাঁ, দরকার হয় ত তাই।

তা হলে আর কোথাও নিয়ে যাবেন, আমি সে অন্যায়ের ভার নিতে পারবো না।

কি জানি, ঠিক প্রবেশমুখেই এই ব্যক্তির উচ্চ কলরব তাঁহার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল কিনা বলিলেন, আচ্ছা, আজ তা হলে উঠি—আপনি বিশ্রাম করুন। অসুস্থ শরীরের ওপর হয়তো অত্যাচার করে গেলুম—তবু, যাবার পূর্বে আমার অনুরোধই রইল—আমি প্রতি মাসে আপনাকে প্রিপেড টেলিগ্রাম করবো—এই প্রার্থনা জানিয়ে—দেখি কতবার না বলে তার জবাব দিতে পারেন। এই বলিয়া তিনি একটু হাসিলেন, বলিলেন—নমস্কার—নমস্কার রমণীবাবু, আমি চললুম।

তিনি বাহির হইয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে রমণীবাবুও নীচে নামিয়া গেলেন। রমণীবাবুর বন্ধু বলিয়া এবং অশিক্ষিত ব্যবসায়ী মনে করিয়া এই লোকটির সম্বন্ধে যে ধারণা সবিতার জন্মিয়াছিল, চলিয়া গেলে মনে হইল হয়ত তাহা সত্য নয়।

সাত

সারদা বলিল, মা খাবেন না কিছু?

না।

এক গেলাস জল আর একটা পান দিয়ে যেতে বলবো?

না, দরকার নেই।

আলোটা নিবিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাবো?

তাই যাও সারদা, তোমার রাত হয়ে যাচ্চে।

তথাপি উঠি-উঠি করিয়াও তাহার দেরি হইতেছিল, রমণীবাবু ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন, নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, যাক বাঁচা গেল, আজকের মতো কোনরকমে মান-রক্ষেটা হলো। ভদ্রলোক খাসা মানুষ, অতবড় দরের লোক তা দেমাক অহঙ্কার নেই, তোমার জন্যে ত ভারী ভাবনা, একশো-বার অনুরোধ করে গেলো, কাল সকালে যেন একটা খবর পাঠিয়ে দিই। কি জানি, নিজেই হয়তো বা একটা মস্ত ডাক্তার নিয়ে সকালে হাজির হয়ে যায়—বলা যায় না কিছু—ওদের ত আর আমাদের মতো টাকার মায়া নেই—দশ-বিশ হাজার থাকলেই বা কি, গেলেই বা কি! রথমার কোম্পানি—ডিরেক্টারই বলো আর শেয়ারহোল্ডারই বলো, যা করে ঐ মিস্টার ঘোষাল। বললুম যে তোমাকে, লোকটা কোটি টাকার মালিক! কোটি টাকা! জারমানি, হল্যান্ডের সঙ্গে মস্ত কারবার—বছরে দু-চার বার এমন য়ুরোপ ঘুরে আসতে হয়—জেনেরাল ম্যানেজার শপ্ সাহেবই ওর মাইনে পায় তিন হাজার টাকা। মস্ত লোক। জাভার চিনি চালানিতেই গেল বছরে—

মুনাফার রোমাঞ্চকর অঙ্কটা আর বলা হইল না,—বাধা পড়িল। সবিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি যে আবার ফিরে এলে,—বাড়ি গেলে না?

কোন্ প্রসঙ্গে কি কথা! প্রশ্নটা তাঁহার আনন্দবর্ধন করিল না এবং বুঝিলেন যে, তাঁহার 'মস্ত লোকের' বিবরণে সবিতা বিন্দুমাত্র মনঃসংযোগ করে নাই। একটু থতমত খাইয়া কহিলেন, বাড়ি? নাঃ—আজ আর যাবো না।

কেন?

নাঃ—আজ আর—

সবিতা একমুহূর্ত তাঁহার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, মদের গন্ধ বেরুচ্চে—তুমি মদ খেয়েচো?

মদ? আমি? (ইশারায়) মাত্র একটি ফোঁটা—বুঝলে না—

কোথায় খেলে, এই বাড়িতে?

শোন কথা! বাড়িতে নয় তো কি শুঁড়ির দোকানে দাঁড়িয়ে খেয়ে এলুম?

মদ আনতে কে বললে?

কে বললে! এমন কথা কখনও শুনিনি। বাড়িতে দু-দশজন ভদ্রলোককে আহ্বান করলে ও একটু না আনিয়ে রাখলে কি হয়? তাই—

সকলেই খেলে?

খেলে না? ভালো জিনিস অফার করলে কোন্ শালা না খায় শুনি? অবাক করলে যে তুমি?

বিমলবাবু খেলেন?

রমণীবাবু এবার একটু ইতস্ততঃ করিলেন, বলিলেন, না, আজ ও একটু চাল দেখিয়ে গেল। নইলে ওর কীর্তি-কাহিনী জানতে বাকি নেই আমার। জানি সব।

সবিতা একটু মৌন থাকিয়া বলিলেন, জানবে বৈ কি। আচ্ছা, যাও এখন। রাত হয়েছে, ও-ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো গে।

বলার ধরনটা শুধু কর্কশ নয়, রূঢ়। সারদার কানেও অপমানকর ঠেকিল। আজ সন্ধ্যার পর হইতেই সবিতার নীরস কণ্ঠস্বরের প্রচ্ছন্ন রুক্ষতা রমণীবাবুকে

বিঁধিতেছিল, এই কথায় সহসা অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন,—আজ তোমার হয়েছে কি বলো ত? মেজাজ দেখি যে ভারী গরম। এতটা ভাল নয় নতুন-বৌ!

সারদার ভয় হইল, এইবার বুঝি একটা বিশ্রী কলহ বাধিবে, কিন্তু সবিতা নীরবে চোখ বুজিয়া তেমনিই শুইয়া রহিল, একটা কথারও জবাব দিল না।

রমণীবাবু কহিতে লাগিলেন, ওই যে বলেচি, সবাই জানে তুমি স্ত্রী নও—তাতেই লেগেছে যত আগুন। কিন্তু জানে না কে? সারদা জানে না, বাড়ির লোকের অজানা? একটা মিছে কথা কতদিন চাপা থাকে? এতে অপমানটা তোমার কি করলুম শুনি?

সবিতা উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার চোখের দৃষ্টি বর্শার ফলার মত তীক্ষ্ণ ও কঠিন, কহিলেন, এ কথা তুমি ছাড়া আর কোন পুরুষ মুখে আনতেও লজ্জা পেতো কেবল পুরুষমানুষ বলেই, কিন্তু তোমাকে বলা বৃথা। তোমার কথায় আমার অপমান হয়েচে আমি একবারও বলিনি।

সারদা ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল—কি করচেন মা, থামুন।

রমণীবাবু কহিলেন, মুখে বলোনি সত্যি, কিন্তু মনে ভাবচো ত তাই।

সবিতা উত্তর দিল, না, মুখেও বলিনি, মনেও ভাবিনি। তোমার স্ত্রী-পরিচয়ে আমার মর্যাদা বাড়ে না সেজবাবু। ওতে শুধু চক্ষুলজ্জা বাঁচে, নইলে সত্যিকারের লজ্জায় ভেতরটা আমার পুড়ে কালি হয়ে ওঠে।

কেন? কেন শুনি?

কি হবে শুনে? এ কি তুমি বুঝবে যে, আমি যাঁর স্ত্রী তোমরা কেউ তাঁর পায়ের ধুলোর যোগ্য নও।

সারদা পুনরায় ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল—এত রাত্তিরে কি করচেন মা আপনারা? দোহাই মা, চুপ করুন।

কিন্তু কেহই কান দিল না। রমণীবাবু কড়া গলায় হাঁকিলেন, সত্যি? সত্যি নাকি?

সবিতা কহিল, সত্যি কিনা তুমি নিজে জানো না? সমস্ত ভুলে গেলে? সেদিন তিনি ছাড়া সংসারে কেউ ছিল আমাদের রক্ষা করতে পারতো? শুধু হাড়-মাস রক্ষে করাই ত নয়, মান-ইজ্জত রক্ষে করেছিলেন। নিজে কত বড় হলে এতখানি ভিক্ষে দিতে পারে কখনো পারো ভাবতে? আমি তাঁর স্ত্রী। আমার সে ক্ষতি সয়েছে, এটুকু সইবে না?

রমণীবাবু উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া যে কথাটা মুখে আসিল তাহাই কহিলেন, তবে বললে তুমি রাগ করতে যাও কিসের জন্যে?

সবিতা বলিল, শুধু আজই ত বলোনি, প্রায়ই বলে থাকো। কথাটা কটু, তাই শুনলে হঠাৎ কানে লাগে, কিন্তু অন্তরটা তখনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে ওঠে আমার এই ভালো যে, এ লোকটা আমার কেউ নয়, এর সঙ্গে আমার কোন সত্যিকার সম্বন্ধ নেই।

সারদা অবাক হইয়া মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু অশিক্ষিত রমণীবাবুর পক্ষে এ উক্তির গভীর তাৎপর্য বুঝা কঠিন, তিনি শুধু এইটুকু বুঝিলেন যে, ইহা অত্যন্ত রূঢ় এবং অপমানকর। তাই সদম্ভে প্রশ্ন করিলেন, তবে তার কাছে ফিরে না গিয়ে আমার কাছেই পড়ে থাকো কিসের জন্যে?

সবিতা কি-একটা জবাব দিতে যাইতেছিল, কিন্তু সারদা হঠাৎ মুখে হাত চাপা দিয়া বন্ধ করিয়া দিল, কার সঙ্গে ঝগড়া করচেন মা, রাগের মাথায় সব ভুলে যাচ্ছেন?

সবিতা সেই হাতটা সরাইয়া দিয়া কহিল, না সারদা, আর আমি ঝগড়া করবো না। ওঁর যা মুখে আসে বলুন আমি চুপ করে রইলুম।

আচ্ছা, কাল এর সমুচিত ব্যবস্থা করবো, বলিয়া রমণীবাবু ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং মিনিট-দুই পরে সদর রাস্তায় তাঁহার মোটরের শব্দে বুঝা গেল তিনি বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

সারদা সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, সমুচিত ব্যবস্থাটা কি মা?

জানিনে সারদা। ও-কথা অনেকবার শুনেচি, কিন্তু আজো মানে বুঝতে পারিনি।

কিন্তু মিছিমিছি কি অনর্থ বাধলো বলুন ত।

সবিতা মৌন হইয়া রহিল।

সারদা নিজেও ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, রাত হলো এবার আমি যাই মা।

যাও মা।

সেই মাত্র ভোর হইয়াছে, সারদার ঘরের দরজায় ঘা পড়িল। সে উঠিয়া দ্বার খুলিতেই সবিতা প্রবেশ করিয়া বলিলেন, রাজু এলেই আমাকে খবর দিতে ভুলো না সারদা।

তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া সারদা শঙ্কিত হইল, বলিল, না মা, ভুলবো কেন, এলেই খবর দেবো।

সবিতা বলিলেন, দরোয়ান খবর নিয়েছে রাত্তিরে রাজু ঘরে ফেরেনি। কিন্তু যেখানেই থাক আজ তোমাকে নিয়ে যেতে সে আসবেই।

তাই ত বলেছিলেন।

আজই আসবে বলেছিল ত?

না, তা বলেন নি, শুধু বলেছিলেন মেয়েটির অসুখে তাঁকে সাহায্য করতে।

তুমি স্বীকার করেছিলে ত?

করেছিলুম বৈ কি।

কোনরকম আপত্তি করোনি ত মা?

না মা, কোন আপত্তি করিনি।

সবিতা বলিলেন, আমি এখন তবে যাই, তুমি ঘরের কাজকর্ম সারো, সে এলেই যেন জানতে পারি সারদা। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

ঘরের কাজ সারদার সামান্যই, তাড়াতাড়ি সরিয়া ফেলিয়া সে প্রস্তুত হইয়া রহিল,—রাখাল নিতে আসিলে যেন বিলম্ব না হয়। তোরঙ্গ খুলিয়া যে দুই-একখানি ভালো কাপড় ছিল তাহাও বাঁধিয়া রাখিল—সঙ্গে লইতে হইবে। অবিনাশবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে তাহার বেশী ভাব, তাহাকে গিয়া জানাইয়া রাখিল ঘরের চাবিটা সে রাখিয়া যাইবে, যেন সন্ধ্যায় প্রদীপ দেওয়া হয়। দূর-সম্পর্কের এক বোনের বড় অসুখ, তাহাকে শুশ্রূষা করিতে হইবে।

বেলা দশটা বাজে, সবিতা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন,—রাজু আসেনি সারদা?

না মা।

তুমি হয়ত যেতে পারবে না এমন সন্দেহ তার ত হয়নি?

হওয়া ত উচিত নয় মা। আমি একটুও অনিচ্ছে দেখাই নি। তখনি রাজী হয়েছিলুম।

তবে আসচে না কেন? সকালেই ত আসার কথা। একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, দরোয়ানকে পাঠিয়ে দিই আর একবার দেখে আসুক সে বাসায় ফিরেচে কি না। বলিয়া চলিয়া গেলেন।

কাল হইতে সারদা নিরন্তর চিন্তা করিয়াছে কে এই পীড়িত মেয়েটি। তাহার কৌতূহলের সীমা নাই, তবুও এই নিরতিশয় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত রমণীকে প্রশ্ন করিয়া সে নিঃসংশয় হইতে পারে নাই। কাল রাখালকে জিজ্ঞাসা করিলেই হয়ত উত্তর মিলিত, কিন্তু তখন এ প্রয়োজন তাহার ছিল না, মনেও পড়ে নাই।

এমনি করিয়া সকাল গেল, দুপুর গেল, বিকাল পার হইয়া রাত্রি ফিরিয়া আসিল, কিন্তু রাখালের দেখা নাই। আরও পরে সে যে আসিতে পারে এ আশাও যখন গেল তখন সবিতা আসিয়া সারদার বিছানায় শুইয়া পড়িলেন, একটা কথাও বলিলেন না। কেবল চোখ দিয়া অবিরল জল পড়িতে লাগিল। সারদা মুছাইয়া দিতে গেলে তিনি হাতটা তাহার সরাইয়া দিলেন।

ঝি আসিয়া খবর দিল বিমলবাবু আসিয়াছেন দেখা করিতে।

সবিতা কহিলেন, তাঁকে বলো গে বাবু বাড়ি নেই।

ঝি কহিল, তিনি নিজেই জানেন। বললেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, বাবুর সঙ্গে নয়।

সবিতার চক্ষে বিরক্তি ও ক্রোধ প্রকাশ পাইল, কিন্তু কি ভাবিয়া ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া উঠিয়া গেলেন। পথে ঝি বলিল, মা ঘরে গিয়ে কাপড়খানা ছেড়ে ফেলুন, একটু ময়লা দেখাচ্চে।

আজ এদিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না, দাসীর কথায় হুঁশ হইল, পরিধেয় বস্ত্রটা সত্যই দেখা করিবার মতো নয়।

মিনিট দশ-পনেরো পরে যখন বসিবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন ত্রুটি ধরিবার কিছু নাই, সবুজ রঙের অনুজ্জ্বল আলোকে মুখের শুষ্কতাও ঢাকা পড়িল।

বিমলবাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া নমস্কার করিলেন, বলিলেন, হয়ত ব্যস্ত করলুম, কিন্তু কাল বড় অসুস্থ দেখে গিয়েছিলুম, আজ না এসে পারলুম না।

সবিতা কহিল, আমি ভাল আছি। আপনার কানপুরে যাওয়া হয়নি?

না। এখান থেকে গিয়ে শুনতে পেলুম আমার জ্যাঠামশাই বড় পীড়িত, তাই—

নিজের জ্যাঠামশাই বুঝি?

না, নিজের ঠিক নয়,—বাবার খুড়তুতো ভাই—কিন্তু—

এক বাড়িতে আপনাদের সব একান্নবর্তী পরিবার বুঝি?

না, তা নয়। আগে তাই ছিল বটে, কিন্তু—

এখান থেকে গিয়েই হঠাৎ তাঁর অসুখের খবর পেলেন বুঝি?

না, ঠিক হঠাৎ নয়—ভুগচেন অনেকদিন থেকে, তবে—

তা হলে কালকেও হয়ত যেতে পারবেন না—খুব ক্ষতি হবে ত?

বিমলবাবু বলিলেন, ক্ষতি একটু হতে পারে, কিন্তু মানুষ কি কেবল ব্যবসার লাভ-লোকসান খতিয়েই জীবন কাটাবে? রমণীবাবু নিজেও ত একজন ব্যবসায়ী, কিন্তু কারবারের বাইরে কি কিছু করেন না?

সবিতা বলিল, করেন, কিন্তু না করলেই তাঁর ছিল ভালো!

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, কালকের রাগ আপনার আজও পড়েনি। রমণীবাবু আসবেন কখন?

সবিতা কহিল, জানিনে, না আসাই সম্ভব।

না আসাই সম্ভব? কখন গেলেন আজ?

আজকে নয়, কাল রাত্তিরে আপনাদের যাবার পরেই চলে গেছেন!

বিমলবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আশা করি আর বেশী রাগারাগি করে যাননি। কাল তিনি সামান্য একটু অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন বলেই বোধ করি ও-রকম অকারণ জোর-জবরদস্তি করেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই নিজের অন্যায় টের পেয়েছেন।

সবিতার কাছে কোন জবাব না পাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, কাল আমার অপরাধও কম হয়নি। সিঙ্গাপুরে যেতে অস্বীকার করার পরেও আপনাকে বারংবার অনুরোধ করা আমার ভারী অনুচিত হয়েচে। নইলে এ-সব কিছুই ঘটতো না। তারই ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে আজ আমার আসা। কাল বড় অসুস্থ ছিলেন, আজ বাস্তবিক সুস্থ হয়েছেন, না একজনের ‘পরে রাগ করে আর একজনকে শাস্তি দিচ্ছেন, বলুন ত সত্যি করে?

উত্তর দিতে গিয়া দুজনার চোখাচোখি হইল, সবিতা চোখ নামাইয়া বলিল, আমি ভালই আছি। না থাকলেই বা আপনি তার কি উপায় করবেন বিমলবাবু?

বিমলবাবু বলিলেন, উপায় করা ত শক্ত নয়, শক্ত হচ্চে অনুমতি পাওয়া। সেইটি পেতে চাই।

না, সে আপনি পাবেন না।

না পাই, অন্ততঃ রমণীবাবুকে ফোন করে জানাবার হুকুম দিন। আপনি নিজে ত জানাবেন না।

না, জানাবো না। কিন্তু আপনিই বা জানাতে এত ব্যস্ত কেন বলুন?

বিমলবাবু কয়েক-মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তারপরে ধীরে ধীরে কহিলেন, কালকের চেয়ে আজ আপনি যে ঢের বেশি অসুস্থ তা ঘরে পা দেওয়া মাত্রই চোখে দেখতে পেয়েচি—চেষ্টা করেও লুকোতে পারেন নি। তাই ব্যস্ত।

উত্তর দিতে সবিতারও ক্ষণকাল বিলম্ব হইল, তার পরে কহিল, নিজের চোখকে অতো নির্ভুল ভাবতে নেই বিমলবাবু, ভারী ঠকতে হয়।

বিমলবাবু কহিলেন, হয় না তা বলিনে, কিন্তু পরের চোখই কি নির্ভুল? সংসারে ঠকার ব্যাপার যখন আছেই তখন নিজের চোখের জন্যেই ঠকা ভালো। এতে তবু একটা সান্ত্বনা পাওয়া যায়।

সবিতার হাসিবার মতো মানসিক অবস্থা নয়—হাসির কথাও নয়,—অনিশ্চিত, অজ্ঞাত আতঙ্কে মন বিপর্যস্ত, তথাপি পরমাশ্চর্য এই যে, মুখে তাঁহার হাসি আসিয়া পড়িল। এ হাসি মানুষের সচরাচর চোখে পড়ে না,—যখন পড়ে রক্তে নেশা লাগে। বিমলবাবু কথা ভুলিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রইলেন,—ইহার ভাষা স্বতন্ত্র—পরিপূর্ণ মদিরাপাত্র তৃষ্ণার্ত মদ্যপের চোখের দৃষ্টির সহজতা যেন এক মুহূর্তে বিকৃত করিয়া দিল এবং সে চাহনির নিগূঢ় অর্থ নারীর চক্ষে গোপন রহিল না। সবিতার অনতিকাল পূর্বের সন্দেহ ও সম্ভাবিত ধারণা এইবার নিঃসংশয় প্রত্যয়ে সর্বাঙ্গ ভরিয়া যেন লজ্জার কালি ঢালিয়া দিল। তাহার মনে পড়িল এই লোকটা জানে সে স্ত্রী নয়, সে গণিকা। তাই অপমানে ভিতরটা যতই জ্বালা করিয়া উঠুক, কড়া গলায় প্রতিবাদ করিয়া ইহারই সম্মুখে মর্যাদাহানির অভিনয় করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না। বিগত রাত্রির ঘটনা স্মরণ হইল। তখন অপমানের প্রত্যুত্তরে সেও অপমান কম করে নাই, কিন্তু এই লোকটি অমার্জিত-রুচি অল্প-শিক্ষিত রমণীবাবু নয়—উভয়ের বিস্তর প্রভেদ—এ হয়ত অপমানের পরিবর্তে

একটা কথাও বলিবে না, হয়ত শুধু অবজ্ঞার চাপা হাসি ওষ্ঠাধরে লইয়া বিনয়-নম্র নমস্কারে ক্ষমা-ভিক্ষা চাহিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিবে।

মিনিট দুই-তিন নীরবে কাটিল, বিমলবাবু বলিলেন, কৈ জবাব দিলেন না আমার?

সবিতা মুখ তুলিয়া কহিল, কি জিজ্ঞেসা করেছিলেন আমার মনে নেই।

এমনি অন্যমনস্ক আজ?

কিন্তু ইহারও উত্তর না পাইয়া বলিলেন, আমি বলছিলাম, আপনি সত্যিই ভালো নেই। কি হয়েছে জানতে পাইনে?

না।

আমাকে না বলুন ডাক্তারকে ত স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন।

না, তাও পারিনে।

এ কিন্তু আপনার বড় অন্যায়। কারণ, যে দোষী সে পাচ্ছে না দণ্ড, পাচ্ছে যে মানুষ সম্পূর্ণ নির্দোষ।

এ অভিযোগেরও উত্তর আসিল না। বিমলবাবু বলিতে লাগিলেন, কাল যা দেখে গেছি, আজ তার চেয়ে আপনি ঢের বেশী খারাপ। হয়ত আবার জবাব দেবেন আমার দেখার ভুল হয়েছে, হয়ত বলবেন নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে কিন্তু একটা কথা আজ বলবো আপনাকে। গ্রহ-চক্র শিশুকাল থেকে অনেক ঘুরিয়েছে আমাকে, এই দুটো চোখ দিয়ে অনেক কিছুই সংসারের দেখতে হয়েছে,—বিশেষ ভুল তাদের হয়নি—হলে মাঝ-নদীতেই অদৃষ্ট-তরী ডুব মারতো, কূলে এসে ভিড়তো না। আমার সেই দুটো চোখ আজ হলফ করে জানাচ্চে আপনি ভালো নেই—তবু কিছুই করতে পাবো না—মুখ বুজে চলে যাবো—এ যে সহ্য করা কঠিন।

আবার দুজনের চোখে-চোখে মিলিল, কিন্তু এবার সবিতা দৃষ্টি আনত করিল না, শুধু চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। সম্মুখে তেমনি নীরবে বসিয়া বিমলবাবু।

তাঁহার লালসা-দীপ্ত চোখে উদ্বেগের সীমা নাই—নিষেধ মানিতে চাহে না—ডাক্তার ডাকিতে ছুটিতে চায়। আর সেখানে? অর্থ নাই, লোক নাই, অজানা কোন্ একটা গৃহের মধ্যে পড়িয়া সন্তান তাহার রোগশয্যায়। তাহার নিরুপায় মাতৃ-হৃদয় গভীর অন্তরে হাহাকার করিয়া উঠিল—শুধু অব্যক্ত বেদনায় নয়, লজ্জায় ও দুঃসহ অনুশোচনায়। কিছুতেই আর সে বসিয়া থাকিতে পারিল না, উদ্গত অশ্রু কোনমতে সংবরণ করিয়া দ্রুত উঠিয়া পড়িল, কহিল, আর আমাকে কষ্ট দেবেন না বিমলবাবু, আমার কিছুই চাইনে, আমি ভাল আছি। বলিয়াই একটা নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। বিমলবাবু বিস্ময়াপন্ন হইলেন, কিন্তু রাগ করিলেন না, বুঝিলেন ইহা কঠিন মান-অভিমানের ব্যাপার—দু'দিন সময় লাগিবে।

পরদিন বেলা যখন দশটা, অনেক দূরে গাড়ি রাখিয়া দরোয়ানের পিছনে পিছনে সবিতা সতেরো নম্বর বাটীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। ফটিকের মা বাহিরে যাইতেছিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে আপনি?

তুমি কে মা?

আমি ফটিকের মা। এ-বাড়ির অনেকদিনের ঝি।

কোথায় যাচ্চো ফটিকের মা?

দাসী হাতের বাটিটা দেখাইয়া কহিল, দোকানে তেল আনতে। কর্তার পা লেগে হঠাৎ সব তেলটুকু পড়ে গেলো, তাই যাচ্চি আবার আনতে।

বামুন আসেনি বুঝি?

না মা, এখনো আসেনি। শুনচি নাকি কাল আসবে। আজো কর্তাই রাঁধচেন।

রাজু বাড়ি নেই বুঝি?

তাঁকে চেনেন? না মা, তিনি বাড়ি নেই, ছেলে পড়াতে গেছেন। এলেন বলে।

আর রেণু কেমন আছে ফটিকের মা?

তেমনি, কি জানি কেন জ্বরটা ছাড়চে না মা, সকলের বড় ভাবনা হয়েছে।

কে দেখছে?

আমাদের বিনোদ ডাক্তার। এখনি আসবেন তিনি। আপনি কে মা?

আমি এঁদের গাঁয়ের বৌ ফটিকের মা, খুব দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। কলকাতায় থাকি, শুনতে পেলুম রেণুর অসুখ, তাই খবর নিতে এলুম। কর্তা আমাকে জানেন।

তাঁকে খবর দিয়ে আসবো কি?

না, দরকার নেই ফটিকের মা, আমি নিজেই যাচ্চি ওপরে। তুমি তেল নিয়ে এসো গে।

দরোয়ান দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে কহিল, তুমি মোড়ে গিয়ে দাঁড়াও গে মহাদেব, আমার সময় হলে তোমাকে ডেকে পাঠাবো, গাড়িটা যেন সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকে।

বহুৎ আচ্ছা মাইজী, বলিয়া মহাদেব চলিয়া গেল।

সবিতা উপরে উঠিয়া বারান্দার যে দিকটায় কর্তা রান্নার ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। পায়ের শব্দ কর্তার কানে গেল, কিন্তু ফিরিয়া দেখিবার ফুরসত নাই, কহিলেন, তেল আনলে? জলটা ফুটে উঠেচে ফটিকের মা, আলু-পটোল একসঙ্গে চড়াবো, না পটোলটা আগে সেদ্ধ করে নেবো?

সবিতা কহিলেন, একসঙ্গেই দাও মেজকর্তা, যা হোক একটা হবেই।

ব্রজবাবু ফিরিয়া চাহিয়া কহিলেন, নতুন-বৌ! কখন এলে? বসো। না না, মাটিতে না—মাটিতে না, বড় ধুলো। আমি আসন দিচ্চি, বলিয়া হাতের পাত্রটা তাড়াতাড়ি নামাইয়া রাখিতেছিলেন, সবিতা হাত বাড়াইয়া বাধা দিল,—করচো কি? তুমি হাতে করে আসন দিলে আমি বসবো কি করে?

তা বটে। কিন্তু এখন আর দোষ নেই—দিই না ও-ঘর থেকে একটা এনে?

না।

সবিতা সেইখানে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল, দোষ সেদিনও ছিল, আজও আছে, মরণের পরেও থাকবে মেজকর্তা। কিন্তু সে-কথা আজ থাক। বামুন কি পাওয়া যাচ্চে না?

পাওয়া অনেক যায় নতুন-বৌ, কিন্তু গলায় একটা পৈতে থাকলেই ত হাতে খাওয়া যায় না। রাখাল কাল একজনকে ধরে এনেছিল, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারলাম না। আবার কাল একজনকে ধরে আনবে বলে গেছে।

কিন্তু এ লোকটাও যে তোমার জেরায় টিকবে না মেজকর্তা।

ব্রজবাবু হাসিলেন, কহিলেন, আশ্চর্য নয়, অন্ততঃ সেই ভয়ই করি। কিন্তু উপায় কি!

সবিতা কহিল, আমি যদি কাউকে ধরে এনে বলি রাখতে—রাখবে মেজকর্তা?

ব্রজবাবু বলিলেন, নিশ্চয় রাখবো।

জেরা করবে না?

ব্রজবাবু আবার হাসিলেন, বলিলেন, না গো না, করবো না। এটুকু জানি, তোমার জেরায় পাস করে তবে সে আসবে। সে আরও কঠিন। যে যাই করুক, তুমি যে বুড়ো-বামুনের জাত মারবে না তাতে সন্দেহ নেই।

আমি বুঝি ঠকাতে পারিনে?

না, পারো না। মানুষকে ঠকানো তোমার স্বভাব নয়।

সবিতার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিতেই সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল পাছে ঝরিয়া পড়িলে ব্রজবাবু দেখিতে পান।

রাখাল আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার দুই হাতে দুটা পুঁটুলি, একটায় তরিতরকারি অন্যটায় সাগু বার্লি মিছরি ফল-মূল প্রভৃতি রোগীর পথ্য। নতুন-মাকে দেখিয়া প্রথমে সে আশ্চর্য হইল, তার পরে হাতের বোঝা নামাইয়া রাখিয়া

পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। ব্রজবাবুকে কহিল, আজ বড্ড বেলা হয়ে গেল কাকাবাবু, এবার আপনি ঠাকুরঘরে যান, উদ্যোগ-আয়োজন করে নিন, আমি নেয়ে এসে বাকি রান্নাটুকু সেরে ফেলি। এই বলিয়া সে একমুহূর্ত রান্নার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, কড়ায় ওটা কি ফুটছে?

ব্রজবাবু বলিলেন, আলু-পটোলের ঝোল।

আর?

আর? আর ভাতটা হবে বৈ ত নয় রাজু।

এতগুলো লোকে কি শুধু ঐ দিয়ে খেতে পারে কাকাবাবু? জল কৈ, কুটনো বাটনা কোথায়, রান্নার কিছুই ত চোখে দেখিনে। বারান্দায় ঝাঁট পর্যন্ত পড়েনি—ধুলো জমে রয়েচে, এত বেলা পর্যন্ত আপনারা করছিলেন কি? ফটিকের মা গেল কোথায়?

ব্রজবাবু অপ্রতিভভাবে কহিলেন, হঠাৎ পা লেগে তেলটা পড়ে গেল কিনা—সে গেছে দোকানে কিনতে—এলো বলে।

মধু?

মধু পেটের ব্যথায় সকাল থেকে পড়ে আছে, উঠতে পর্যন্ত পারেনি। রুগীর কাজ—সংসারের কাজ—একা ফটিকের মা—

খুব ভালো, বলিয়া রাখাল মুখ গম্ভীর করিল। তাহার দৃষ্টি পড়িল এক কড়া ঘোলের প্রতি, জিজ্ঞাসা করিল, এত ঘোল কিনলে কে?

ব্রজবাবু বলিলেন, ঘোল নয়, ছানার জল। ভাল কাটলো না কেন বলো ত? রেণু খেতেই চাইলে না।

শুনিয়া রাখাল জ্বলিয়া গেল, কহিল, বুদ্ধির কাজ করেছে যে খায়নি। সংসারের ভার তাহার ‘পরে, রাত্রি জাগিয়া অর্থ-চিন্তা করিয়া, ছুটাছুটি, পরিশ্রম করিয়া সে অত্যন্ত ক্লান্ত, মেজাজে রুক্ষ হইয়া পড়িয়াছে, রাগ করিয়া কহিল,

আপনার কাজই এমনি। এটুকু তৈরি করেও যে রুগীকে খাওয়াবেন তাও পারেন না।

সবিতার সম্মুখে নিজের অপটুতার জন্য তিরস্কৃত হইয়া ব্রজবাবু এমন কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন যে মুখ দেখিলে দয়া হয়। কোন কৈফিয়ত তাঁহার মুখে আসিল না; কিন্তু সে দেখিবার রাখালের সময় নাই, কহিল, যান আপনি ঠাকুরঘরে, যা করবার আমিই করচি।

ব্রজবাবু লজ্জিত-মুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ঠাকুরঘরের কোন কাজই এখন পর্যন্ত হয় নাই,—সমস্ত তাঁহাকেই করিতে হইবে। আর একবার স্নানের জন্য নীচে যাইতেছিলেন, সবিতা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল, আজ কিন্তু পূজো-আহ্নিক তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হবে মেজকর্তা, দেরি করলে চলবে না।

কেন?

কেনর উত্তর সবিতা দিল না; মুখ ফিরাইয়া রাখালকে বলিলেন, তোমার কাকাবাবুর জন্যে আগে একটুখানি মিছরি ভিজিয়ে দাও ত রাজু—কাল গেছে ওঁর একাদশী—এখন পর্যন্ত জলস্পর্শ করেন নি!

রাখাল ও ব্রজবাবু উভয়েই সবিস্ময়ে তাহার মুখের প্রতি চাহিল; ব্রজবাবু বলিলেন, এ কথাও তোমার মনে আছে নতুন-বৌ? আশ্চর্য!

সবিতা কহিল, আশ্চর্যই ত! কিন্তু দেরি করতে পারবে না বলে দিচ্চি। নইলে গোবিন্দর দোরগোড়ায় গিয়ে এমনি হাঙ্গামা শুরু করবো যে ঠাকুরের মন্ত্র পর্যন্ত তুমি ভুলে যাবে। যাও, শান্ত হয়ে পূজো করো গে, কোন ভাবনা আর তোমাকে ভাবতে হবে না।

ফটিকের মা তেল লইয়া হাজির হইল। রাখাল স্টোভ জ্বালিয়া বার্লি চড়াইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আর দুধ নেই ফটিকের মা?

না বাবু, কর্তা সবটা নষ্ট করে ফেলেছেন।

তা হলে উপায় কি হবে? রেণু খাবে কি?

নতুন-মা এবার একটু হাসিলেন, বলিলেন, দুধ না-ই থাকলো বাবা, তাতে ভয় পাবার আছে কি? এ-বেলাটা বার্লিতেই চলে যাবে। কিন্তু তুমি নিজে যেন কর্তার মতো বার্লিটাও নষ্ট করে ফেলো না।

না মা, আমি অতো বেহিসেবী নয়। আমার হাতে কিছু নষ্ট হয় না।

শুনিয়া নতুন-মা আবার একটু হাসিলেন, কিছু বলিলেন না। খানিক পরে সেখান হইতে উঠিয়া তিনি নীচে নামিয়া আসিলেন। উঠানের একধারে কল-ঘর, জলের শব্দেই চেনা গেল, খুঁজিতে হইল না। কবাট ভেজানো ছিল, ঠেলিতেই খুলিয়া গেল। ভিতরে ব্রজবাবু স্নান করিতেছিলেন, শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, সবিতা ভিতরে ঢুকিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া কহিল, মেজকর্তা, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

বেশ ত, বেশ ত, চলো বাইরে যাই—

সবিতা কহিল, না। বাইরে বাইরের লোকে দেখতে পাবে। এখানে একলা তোমার কাছে আমার লজ্জা নেই।

ব্রজবাবু জড়সড়োভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, কি কথা, নতুন-বৌ?

সবিতা কহিল, আমি এ বাড়ি থেকে যদি না যাই, তুমি কি করতে পারো আমার?

ব্রজবাবু তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া হতবুদ্ধি হইয়া বলিলেন, তার মানে?

সবিতা বলিল, যদি না যাই তোমার সুমুখে আমার গায়ে হাত দিতে কেউ পারবে না, পুলিশ ডেকে আমাকে ধরিয়ে দিতে তুমি পারবে না, পরের কাছে নালিশ জানানোও অসম্ভব, না গেলে কি করতে পারো আমার?

ব্রজবাবু ভয়ে কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিলেন, কি যে ঠাট্টা করো নতুন-বৌ তার মাথামুণ্ড নেই। নাও সরো, দোর খোলো—দেরি হয়ে যাচ্চে।

সবিতা উত্তর দিল, আমি ঠাট্টা করিনি মেজকর্তা, সত্যিই বলচি, কিছুতে দোর খুলবো না যতক্ষণ না জবাব দেবে।

ব্রজবাবু অধিকতর ভীত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, ঠাট্টা না হয়তো এ তোমার পাগলামি। পাগলামির কি কোন জবাব আছে?

জবাব না থাকে ত থাকো পাগলের সঙ্গে একঘরে বন্ধ। দোর খুলবো না।

লোকে বলবে কি?

তাদের যা ইচ্ছে বলুক।

ব্রজবাবু কহিলেন, ভালো বিপদ! জোর করে থাকার কথা কেউ শুনেচে কখনো দুনিয়ায়? তা হলে ত আইন-কানুন বিচার-আচার থাকে না, জোর করে যার যা খুশি তাই করতে পারে সংসারে?

সবিতা কহিল, পারেই ত। তুমি কি করবে বলো না?

এখানে থাকবে, নিজের বাড়িতেও যাবে না?

না। নিজের বাড়ি আমার এই, যেখানে স্বামী আছে, সন্তান আছে। এতদিন পরের বাড়িতে ছিলুম, আর সেখানে যাবো না।

এখানে থাকবে কোথায়?

নীচে এতগুলো ঘর পড়ে আছে তার একটাতে থাকবো। লোকের কাছে দাসী বলে আমার পরিচয় দিও—তোমার মিথ্যে বলাও হবে না।

তুমি ক্ষেপেছো নতুন-বৌ, এ কখনো পারি?

এ পারবে না, কিন্তু ঢের বেশী শক্ত কাজ আমাকে দূর করা। সে পারবে কি করে? আমি কিছুতে যাবো না, মেজকর্তা, তোমাকে নিশ্চয় বলে দিলুম।

পাগল! পাগল!

পাগল কিসে? জোর করছি বলে? তোমার ওপর করবো না ত সংসারে জোর করবো কার ওপর? আর জোরের পরীক্ষাই যদি হয় আমার সঙ্গে তুমি পারবে না।

কেন পারবো না?

কি করে পারবে? তোমার ত আর টাকাকড়ি নেই—গরীব হয়েছো—মামলা করবে কি দিয়ে?

ব্রজবাবু হাসিয়া ফেলিলেন। সবিতা জানু পাতিয়া তাঁহার দুই পায়ের উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। আজ তিন দিন হইল সে সর্ববিষয়েই উদাসীন, বিভ্রান্তচিত্ত অনির্দেশ্য শূন্য-পথে অনুক্ষণ ক্ষ্যাপার মতো ঘুরিয়া মরিতেছে, নিজের প্রতি লক্ষ্য করিবার মুহূর্ত সময় পায় নাই। তাহার অসংহত রুক্ষ কেশরাশি বর্ষার দিগন্ত প্রসারিত মেঘের মতো স্বামীর পা ঢাকিয়া চারিদিকে ভিজা মাটির ’পরে নিমেষে ছড়াইয়া পড়িল। হেঁট হইয়া সেইদিকে চাহিয়া ব্রজবাবু হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, তোমার মেয়ের জন্যই ত ভাবনা নতুন-বৌ। আচ্ছা, দেখি যদি—

বক্তব্য শেষ করিতে সবিতা দিল না, মুখ তুলিয়া চাহিল। দু’ চোখ জলে ভাসিতেছে, কহিল, না মেজকর্তা, মেয়ের জন্যে আর আমি ভাবিনে। তাকে দেখবার লোক আছে, কিন্তু তুমি? এই ভার মাথায় দিয়ে একদিন আমাকে এ-সংসারে তুমি এনেছিলে—

সহসা বাধা পড়িল, তাহার কথাও সম্পূর্ণ হইতে পাইল না, বাহিরে ডাক পড়িল, রাখালবাবু?

রাখাল উপর হইতে সাড়া দিল, আসুন ডাক্তারবাবু।

সবিতা দাঁড়াইয়া উঠিয়া ঘরের দ্বার খুলিয়া একদিকে সরিয়া দাঁড়াইল। ব্রজবাবু বাহির হইয়া গেলেন।

আট

ঠাকুরঘরের ভিতরে ব্রজবাবু এবং বাহিরে মুক্ত দ্বারের অনতিদূরে বসিয়া সবিতা অপলক-চক্ষে চাহিয়া স্বামীর কাজগুলি নিরীক্ষণ করিতেছিল। একদিন এই ঠাকুরের সকল দায়িত্ব ছিল তাহার নিজের, সে না করিলে স্বামীর পছন্দ হইত না। তখন সময়াভাবে অন্যান্য বহু সাংসারিক কর্তব্য তাহাকে উপেক্ষা করিতে হইত। তাই পিসশাশুড়ী নানা ছলে তাহার নানা ত্রুটি ধরিয়া নিজের গোপন বিদ্বেষের উপশম খুঁজিতেন, আশ্রিত ননদেরা বাঁকা কথায় মনের ক্ষোভ মিটাইত, বলিত, তাহারা কি বামুনের ঘরের মেয়ে নয়? দেব-দেবতার কাজকর্ম কি জানে না? পূজা-অর্চনা, ঠাকুর-দেবতা কি নতুন-বৌয়ের বাপের বাড়ির একচেটে যে সে-ই শুধু শিখে এসেছে? এ-সকল কথার জবাব সবিতা কোনদিন দিত না। কখনো বাধ্য হইয়া এ-ঘরের কাজ যদি অপরকে করিতে দিতে হইত, সারাদিন তাহার মন- কেমন করিতে থাকিত, চুপি চুপি আসিয়া ঠাকুরের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া বলিত, গোবিন্দ, অযত্ন হচ্চে বাবা জানি, কিন্তু উপায় যে নেই।

সেদিন নিরবচ্ছিন্ন শুচিতা ও নিচ্ছিদ্র অনুষ্ঠানে কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিই না তাহার ছিল। আর আজ? সেই গোপাল-মূর্তি তেমনি প্রশান্ত-মুখে আজও চাহিয়া আছেন, অভিমানের কোন চিহ্ন ও দুটি চোখে নাই।

এই পরিবারে এতবড় যে প্রলয় ঘটিল, ভাঙ্গা-গড়ায় এই গৃহে যুগান্ত বহিয়া গেল, এতবড় পরিবর্তন ঠাকুর কি জানিতেও পারেন নাই! একেবারে নির্বিকার উদাসীন? তাহার অভাবের দাগ কি কোথাও পড়িল না, তাহার এতদিনের এত সেবা শুষ্ক জলরেখার ন্যায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল!

বিবাহের পরেই তাহার গুরু-মন্ত্রের দীক্ষা হয়, পরিজনগণ আপত্তি করিয়া বলিয়াছিল, এত ছোট বয়সে ওটা হওয়া উচিত নয়, কারণ অবহেলায় অপরাধ

স্পর্শিতে পারে। ব্রজবাবু কান দেন নাই, বলিয়াছিলেন, বয়সে ছোট হলেও ওই বাড়ির গৃহিণী, আমার গোবিন্দর ভার নেবে বলেই ওকে ঘরে আনা, নইলে প্রয়োজন ছিল না। সে প্রয়োজন শেষ হয় নাই, ইষ্ট-মন্ত্রও সে ভুলে নাই, তথাপি সবই ঘুচিয়াছে; সেই গোবিন্দর ঘরে প্রবেশের অধিকারও আর তাহার নাই, দূরে, বাহিরে বসিতে হইয়াছে।

ডাক্তার বিদায় করিয়া রাখাল হাসিমুখে লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল, মায়ের আশীর্বাদের চেয়ে ওষুধ আছে নতুন-মা? বাড়িতে পা দিয়েছেন দেখেই জানি আর ভয় নেই, রেণু সেরে গেছে।

নতুন-মা চাহিয়া রহিলেন, ব্রজবাবু দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, রাখাল কহিল, জ্বর নেই, একদম নরম্যাল! বিনোদবাবু নিজেই ভারী খুশী, বললেন, ও-বেলায় যদি বা একটু হয়, কাল আর জ্বর হবে না। আর ভাবনা নেই, দিন-দুয়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়ে উঠবে। নতুন-মা, এ শুধু আপনার আশীর্বাদের ফল, নইলে এমন হয় না। আজ রাত্তিরে নিশ্চিন্ত হয়ে একটু ঘুমোনো যাবে, কাকাবাবু, বাঁচা গেল।

খবরটা সত্যিই অভাবিত। রেণুর পীড়া সহজ নহে, ক্রমশঃ বক্রগতি লইতেছে এই ছিল আতঙ্ক। মরণ-বাঁচনের কঠিন পথে দীর্ঘকাল অনিশ্চিত সংগ্রাম করিয়া চলিবার জন্যই সকলে যখন প্রস্তুত হইতেছিলেন তখন আসিল এই আশার অতীত সুসংবাদ। সবিতা গলায় আঁচল দিয়া বহুক্ষণ মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া বসিলেন, চোখ মুছিয়া কহিলেন, রাজু, চিরজীবী হও বাবা,—সুখে থাকো।

রাখালের আনন্দ ধরে না, মাথা হইতে গুরুভার নামিয়া গেছে, বলিল, মা, আগেকার দিনে রাজা-রানীরা গলার হার খুলে পুরস্কার দিতেন।

শুনিয়া সবিতা হাসিলেন, বলিলেন, হার তো তোমার গলায় মানাবে না বাবা, যদি বেঁচে থাকি বৌমা এলে তাঁর গলাতেই পরিয়ে দেবো।

রাখাল বলিল, এ-জন্মে সে গলা ত খুঁজে পাওয়া যাবে না মা, মাঝে থেকে আমিই বঞ্চিত হলুম। জানেন ত, আমার অদৃষ্টে মুখের অন্ন ধুলোয় পড়ে—ভোগে আসে না।

সবিতা বুঝিলেন, সে সে-দিনের তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণের ব্যাপারটাই ইঙ্গিত করিল। রাখাল বলিতে লাগিল, রেণু সেরে উঠুক, হার না পাই মিষ্টি-মুখ করবার দাবী কিন্তু ছাড়বো না। কিন্তু সেও অন্যদিনের কথা, আজ চলুন একবার রান্নাঘরের দিকে। এ ক'দিন শুধু ভাত খেয়ে আমাদের দিন কেটেছে কেউ গ্রাহ্য করিনি, আজ কিন্তু তাতে চলবে না, ভালো করে খাওয়া চাই। আসুন তার ব্যবস্থা করে দেবেন।

চলো বাবা যাই, বলিয়া সবিতা উঠিয়া গেলেন। সেখানে দূরে বসিয়া রাখালকে দিয়া তিনি সমস্তই করিলেন এবং যথাসময়ে সকলের ভালো করিয়াই আজ আহারাদি সমাধা হইল। সবাই জানিত সবিতা এখনো কিছুই খান নাই, কিন্তু খাবার প্রস্তাব কেহ মুখে আনিতেও ভরসা করিল না; কেবল ফটিকের মা নূতন লোক বলিয়া এবং না-জানার জন্যই কথাটা একবার বলিতে গিয়াছিল, কিন্তু রাখাল চোখের ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া দিল।

সকলের মুখেই আজ একটা নিরুদ্বেগ হাসি-খুশী ভাব, যেন হঠাৎ কোন যাদুমন্ত্রে এ-বাটীর উপর হইতে ভূতের উৎপাত ঘুচিয়া গেছে। রেণুর জ্বর নাই, সে আরামে ঘুমাইতেছে, মেঝেয় একটা মাদুর পাতিয়া ক্লান্ত রাখাল চোখ বুজিয়াছে, মধুর সাড়াশব্দ নাই, সম্ভবতঃ তাহার পেটের ব্যথা থামিয়াছে, নীচে হইতে খনখন ঝনঝন আওয়াজ আসিতেছে, বোধ হয় ফটিকের মা উচ্ছিষ্ট বাসনগুলো আজ বেলাবেলি মাজিয়া লইতেছে। সবিতা আসিয়া কর্তার ঘরের দ্বার ঠেলিয়া চৌকাঠের কাছে বসিল,—ওগো, জেগে আছ?

ব্রজবাবু জাগিয়াই ছিলেন, বিছানায় উঠিয়া বসিলেন।

সবিতা কহিল, কৈ আমার জবাব দিলে না।

ব্রজবাবু বলিলেন, তোমাকে রাখাল তখন ডেকে নিয়ে গেল, জবাবটা জেনে নেবার সময় পেলাম না।

কার কাছে জেনে নেবে—আমার কাছে?

ব্রজবাবু বলিলেন, আশ্চর্য হচ্চো কেন নতুন-বৌ, চিরদিন এই ব্যবস্থাই ত হয়ে এসেছে। সেদিনও ত রাখালের ঘরে অনেকদিনের মুলতুবি সমস্যার সমাধান করে নিলুম তোমার কাছে। খোঁজ নিলে শুনতে পাবে তার একটারও অন্যথা হয়নি।

সবিতা নতমুখে বসিয়া আছে দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, প্রশ্ন যেদিক থেকেই আসুক, জবাব দিয়ে এসেছো তুমি—আমি নয়। তার পরে হঠাৎ একদিন, আমার লক্ষ্মী-সরস্বতী, দু-ই করলে অন্তর্ধান, বুদ্ধির থলিটি গেল আমার হারিয়ে, তখন থেকে জবাব দেবার ভার পড়লো আমার নিজের 'পরে, দিয়েও এসেছি, কিন্তু তার দুর্গতি যে কি সে ত স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্চো নতুন-বৌ।

সবিতা মুখ তুলিয়া কহিল, কিন্তু এ যে আমার নিজের প্রশ্ন, মেজকর্তা।

ব্রজবাবু বলিলেন, কিন্তু প্রশ্ন ত সহজ নয়। এর মধ্যে আছে সংসার, সমাজ, পরিবার, আছে সামাজিক রীতিনীতি, আছে লৌকিক-পারলৌকিক ধর্ম-সংস্কার, আছে তোমার মেয়ের কল্যাণ-অকল্যাণ, মান-মর্যাদা, তার জীবনের সুখ-দুঃখ। এতবড় ভয়ানক জিজ্ঞাসার জবাব তুমি নিজে ছাড়া কে দেবে বলো ত? আমার বুদ্ধিতে কুলুবে কেন? তুমি বললে, যদি তুমি না যাও, যদি জোর করে এখানে থাকো, কি আমি করতে পারি। কি করা উচিত আমি ত জানিনে নতুন-বৌ, তুমিই বলে দাও।

সবিতা নিরুত্তরে বসিয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত কত-কি ভাবিতে লাগিল, তার পরে জিজ্ঞাসা করিল, মেজকর্তা, তোমার কারবার কি সত্যিই সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে?

হাঁ, সত্যিই সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে।

আমি টাকাটা বার করে না নিলে কি হতো?

তাতেও বাঁচতো না—শুধু ডুবতে হয়তো বছরখানেক দেরি ঘটতো।

তোমার হাতে টাকাকড়ি এখন কি আছে?

কিছুই না। আমার সেই হীরের আংটিটা বিক্রি করে পাঁচ শ’ টাকা পেয়েচি, তাতেই চলচে।

কোন্ আংটিটা? আমার ব্রত উদযাপনের দক্ষিণে বলে আমি নিজে কিনে যেটা তোমার হাতে পরিয়ে দিয়েছিলুম—সেইটে? তুমি তাকে বিক্রি করেছো?

সে ছাড়া আমার আর কিছু ছিল না, তা তো জানো নতুন-বৌ।

সবিতা আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া কহিল, যে দুটো তালুক ছিল সেও কি গেছে?

ব্রজবাবু বলিলেন, যায় নি, কিন্তু যাবে। বাঁধা পড়েছে, উদ্ধার করতে পারবো না।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিলে সবিতা প্রশ্ন করিল, তোমার এ-পক্ষের স্ত্রীর কি রইলো?

ব্রজবাবু বলিলেন, তাঁর নামে পটলডাঙায় দুখানা বাড়ি খরিদ করা হয়েছিল তা আছে। আর আছে গয়না, আছে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকার কাগজ। তাঁর এবং তাঁর মেয়ের চলে যাবে,—কষ্ট হবে না।

রেণুর কি আছে মেজকর্তা?

কিছু না। সামান্য খানকয়েক গহনা ছিল, তাও বোধ হয় ভুল করে তাঁরা নিয়ে চলে গেছেন।

শুনিয়া রেণুর মা অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া রকিন্তু এখন বুঝিল কথাগুলো তাহার কত অর্থহীন, কত অসম্ভব। কত হাস্যকর তাহার জোর করার দাবী, তাহার ভিত্তিহীন শূন্যগর্ভ আস্ফালন। আজ এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া এক কুলত্যাগিনী নারী ও অপর প্রান্তে দাঁড়াইয়া তাহার স্বামী, তাহার পীড়িত সন্তানই শুধু নয়,

মাঝখানে আছে সংসার, আছে ধর্ম, আছে নীতি, আছে সমাজ-বন্ধনের অসংখ্য বিধিবিধান।

কেবলমাত্র অশ্রুজলে ধুইয়া, স্বামীর পায়ে মাথা কুটিয়া এতবড় গুরুভার টলাইবে সে কি করিয়া? আর কথা কহিল না, স্বামীর উদ্দেশে আর একবার নীরবে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাখালের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, সে আসিয়া কহিল, আমি বলি বুঝি নতুন-মা চলে গেছেন।

না বাবা, এইবার যাবো। রেণু কেমন আছে?

ভালো আছে মা, এখনো ঘুমোচ্চে।

মেজকর্তা, আমি যাই এখন?

এসো।

রাখাল কহিল, মা, চলুন আপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি। কাল আবার আসবেন তো?

আসবো বৈ কি বাবা। এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন, পিছনে চলিল রাখাল।

পথে আসিতে গাড়ির মধ্যে বসিয়া সবিতা আজিকার সমস্ত কথা, সমস্ত ঘটনা মনে মনে আলোচনা করিতেছিল। তাহার তের বৎসর পূর্বেকার জীবন যা-কিছুর সঙ্গে গাঁথা ছিল, আজ আবার তাহাদের মাঝখানেই তাহার দিন কাটিল। স্বামী, কন্যা, রাখাল-রাজ এবং কুলদেবতা গোবিন্দ-জীউ। গৃহত্যাগের পরে হইতে অনুক্ষণ আত্মগোপন করিয়াই তাহার এতকাল কাটিয়াছে, কখনো তীর্থে বাহির হয় নাই, কোন দেব-মন্দিরে প্রবেশ করে নাই, কখনো গঙ্গাস্নানে যায় নাই—কত পর্বদিন, কত শুভক্ষণ, কত স্নানের যোগ বহিয়া গেছে—সাহস করিয়া কোনদিন পথের বারান্দায় পর্যন্ত দাঁড়ায় নাই পাছে পরিচিত কাহারো সে চোখে পড়ে। সেদিন রাখালের ঘরের মধ্যে অকস্মাৎ একটুখানি আবরণ উঠিয়াছে,—আজ

সকলের কাছেই তাহার ভয় ভাঙ্গিল, লজ্জা ঘুচিল। রেণু এখনো শুনে নাই, কিন্তু শুনিতে তাহার বাকি থাকিবে না। তখন সেও হয়তো এমনি নীরবেই ক্ষমা করিবে। তাহার ’পরে কাহারো রাগ নাই, অভিমান নাই; ব্যথা দিতে এতটুকু কটাক্ষ পর্যন্ত কেহ করে নাই। দুঃখের দিনে সে যে দয়া করিয়া তাহাদের খোঁজ লইতে আসিয়াছে ইহাতেই সকলে কৃতজ্ঞ। ব্যস্ত হইয়া ব্রজবাবু স্বহস্তে দিতে আসিয়াছিলেন তাহাকে বসিবার আসন—যেন অতিথির পরিচর্যায় কোথাও না ত্রুটি হয়। অর্থাৎ পরিপূর্ণ বিচ্ছেদের আর বাকি কিছু নাই, চলিয়া আসিবার কালে সবিতা এই কথাটাই নিঃসংশয়ে জানিয়া আসিল।

হিল।

ব্রজবাবু বলিলেন, ভাবচি, রেণু ভালো হলে আমরা দেশে চলে যাবো। সেখানে শুধু দয়া করে মেয়েটিকে কেউ যদি নেয় ওর বিয়ে দেবো, তার পরেও যদি বেঁচে থাকি, গোবিন্দর সেবা করে পাড়াগাঁয়ে কোনরকমে বাকি দিন-কটা আমার কেটে যাবে—এই ভরসা।

কিন্তু সবিতার কাছে কোন উত্তর না পাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, একটা মুশকিল হয়েছে রেণুকে নিয়ে, তাকে রাজী করাতে পারিনি। তাকে তুমি জানো না, কিন্তু সে হয়েছে তোমার মতোই অভিমানী, সহজে কিছু বলে না, কিন্তু যখন বলে তার আর অন্যথা করানো যায় না। যেদিন এই বাসাটায় চলে এলাম, সেদিন রেণু বললে, চলো বাবা আমরা দেশে চলে যাই। কিন্তু আমার বিয়ে দেবার তুমি চেষ্টা কোরো না, আমার বাবাকে একলা ফেলে রেখে আমি কোথাও যেতে পারবো না। বললাম, আমি ত বুড়ো হয়েছি মা, ক’টা দিনই বা বাঁচবো, কিন্তু তখন তোর কি হবে বল দিকি? ও বললে, বাবা, তুমি ত আমার অদৃষ্ট বদলাতে পারবে না। ছেলেবেলায় মা যাকে ফেলে দিয়ে যায়, যার বিয়ের দিনে অজানা-বাধায় সমস্ত ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, বাপের রাজ-সম্পদ যার ভোজবাজীর মতো বাতাসে উড়ে যায়, তাকে সুখ-ভোগের জন্যে ভগবান সংসারে পাঠান না, তার

দুঃখের জীবন দুঃখেই শেষ হয়। এই আমার কপালের লেখা বাবা, আমার জন্যে ভেবে ভেবে আর তুমি কষ্ট পেয়ো না।

বলিতে বলিতে সহসা গলাটা তাঁহার ভারী হইয়া আসিল, কিন্তু সামলাইয়া লইয়া কহিলেন, রেণু কথাগুলো বললে বিরক্ত হয়েও নয়, দুঃখের ধাক্কায় ব্যাকুল হয়েও নয়। ও জানে ওর ভাগ্যে এ-সব ঘটবেই। ওর মুখের উপর বিষাদের কালো ছায়া নেই, বললেও খুব সহজে—কিন্তু যা মুখে এলো তাই বলা নয়, খুব ভেবেচিন্তেই বলা। তাই ভয় হয়, এ থেকে হয়তো ওকে সহজে টলানো যাবে না। তবু ভাবি নতুন-বৌ, এ দুর্ভাগ্যেও এই আমার মস্ত সান্ত্বনা যে, রেণু আমার শোক করতে বসেনি, আমাকে মনে মনেও একবারো সে তিরস্কার করেনি।

স্বামীর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া সবিতার দুই চোখে জল ভরিয়া আসিল, কহিল, মেজকর্তা, বেঁচে থেকে সমস্তই চোখে দেখবো, কানে শুনবো, কিন্তু কিছুই করতে পাবো না?

ব্রজবাবু বলিলেন, কি করতে চাও নতুন-বৌ, রেণু তো কিছুতেই তোমার সাহায্য নেবে না! আর আমি—

সবিতার জিহ্বা শাসন মানিল না, অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, রেণু কি জানে আমি আজও বেঁচে আছি মেজকর্তা?

কথা কয়টি সামান্যই, কিন্তু প্রশ্নটি যে তাঁহার কতদিকে কতভাবে তাঁহার রাত্রির স্বপ্ন, দিনের কল্পনা ছাইয়া আছে, এ সংবাদ সে ছাড়া আর কে জানে? পাংশু-মুখে চাহিয়া উত্তরের জন্য তাহার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। ব্রজবাবু চুপ করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, হাঁ সে জানে।

জানে আমি বেঁচে আছি?

জানে। সে জানে তুমি কলকাতায় আছ—সে জানে তুমি অগাধ ঐশ্বর্যে সুখে আছো!

সবিতা মনে মনে বলিল, ধরণী দ্বিধা হও।

ব্রজবাবু কহিতে লাগিলেন, সে তোমার সাহায্য নেবে না, আর আমি—গোবিন্দর শেষের ডাক আমি কানে শুনতে পেয়েচি নতুন-বৌ, আমার গোনা-দিন ফুরিয়ে এলো, তবু যদি আমাকে কিছু দিয়ে তুমি তৃপ্তি পাও আমি নেবো। প্রয়োজন আছে বলে নয়—আমার ধর্মের অনুশাসন—আমার ঠাকুরের আদেশ বলে নেবো। তোমার দান হাত পেতে নিয়ে আমি পুরুষের শেষ অভিমান নিঃশেষ করে দিয়ে তৃণের চেয়েও হীন হয়ে সংসার থেকে বিদায় হবো। তখন যদি তাঁর শ্রীচরণে স্থান পাই।

সবিতা স্বামীর মুখের দিকে চাহিতে পারিল না, কিন্তু স্পষ্ট বুঝিল তাঁহার চোখ দিয়া দু'ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। সেইখানে স্তব্ধ নতমুখে বসিয়া তাঁহার সকালের কথাগুলা মনে হইতে লাগিল। মনে পড়িল, তখন স্বামীর স্নানের ঘরে ঢুকিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া সে তাঁহাকে জোর করিয়া বলিয়াছিল, যদি না যাই কি করতে পারো আমার? পায়ে মাথা রাখিয়া বলিয়াছিল, এই ত আমার গৃহ, এখানে আছে আমার কন্যা, আছে আমার স্বামী। আমাকে বিদায় করে সাধ্য কার?

রেণু জানে তাহার পিতা নিঃস্ব। সে জানে তাহার ভবিষ্যতের সকল সুখ-সৌভাগ্যের আশা নির্মূল হইয়াছে। কিন্তু এই লইয়া শোক করিতে বসে নাই, দুর্দশাকে সে অবিচলিত ধৈর্যে স্বীকার করিয়াছে। সঙ্কল্প করিয়াছে, ভালো হইয়া দরিদ্র পিতাকে সঙ্গে করিয়া সে তাহাদের নিভৃত পল্লীগৃহে ফিরিয়া যাইবে—তাঁহার সেবা করিয়া সেইখানেই জীবন অতিবাহিত করিবে।

ব্রজবাবু বলিয়াছিলেন, রেণু জানে মা তাহার বাঁচিয়া আছে—মা তাহার অগাধ ঐশ্বর্যে সুখে আছে। স্বামীর এই কথাটা তাহার যতবার মনে পড়িল, ততবারই সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ইহা মিথ্যা নয়,—কিন্তু ইহাই কি সত্য? মেয়েকে সে দেখে নাই, রাখালের মুখে আভাসে তাহার রূপের বিবরণ শুনিয়াছে,—শুনিয়াছে সে নাকি তাহার মায়ের মতোই দেখিতে। নিজের মুখ মনে করিয়া সে-ছবি আঁকিবার চেষ্টা করিল, স্পষ্ট তেমন হইল না, তবুও

রোগ-তপ্ত তাহার আপন মুখই যেন তাহার মানসপটে বারবার ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

পাড়াগাঁয়ের দুঃখ-দুর্দশার কত সম্ভব-অসম্ভব মূর্তিই যে তাহার কল্পনায় আসিতে যাইতে লাগিল তাহার সংখ্যা নাই,—এবং সমস্তই যেন সেই একটিমাত্র পাণ্ডুর, রুগ্ন মুখখানিকেই সর্বদিকে ঘিরিয়া। সংসারে নিরাসক্ত দরিদ্র পিতা ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন, কিছুই তাঁহার চোখে পড়ে না,—সেইখানে রেণু একেবারে একা। দুর্দিনে সান্ত্বনা দিবার বন্ধু নাই, বিপদে ভরসা দিবার আত্মীয় নাই—সেখানে দিনের পরে দিন তাহার কেমন করিয়া কাটিবে? যদি কখনো এমনি অসুখে পড়ে—তখন? হঠাৎ যদি বৃদ্ধ পিতার পরলোকের ডাক আসে—সেদিন? কিন্তু উপায় নাই—উপায় নাই! তাহার মনে হইতে লাগিল পিঞ্জরে রুদ্ধ করিয়া তাহারি চোখের উপর যেন সন্তানকে তাহার কাহারা হত্যা করিতেছে।

সবিতার চৈতন্য হইল, যখন গাড়ী আসিয়া তাহার দরজায় দাঁড়াইল। উপরে উঠিতে ঝি আসিয়া চুপি চুপি বলিল, মা, বাবু বড় রাগ করেছেন।

কখন এলেন তিনি?

অনেকক্ষণ। বড় ঘরে বসে বিমলবাবুর সঙ্গে কথা কইচেন।

তিনি কখন এলেন?

একটু আগে। এখন হঠাৎ সে-ঘরে গিয়ে কাজ নেই মা, রাগটা একটু পড়ুক।

সবিতা ভ্রূকুটি করিল, কহিল, তুমি নিজের কাজ করো গে।

সে স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িয়া বসিবার ঘরে আসিয়া যখন দাঁড়াইল তখন সন্ধ্যার আলো জ্বালা হইয়াছে, বিমলবাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছেন আজ?

ভালো আছি। বসুন।

তিনি বসিলে সবিতা নিজেও গিয়া একটা চৌকিতে উপবেশন করিল। বিমলবাবু বলিলেন, শুনলুম আপনি দুপুরের পূর্বেই বেরিয়েছিলেন—আজ আপনার খাওয়া পর্যন্ত হয়নি।

সবিতা কহিল, না তার সময় পাইনি।

রমণীবাবু মুখ মেঘাচ্ছন্ন করিয়া বসিয়াছিলেন, কহিলেন, কোথায় যাওয়া হয়েছিল আজ?

সবিতা কহিল, আমার কাজ ছিল।

কাজ সমস্ত দিন?

নইলে সমস্ত দিন থাকতে যাবো কেন? আগেই ত ফিরতে পারতুম।

রমণীবাবু ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, শুনতে পাই আজকাল প্রায়ই তুমি বাড়ি থাকো না—কাজটা কি ছিল একটু শুনতে পাইনে?

সবিতা কহিল, না, সে তোমার শোনবার নয়। বিমলবাবু, আজও আপনার যাওয়া হলো না?

বিমলবাবু বলিলেন, না হলো না। জ্যাঠামশাই একটু না সারলে বোধ করি যেতে পারবো না।

কথাটা তাঁহার শেষ হইবামাত্র রমণীবাবু সরোষে বলিয়া উঠিলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করে কি তুমি বাইরে গিয়েছিলে?

সবিতা শান্তভাবে উত্তর দিল, তুমি ত তখন ছিলে না।

জবাবটা ক্রোধ উদ্রেক করিবার মতো নয়, কিন্তু তিনি রাগিয়াই ছিলেন, তাই হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিলেন—থাকি না-থাকি সে আমি বুঝবো, কিন্তু আমার হুকুম ছাড়া তুমি এক-পা বার হবে না আজ স্পষ্ট করে বলে দিলুম। শুনতে পেলে?

শুনিতে সকলে পাইলেন; বিমলবাবু সঙ্কোচে ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, রমণীবাবু আজ আমি উঠি—কাজ আছে।

না না আপনি বসুন। কিন্তু এই সব বেলাল্লাপনা আমি যে বরদাস্ত করিনে তাই শুধু ওকে জানিয়ে দিলুম।

সবিতা প্রশ্ন করিল, বেলাল্লাপনা তুমি কাকে বল?

বলি, তুমি যা করে বেড়াচ্চো তাকে। যখন-তখন যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ানোকে।

কাজ থাকলেও যাবো না?

না। আমি যা বলবো সেই তোমার কাজ। অন্য কাজ, নেই।

তাই ত এতকাল করে এসেচি সেজবাবু, কিন্তু এখন কি আমাকে তোমার অবিশ্বাস হয়?

অবিশ্বাস তাহার প্রতি কোনদিন হয় না, তবু ক্রোধের উপর রমণীবাবু বলিয়া বসিলেন, হয়, একশোবার হয়। তুমি সীতা না সাবিত্রী যে অবিশ্বাস হতে পারে না? একজনকে ঠকাতে পেরেচো, আমাকে পারো না।

বিমলবাবু লজ্জায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, ইঁহাদের কলহের মাঝখানে কথা বলাও চলে না, কিন্তু সবিতা স্থির হইয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত নিঃশব্দে রমণীবাবুর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তারপরে বলিল, সেজবাবু, তুমি জানো আমি মিছে কথা বলিনে। আমাদের সম্বন্ধ আজ থেকে শেষ হলো। আর তুমি আমার বাড়িতে এসো না।

কলহ-বিবাদ ইতিপূর্বেও হইয়াছে, কিন্তু সমস্তই এক-তরফা। হাঙ্গামা, চেঁচামেচির ভয়ে চিরদিনই সবিতা চুপ করিয়া গেছে, পাছে গোপন কথাটা কাহারো কানে যায়। সেই নতুন-বৌয়ের মুখের এতবড় শক্ত কথায় রমণীবাবু ক্ষেপিয়া গেলেন, বিশেষতঃ তৃতীয় ব্যক্তির সমক্ষে। মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিলেন, কার বাড়ি এ? তোমার? বলতে একটু লজ্জা হলো না?

সবিতা তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপরে আস্তে আস্তে বলিল, হাঁ, আমার লজ্জা হওয়া উচিত সেজবাবু, তুমি সত্যি কথাই

বলেচো। না, এ-বাড়ি আমার নয়, তোমার—তুমিই দিয়েছিলে। কাল আমি আর কোথাও চলে যাবো, তখন সবই তোমার থাকবে। তেরো বৎসর পরে চলে যাবার দিনে তোমার একটা কপর্দকও আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো না, সমস্ত তোমাকে ফিরিয়ে দিলুম।

এই কণ্ঠস্বরে রমণীবাবুর চমক ভাঙ্গিল, হতবুদ্ধি হইয়া বলিলেন, কাল চলে যাবে কি রকম?

হাঁ, আমি কালই চলে যাবো!

চলে যাবো বললেই যেতে দেবো তোমাকে?

আমাকে বাধা দেবার মিথ্যে চেষ্টা করো না সেজবাবু, আমাদের সমস্ত শেষ হয়ে গেছে। এ আর ফিরবে না।

এতক্ষণে রমণীবাবুর হুঁশ হইল যে ব্যাপারটা সত্যই ভয়ানক হইয়া উঠিল; ভয় পাইয়া কহিলেন, আমি কি সত্যিই বলেচি নতুন-বৌ এ-বাড়ি তোমার নয়, আমার? রাগের মাথায় কি একটা কথা বার হয়ে যায় না?

সবিতা কহিল, রাগের জন্য নয়। রাগ যখন পড়ে যাবে—হয়তো দেরি হবে—তখন বুঝবে এতবড় বাড়ি দান করার ক্ষতি তোমার সইবে না, চিরকাল কাঁটার মতো তোমার মনে এই কথাটাই ফুটবে যে, আমাদের দুজনের দেনা-পাওনায় একলা তুমিই ঠকেচো। দাঁড়িপাল্লায় একটা দিক যখন শূন্য দেখবে তখন অন্যদিকে বাটখারার ভার তোমার বুকে যাঁতার মতো চেপে বসবে—সে সহ্য করার শিক্ষা তোমার হয়নি। কিন্তু আর তর্ক করার জোর আমার নেই—আমি বড় ক্লান্ত। বিমলবাবু, আর বোধ করি দেখা হবার আমাদের অবকাশ হবে না—আমি কালকেই চলে যাবো।

কোথায় যাবেন?

সে এখনো জানিনে।

কিন্তু যাবার আগে দেখা হবেই। আমি আবার আসবো।

সময় পান আসবেন। আজ কিন্তু আমি চললুম। এই বলিয়া সবিতা আজ উভয়কেই নমস্কার করিয়া উঠিয়া গেল।

বিমলবাবু বলিলেন, রমণীবাবু আমারও নমস্কার নিন—চললুম।

নয়

এতবড় কথাটা জানাজানি হইতে বাকি রহিল না, প্রভাত না হইতেই ভাড়াটেরা সবাই শুনিল কাল রাত্রে কর্তা ও গৃহিণীতে তুমুল কলহ হইয়া গেছে ও নতুন-মা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন কালই এ-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। অন্য কেহ হইলে তাহারা শুধু মৃদু হাসিয়া স্বকার্যে মন দিত, কিন্তু ইঁহার সম্বন্ধে তাহা পারিল না। ঠিক যে বিশ্বাস করিতে পারিল তাহাও নয়, কিন্তু বিষয়টা এতই গুরুতর যে, সত্য হইলে ভাবনার সীমা নাই। শহরে এত অল্পমূল্যে এমন বাসস্থান যে কোথাও মিলিবে না, ভয় এই শুধু নয়, তাহাদের কতদিনের ভাড়া বাকি পড়িয়া আছে এবং কতভাবেই না এই গৃহস্বামিনীর কাছে তাহারা ঋণী। অনেকে প্রায় ভুলিয়াই গেছে এ-গৃহ তাহাদের নিজের নয়। তাহারা সারদাকে ধরিয়া পড়িল এবং সে আসিয়া ম্লান-মুখে কহিল, এ কি কথা সবাই আজ বলাবলি করচে মা?

কি কথা সারদা?

ওরা বলচে আজই এ-বাড়ি থেকে আপনি চলে যাবেন।

ওরা সত্যি কথাই বলেচে সারদা।

সত্যি কথা! সত্যিই চলে যাবেন আপনি?

সত্যিই চলে যাবো সারদা।

শুনিয়া সারদা স্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কোথায় যাবেন?

নতুন-মা বলিলেন, সে এখনো স্থির করিনি, শুধু যেতে যে হবে এইটুকুই স্থির করেচি মা।

সারদার দু'চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, কহিল, ওরা কেউ বিশ্বাস করতে পারচে না মা, ভাবচে এ কেবল আপনার রাগের কথা—রাগ পড়লেই মিটে যাবে।

আমিও ভাবতে পারিনে মা, বিনা-মেঘে আমাদের মাথায় এতবড় বজ্রাঘাত হবে—নিরাশ্রয়ে আমরা কে কোথায় ভেসে যাবো। তবু, ওরা যা জানে না আমি তা জানি। আমি বুঝতে পেরেচি মা, সম্প্রতি এ-বাড়ি আপনার কাছে এত তেতো হয়ে উঠেছে যে, সে আর সইছে না, কিন্তু যাবো বললেই ত যাওয়া হতে পারে না!

নতুন-মা বলিলেন, কেন পারে না সারদা? এ-বাড়ি আমার তেতো হয়ে উঠেছে সম্প্রতি নয়, বারো বছর আগে যেদিন প্রথম এখানে পা দিয়েছি। কিন্তু বারো বৎসর ভুল করেছি বলে আরো বারো বৎসর ভুল করতে হবে, এ আমি আর মানবো না—এ দুর্গতি থেকে মুক্ত হবোই।

সারদা কহিল, মা, আমার ত কেউ নেই, আমাকে কার কাছে ফেলে দিয়ে যাবেন?

নতুন-মা বলিলেন, যার স্বামী আছে তার সব আছে সারদা। তুমি কোন অন্যায়, কোন অপরাধ করোনি। অনুতপ্ত হয়ে জীবনকে একদিন ফিরতেই হবে। দুঃখের জ্বালায় হতবুদ্ধি হয়ে সে যেখানেই পালিয়ে থাক আবার তোমার কাছে তাকে আসতে হবে; কিন্তু আমার সঙ্গে গেলে সে ত তোমাকে সহজে খুঁজে পাবে না মা।

সারদা নতমুখে কহিল, না মা, তিনি আর আসবেন না।

এমন কখনো হয় না সারদা,—সে আসবেই।

না মা, আসবেন না। কিন্তু আজকে নয়, আর একদিন আপনাকে তার কারণ জানাবো।

জানিবার জন্য সবিতা পীড়াপীড়ি করিলেন না, কিন্তু অতি-বিস্ময়ে চুপ করিয়া রহিলেন।

সারদা বলিতে লাগিল, যেখানেই যান আমি সঙ্গে যাবো। আপনি বড়ঘরের মেয়ে, বড়ঘরের বৌ—কোথাও একলা যাওয়া চলে না, সঙ্গে দাসী একজন চাই—আমি আপনার সেই দাসী মা।

কি করে জানলে সারদা আমি বড়ঘরের মেয়ে, বড়ঘরের বৌ? কে তোমাকে বললে এ কথা?

সারদা কহিল, কেউ বলেনি। কিন্তু শুধু কি এ কথা আমিই জানি মা, জানে সবাই। এ কথা লেখা আছে আপনার চোখের তারায়, লেখা আছে আপনার সর্বাঙ্গে, আপনি হেঁটে গেলে লোকে টের পায়। বাবু কি-একটু সন্দেহের আভাস দিয়েছিলেন, কি-একটু অপমানের কথা বলেছিলেন—এমন কত ঘরেই ত হয়—কিন্তু সে আপনার সহ্য হলো না, সমস্ত ত্যাগ করে চলে যেতে চাচ্চেন। বড়ঘরের মেয়ে ছাড়া কি এত অভিমান কারো থাকে মা?

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সে পুনশ্চ বলিতে লাগিল, ভেতরের কথা সবাই জানে। তবু যে কেউ কখনো মুখে আনতে পারে না, সে ভয়েও নয়, আপনার অনুগ্রহের লোভেও নয়; সে হলে এ ছলনা কোনদিন-না-কোনদিন প্রকাশ পেতো। আপনাকে আভাসেও যে কেউ অসম্মান করতে পারে না সে শুধু এইজন্যেই মা।

সবিতা সকৃতজ্ঞ-কণ্ঠে স্বীকার করিয়া বলিলেন, তোমরা সবাই যে আমাকে ভালোবাসো, সে আমি জানি।

সারদা কহিল, কেবল ভালবাসাই নয়, আমরা আপনাকে বহু সম্মান করি। শুধু আপনি ভালো বলেই করিনে, আপনি বড় বলে করি। তাই জল্পনা করা দূরে থাক, ও-কথা মনে ভাবলেও আমরা লজ্জা পাই। সেই আমাদের বিসর্জন দিয়ে কেমন করে চলে যাবেন?

কিন্তু না গিয়েও যে উপায় নেই।

উপায় যদি না থাকে, আমাদেরও সঙ্গে না গিয়ে উপায় নেই। আর, আমি না থাকলে কাজ করবে কে মা?

সবিতা বলিলেন, কে করবে জানিনে, কিন্তু বড়-ঘর থেকেই যদি এসে থাকি সারদা, তুমিও তেমন ঘর থেকে আসো নি যারা পরের কাজ করে বেড়ায়। তোমাকে দাসীর কাজ করতে আমিই বা দেবো কেন?

সারদা জবাব দিল, তা হলে দাসীর কাজ করবো না, আমি করবো মায়ের সেবা। অপমানের লজ্জায় একলা গিয়ে পথে দাঁড়াবেন, তার দুঃখ যে কত সে আমি জানি। সে আমার সইবে না মা, সঙ্গে আমি যাবোই। বলিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিল।

সে স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাহে না, কেবল ইঙ্গিতে বুঝাইতে চায় নিরাশ্রয়ের দুঃখ কত! সবিতার নিজেরও মনে পড়িল সেদিনের কথা যেদিন গভীর রাত্রে স্বামীগৃহ ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন। আজও সে দুঃখের তুলনা করিতে জগতের কোন দুঃখই খুঁজিয়া পান না। তাহার পরে সুদীর্ঘ বারো বৎসর কাটিল এই গৃহে। এই নরক-কুণ্ডেও বাঁচার প্রয়োজনে আবার তাঁহাকে ধীরে ধীরে অনেক-কিছুই সঞ্চয় করিতে হইয়াছে, সে-সকল সত্যই কি আজ ভার-বোঝা? সত্যই কি প্রয়োজন একেবারে ঘুচিয়াছে? আবার কি নিজেকে তিনি ফিরিয়া পাইয়াছেন? সারদার সতর্ক বাণী তাঁহাকে সচেতন করিল, সন্দেহ জাগিল নির্বিঘ্ন আশ্রয়-ত্যাগের নিদারুণ দুঃসাহস হয়তো আজ আর তাঁহার নাই। পুণ্যময় স্বামিগৃহবাসের বহু স্মৃতি মানস-পটে ফুটিয়া উঠিল, ভয় হইল, সেদিনের সেই দেহ, সেই মন, সেই শান্ত পল্লী-ভবনের সরল সামান্য প্রয়োজন এই বিক্ষুব্ধ নগরীর অশুচি জীবনযাত্রার ঘূর্ণাবর্তে পাক খাইয়া কোথায় ডুবিয়াছে, কোন মতেই আর তাহাদের সন্ধান মিলিবে না। মনে মনে মানিতেই হইল সে নতুন-বৌ আর তিনি নাই, তাঁহার বয়স হইয়াছে, অভ্যাসের বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এ-আশ্রয় যে দিয়াছে তাহার দেওয়া লাঞ্ছনা ও অপমান যত বড় হউক, সে আশ্রয় বিসর্জন দিয়া শূন্যহাতে পথে বাহির হওয়া আজ তাহার চেয়েও কঠিন; কিন্তু হঠাৎ মনে পড়িল, থাকাই বা যায় কিরূপে। এই লোকটার বিরুদ্ধে তাঁহার বিদ্বেষ ও ঘৃণা

অহরহ পুঞ্জিত হইয়া যে এতবড় পর্বতাকার হইয়াছে তাহা এতদিন নিজেও এমন করিয়া হিসাব করিয়া দেখেন নাই। মনে হইল সে আসিয়াছে, খাটে বসিয়া পান ও দোক্তায় একটা গাল আবের মত ফুলাইয়া বারংবার উচ্চারিত সেই সকল অত্যন্ত অরুচিকর সম্ভাষণ ও রসিকতায় তাহার মনোরঞ্জনের প্রযত্ন করিতেছে,—তাহার লালসালিপ্ত সেই ঘোলাটে চাহনি, তাহার একান্ত লজ্জাহীন অত্যুগ্র অধীরতা—এই কামার্ত অতি-প্রৌঢ় ব্যক্তির শয্যাপার্শ্বে গিয়া আবার তাঁহাকে রাত্রি যাপন করিতে হইবে মনে করিয়া ক্ষণকালের জন্য সবিতা যেন হতচেতন হইয়া রহিলেন।

মা?

সবিতা চকিত হইয়া সাড়া দিলেন, কেন সারদা?

সত্যি-সত্যিই আজ চলে যাবেন না ত?

আজ না হলেও একদিন তো যেতে হবে।

কেন যেতে হবে? এ-বাড়ি তো আপনার।

না, আমার নয়, রমণীবাবুর।

এতদিন এই নামটা তিনি মুখে আনিতেন না যেন সত্যই তাঁহার নিষিদ্ধ, আজ ছলনার মুখোশ খুলিয়া ফেলিলেন। সারদা লক্ষ্য করিল, কারণ হিন্দু-নারীর কানে ইহা বাজিবেই, এবং হেতুও বুঝিল। বলিল, আমরা তো সবাই জানি এ-বাড়ি তিনি আপনাকে দিয়েছিলেন, আর ত এতে তাঁর অধিকার নেই মা।

সবিতা বলিলেন, সে আমি জানিনে সারদা, সে আইন-আদালতের কথা। মৌখিক দানের কতটুকু স্বত্ব আমি জানিনে।

সারদা ভীত হইয়া বলিল, শুধু মৌখিক? লেখাপড়া হয়নি? এমন কাঁচা-কাজ কেন করেছিলেন মা?

সবিতা চুপ করিয়া রহিলেন, তাঁহার তৎক্ষণাৎ মনে পড়িল স্বামীর কাছে যে টাকা গচ্ছিত ছিল, সর্বস্বান্ত হইয়াও সুদে-আসলে সেদিন তাহা তিনি প্রত্যর্পণ করিয়াছেন।

সারদা কহিল, রমণীবাবুকে আসতে মানা করেছেন, এখন রাগের উপর যদি তিনি অস্বীকার করেন?

সবিতা অবিচলিত-কণ্ঠে বলিলেন, তিনি তাই করুন সারদা, আমি তাঁকে এতটুকু দোষ দেবো না। কেবল তাঁর কাছে আমার প্রার্থনা, রাগারাগি হাঁকাহাঁকি করতে আর যেন না তিনি আমার সুমুখে আসেন।

শুনিয়া সারদা নির্বাক হইয়া রহিল। অবশেষে শুষ্ক-মুখে কহিল, একটা কথা বলি মা আপনাকে। রমণীবাবুকে বিদায় দিলেন, থাকবার বাড়িটাও যেতে বসেছে, সত্যিই কি আপনার কোন ভাবনা হয় না? সেদিন যখন আমাকে ফেলে রেখে তিনি চলে গেলেন, একলা ঘরের মধ্যে আমি যেন ভয়ে পাগল হয়ে গেলুম। জ্ঞান ছিল না বলেই তো বিষ খেয়ে মরতে চেয়েছিলুম মা, নইলে এতবড় পাপের কাজে ত আমার সাহস হতো না, কিন্তু আপনাকে দেখি সম্পূর্ণ নির্ভয়,—কিছুই গ্রাহ্য করেন না—এমনি কি করে সম্ভব হয় মা!

বোধ হয় সম্ভব হয় শুধু আমাদের চেয়ে আপনি অনেক বড় বলেই।

সবিতা বলিলেন, বড় নই মা। কিন্তু তোমার আমার অবস্থা এক নয়। তুমি ছিলে সম্পূর্ণ নিঃস্ব, সম্পূর্ণ নিরুপায়, কিন্তু আমি তা নয়। সেদিন যে আমার অনেক টাকার সম্পত্তি কেনা হলো সে আমার আছে সারদা।

সারদা আশ্বস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাতে তো কোন গোলযোগ ঘটবে না মা?

সবিতা সগর্বে বলিয়া উঠিলেন, সে যে আমার স্বামীর দান সারদা,—সে যে আমার নিজের টাকা। তাতে গোলযোগে ঘটায় সাধ্য কার?

বারো বৎসর সবিতা একাকী, আত্মীয়-স্বজনহীন বারোটা বৎসর কাটিয়াছে তাঁহার পরগৃহে। মনের কথা বলিবার একটি লোকও এতদিন ছিল না। টাকার বিবরণ দিতে গিয়া অকস্মাৎ এই মেয়েটির সম্মুখে তাঁহার এতকালের নিরুদ্ধ উৎস-মুখ খুলিয়া গেল। হঠাৎ কি করিয়া স্বামীর সাক্ষাৎ মিলিল, প্রায়ান্ধকার গৃহকোণে কেবলমাত্র ছায়া দেখিয়া কেমন করিয়া তাহাকে তিনি চিনিয়া ফেলিলেন, তখন কি করিয়া নিজেকে সে সংবরণ করিল, তখন কি তিনি বলিলেন, কি তিনি করিলেন এইসকল অনর্গল বকিতে বকিতে কিছুক্ষণের জন্য সবিতা যেন আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেন।

সারদার বিস্ময়ের সীমা নাই—নতুন-মার এতখানি আত্ম-বিস্মরণ তাহার কল্পনার অগোচর।

নীচে হইতে ডাক আসিল—মাইজী!

সবিতা সচেতন হইয়া সাড়া দিলেন—কে মহাদেব?

দরোয়ান উপরে আসিয়া জানাইল তাঁহার আদেশ মত শোফার গাড়ি আনিয়াছে।

আধঘণ্টা পরে প্রস্তুত হইয়া নীচে নামিয়া দেখিলেন দ্বারের কাছে সারদা দাঁড়াইয়া, সে বলিল, মা, আমি আপনার সঙ্গে যাবো। সেখানে রাখাল-রাজুবাবু আছেন, তিনি কখনো রাগ করবেন না।

কেহ সঙ্গে যায়, এ ইচ্ছা সবিতার ছিল না, বলিলেন, রাগ হয়তো কেউ করবে না, কিন্তু সেখানে গিয়ে তোমার কি হবে সারদা?

সারদা কহিল, আমি সব জানি মা। রেণু অসুস্থ, আমি তাকে একবার দেখে আসবো। তার চেয়েও বেশী সাধ হয়েছে আমার রেণুর বাপকে দেখার,— প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধুলো নেবো। এই বলিয়া সে সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই গাড়িতে উঠিয়া বসিল।

পথে চলিতে সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, রেণুর বাপ কি-রকম দেখতে মা?

সবিতা কৌতুক করিয়া বলিলেন, তোমার কি-রকম মনে হয় সারদা? জমকালো ধরনের মস্ত মানুষ—না?

সারদা বলিল, না মা, তা মনে হয় না। কিন্তু তখন থেকেই ত ভাবচি, কোন চেহারাই যেন পছন্দ হচ্ছে না।

কেন হচ্ছে না সারদা?

হচ্চে না বোধ হয় এইজন্যে মা, তিনি ত কেবল রেণুর বাপ নয়, তিনি আপনারও স্বামী যে! মনে মনে কিছুতেই যেন দুজনকে একসঙ্গে মেলাতে পারচি নে।

সবিতা হাসিয়া বলিলেন, ধরো যদি এমন হয়—একজন বৃদ্ধ বৈষ্ণব—আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়—মাথায় শিখা, চুলগুলি প্রায় পেকে এসেছে, গৌর বর্ণ, দীর্ঘ দেহ, পূজায়, উপবাসে, আচারে, নিয়মে শীর্‌ণ এমন মানুষকে তোমার পছন্দ হয় সারদা?

না মা, হয় না। আপনার হয়?

না হয়ে উপায় কি সারদা? স্বামী পছন্দ-অপছন্দর জিনিস নয়, তাঁকে নির্বিচারে মেনে নিতে হয়। তুমি বলবে এ হলো শাস্ত্রের বিধি, মানুষের মনের বিধি নয়। কিন্তু এ তর্ক কারা করে জানো মা, তারাই করে যারা সত্যি করে আজও মানুষের মনের খবর পায়নি, যাদের দুর্গতির আগুন জ্বেলে জীবনের পথ হাতড়ে বেড়াতে হয়নি। সংসার-যাত্রায় স্বামীর রূপ-যৌবনের প্রশ্নটা মেয়েদের তুচ্ছ কথা মা, দু'দিনেই হিসেবের বাইরে পড়ে যায়।

সারদা অশিক্ষিত হইলেও এমন কথাটাকে ঠিক সত্য কথা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না, বুঝিল, এ তাঁর পরিতাপের গ্লানি, প্রতিক্রিয়ার অতল আলোড়িত হৃদয়ের ঐকান্তিক মার্জনা-ভিক্ষা। ইচ্ছা হইল না প্রতিবাদ করিয়া

তাঁহার বেদনা বাড়ায়, কিন্তু চুপ করিয়াও থাকিতে পারিল না, বলিল, একটা কথা ভারী জানতে ইচ্ছে করে মা, কিন্তু—

সবিতা কহিলেন, কিন্তু কি মা? প্রশ্ন করে লজ্জা দিতে আর আমাকে চাও না—এই ত? আর লজ্জা বাড়বে না সারদা, তুমি স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞেসা কর।

তথাপি সারদার কুণ্ঠা ঘুচে না। সে চুপ করিয়া আছে দেখিয়া তিনি নিজেই বলিলেন, হয়তো জানতে চাও এই যদি সত্যি তবে আমারই বা এতবড় দুর্গতি ঘটলো কেন? এর উত্তর অনেকদিন অনেকরকমে ভেবে দেখেচি, কিন্তু আমার গত-জীবনের কর্মফল ছাড়া এ প্রশ্নের আজও জবাব পাইনি মা।

যদিচ সারদা নিজেও কর্মফল মানে, তথাপি নতুন-মার এ উত্তরে তাহার মন সায় দিতে পারিল না, সে চুপ করিয়াই রহিল। সবিতা তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ইহা বুঝিলেন, বলিলেন, আর এক-জন্মের অজানা কর্মফলের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে এ-জন্মের ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁক খুঁজে বেড়াচ্চি এতবড় অবুঝ আমি নই মা, কিন্তু এ গোলকধাঁধার বাইরের পথই বা কে বার করেচে বলো ত? যে লোকটাকে কাল আমি বিদায় দিলুম, আমার স্বামীর চেয়ে তাকে কখনো বড় মনে করিনি, কখনো শ্রদ্ধা করিনি, কোনদিন ভালোবাসিনি, তবু তারই ঘরে আমার একটা যুগ কেটে গেল কি করে?

এবার সারদা কথা কহিল, সলজ্জে বলিল, আজ না হোক, কিন্তু সেদিনও কি রমণীবাবুকে আপনি ভালোবাসেন নি মা?

না মা, সেদিনও না—কোনদিনই না।

তবু পদস্খলন হলো কেন?

সবিতা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ম্লান হাসিয়া বলিলেন, পদস্খলনের কি কেন থাকে সারদা? ও ঘটে আচম্‌কা সম্পূর্ণ অকারণ নিরর্থকতায়। এই বারো-তেরো বছরে কত মেয়েকেই তো দেখলুম, আজ হয়তো সর্বনাশের পাঁকের তলায় কোথায় তারা তলিয়ে গেছে, সেদিন কিন্তু আমার একটা কথারও তারা জবাব

দিতে পারেনি, আমার পানে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চেয়ে দু'চোখ জলে ভেসে গেছে—ভেবেই পাইনি আপন অদৃষ্ট ছাড়া আর কাকে তারা অভিশাপ দেবে। দেখে তিরস্কার করবো কি, নিজেরই মাথা চাপড়ে কেঁদে বলেচি, নিষ্ঠুর দেবতা! তোমার রহস্যময় সংসারে বিনা-দোষে দুঃখের পালা গাইবার ভার দিলে কি শেষে এই সব হতভাগীদের 'পরে! কেন হয় জানিনে সারদা, কিন্তু এমনিই হয়।

সারদা এবারেও সায় দিল না, মাথা নাড়িয়া বাঁধা–রাস্তার পাকা-সিদ্ধান্তের অনুসরণে বলিল, তাদের দোষ ছিল না এমন কথা আপনি কি করে বলচেন মা?

সবিতা উত্তর দিলেন না, আর তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন না, শুধু নিঃশ্বাস ফেলিয়া জানালার বাইরে শূন্য-চোখে পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

গাড়ি আসিয়া যথাস্থানে থামিল, মহাদেব দরজা খুলিয়া দিতে উভয়ে নামিয়া পড়িলেন, গাড়ি কালকের মত অপেক্ষা করিতে অন্যত্র চলিয়া গেল।

সতেরো নম্বর বাড়ির সদর দরজা খোলা ছিল, উভয়ে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন নীচে কেহ নাই, সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেই চোখে পড়িল একটি ষোলো-সতেরো বছরের মেয়ে বারান্দায় বসিয়া তরকারি কুটিতেছে, সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, আসুন। রেলিঙের উপরে আসন ছিল, পাতিয়া দিল এবং সবিতার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল।

সেই মেয়ে আজ এতবড় হইয়াছে। আসনে বসিয়া সবিতা কিছুতেই নিজেকে সামলাইতে পারিলেন না, উচ্ছ্বসিত অশ্রু-বাষ্পে সমস্ত দেহ বারংবার কাঁপিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া অনর্গল জল পড়িতে লাগিল। সবিতা বুঝিলেন ইহা লজ্জাকর, হয়তো এ-অশ্রুর কোন মর্যাদা এই মেয়েটির কাছে নাই, কিন্তু সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেছে, কিছুতেই কিছু হইল না, শুধু জোর করিয়া দুই চোখের উপর আঁচল চাপিয়া মুখ লুকাইয়া বসিয়া রহিলেন।

দশ

সবিতা যতই চাহিলেন কান্না চাপিতে ততই গেল সে শাসনের বাহিরে। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আপ্রান্ত আলোড়িত সাগরজল কিছুতেই যেন শেষ হইতে চাহে না। মেয়েটি কিন্তু সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল না, দুর্বল ক্লান্ত হাতে যেমন ধীরে ধীরে তরকারি কুটিতেছিল তেমনি নীরবে কাজ করিতে লাগিল। অবশেষে ক্রন্দনের উদ্দামতা যদিচ শান্ত হইয়া আসিল, কিন্তু মুখের আবরণ সবিতা কিছুতেই ঘুচাইতে পারেন না, সে যেন আঁটিয়া চাপিয়া রহিল। কিন্তু এমন করিয়া কতক্ষণ চলে, সকলের অস্বস্তিই ভিতরে ভিতরে দুঃসহ হইয়া উঠিতে থাকে তাই বোধ হয় সারদাই প্রথমে কথা কহিয়া উঠিল—বোধ হয় যা' মনে আসিল তাই—বলিল, আজ তুমি কেমন আছো দিদি?

ভাল আছি।

জ্বর আর হয়নি?

না, আমি তো টের পাইনি।

ডাক্তার এখনো আসেন নি?

না, তিনি হয়ত ও-বেলা আসবেন।

সারদা একটু ভাবিয়া কহিল, কৈ, রাখালবাবুকে ত দেকচি নে? তিনি কি বাড়ি নেই?

না, তিনি পড়াতে গেছেন।

তোমার বাবা?

তিনি সকালে বেরিয়েচেন, বলে গেছেন ফিরতে দেরি হবে।

সারদার কথা শেষ হইয়া আসিল, এবার সে যে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। শেষে অনেক সঙ্কোচের পরে জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কে, তুমি চিনতে পেরেছো রেণু?

চিনবো কি করে, আমার তো মুখ মনে নেই।

বুঝতেও পারোনি?

রেণু মাথা নাড়িয়া বলিল, তা পেরেচি। রাজুদা বলে গেছেন। কিন্তু আপনি কে বুঝতে পারচি নে।

সারদা নিজের পরিচয় দিয়া কহিল, নাম আমার সারদা, তোমার মার কাছে থাকি। রাখালবাবু আমাকে জানেন—আমার কথা কি তিনি তোমার কাছে কখনও বলেন নি?

না। এ-সব কথা আমাকে তিনি বলবেন কেন, বলা ত উচিত নয়।

এইবার সারদার মুখ একেবারে বন্ধ হইল। তাহার বুদ্ধি-বিবেচনায় যতটা সম্ভব সে কথা চালাইয়াছে, আর অগ্রসর হইবার মতো সে খুঁজিয়া পাইল না। মিনিট-খানেক নীরবে কাটিলে রেণু উঠিয়া গেল, কিন্তু একটু পরেই একটি ঘটি হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, মা, পা ধোয়ার জল এনেচি—উঠুন।

এই আহ্বানে সবিতা পাগলের মতো অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া মেয়েকে বুকে টানিয়া লইলেন, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তার পরেই স্খলিত হইয়া তিনি সংজ্ঞা হারাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। মিনিট-কয়েক পরে জ্ঞান ফিরিলে দেখিলেন তাঁহার মাথা সারদার ক্রোড়ে এবং সুমুখে বসিয়া মেয়ে পাখা দিয়া বাতাস করিতেছে।

রেণু বলিল, মা, আহ্নিকের জায়গা করে রেখেচি, একবার উঠতে হবে যে।

শুনিয়া তাঁহার দুই চোখের কোণ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

রেণু পুনশ্চ কহিল, সারদাদিদি বলছিলেন আপনি চার-পাঁচদিন কিছু খাননি। একটু মিছরি ভিজিয়ে দিয়েচি মা, এইবার উঠে খেতে হবে। কিন্তু চুলগুলি সব ধুলোয়-জলে লুটোপটি করে একাকার হয়েছে, সে কিন্তু আমার দোষ নয় মা, সারদাদিদির। হ্যাঁ মা, আপনার চুলগুলি যেন কালো রেশম, কিন্তু, আমার এ রকম শক্ত হোলো কেন মা? ছেলেবেলায় খুব কসে বুঝি মুড়িয়ে দিয়েছিলেন? পাড়াগাঁয়ের ঐ বড়ো দোষ।

সবিতা হাত বাড়াইয়া মেয়ের মাথায় হাত দিলেন, কয়দিনের জ্বরে তাহার এলোমেলো চুলগুলি রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া আঙুল দিয়া নাড়াচাড়া করিলেন, অনেকবার কথা বলিতে গিয়া গলায় বাধিল, শেষে মাথাটি বুকের উপর টানিয়া লইয়া তিনি অবিশ্রান্ত অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন, যে-কথা কণ্ঠে বাধিয়াছিল তাহা কণ্ঠেই চাপা রহিল। কথা বাহির না হউক, কিন্তু এই অনুচ্চারিত ভাষা বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না; মেয়ে বুঝিল, সারদা বুঝিল, আর বুঝিলেন তিনি সংসারে কিছুই যাঁহার অজানা নয়।

এইভাবে কিছুক্ষণ থাকিয়া সবিতা উঠিয়া বসিলেন। মেয়ে তাঁহাকে নীচে স্নানের ঘরে লইয়া গিয়া পুনরায় স্নান করাইয়া আনিল, জোর করিয়া আহ্নিকে বসাইয়া দিল এবং তাহা সমাপ্ত হইলে তেমনি জোর করিয়াই তাঁহাকে মিছরির সরবৎ পান করাইল।

রেণু কহিল, মা, এইবার যাই রাঁধি গে? আপনাকে কিন্তু খেতে হবে।

যদি না খাই?

রেণু মৃদু হাসিয়া বলিল, তা হলে আপনার পায়ে মাথা খুঁড়বো, না, খেয়ে আপনি নিস্তার পাবেন না।

নিস্তার পেতে চাইনে মা, কিন্তু তুমি নিজে যে বড় দুর্বল, এখনো যে পথ্যিই করোনি।

রেণু বলিল, মা, সকালে একটু মিছরি খেয়ে জল খেয়েচি, আজ আর কিছু খাবো না। একটু দুর্বল সত্যি, কিন্তু না রাঁধলেই বা চলবে কেন মা? রাজুদার আসতে দেরি হবে, বাবাও ফিরবেন অনেক বেলায়, না রাঁধলে এতগুলি লোকে খেতে পাবে না যে। তা ছাড়া আমাকে ঠাকুরের ভোগ রাঁধতেও হবে। এই বলিয়া সে রেলিঙের উপর হইতে গামছাখানা কাঁধে ফেলিতেই সবিতা চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি নাইতে যাচ্চো রেণু?

রেণু হাসিয়া বলিল, মা, ভুলে গেছেন। আপনি কি কখনো না নেয়ে ভোগ রেঁধেছিলেন নাকি?

সবিতার মুখে এ কথার উত্তর আসিল না। সারদা বলিল, কিন্তু আবার জ্বর হতে পারে ত রেণু!

রেণু মাথা নাড়িয়া বলিল, না, বোধ হয় হবে না—আমি ভালো হয়ে গেছি। আর হলেই বা কি করবো সারদাদিদি, যতক্ষণ ভালো আছি করতে হবে ত? আমাদের করবার ত আর কেউ নেই।

উত্তর শুনিয়া উভয়েই নীরব হইয়া রহিলেন।

রান্না সামান্যই, কিন্তু সেটুকু সারিতেও যে রেণুর কতখানি ক্লেশ বোধ হইতেছিল তাহা অতিশয় স্পষ্ট। জ্বরে অবসন্ন, সাত-আটদিনের উপবাসে একান্ত দুর্বল। মেয়েটা মরিয়া মরিয়া চোখের সম্মুখে কাজ করিতে লাগিল, মা চুপ করিয়া বসিয়া দেখিলেন, কিন্তু কিছুই করিবার নাই। এ-জীবনে পারিবারিক বন্ধন যে এমন করিয়া ছিঁড়িয়াছে, ব্যবধান যে এত বৃহৎ, এমন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করার অবকাশ বোধ করি সবিতার আর কিছুতে মিলিত না যেমন আজ মিলিল।

রান্না শেষ হইল, সারদাকে উদ্দেশ করিয়া রেণু কহিল, বাবার ফিরতে, পূজো-আহ্নিক শেষ হতে আজ বেলা পড়ে যাবে, আপনি কেন মিথ্যে কষ্ট পাবেন সারদাদিদি, খেয়ে নিন। বাবা বলেন, এমনতরো অবস্থায় সংসারে একজন

উপবাস করে থাকলেই আর দোষ হয় না। সত্যিই নয় মা? এই বলিয়া সে মায়ের দিকে চাহিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল।

সবিতা জানেন তাঁহাদের বৃহৎ পরিবারে বাধ্য হইয়াই একদিন এ-নিয়ম প্রচলিত হইয়াছিল। ঠাকুরের পূজারী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত থাকিলেও ব্রজবাবু সহজে এ-কাজ কাহারও প্রতি ছাড়িয়া দিতে চাইতেন না; অথচ চিরদিন ঢিলা স্বভাবের লোক বলিয়া পূজায় তাঁহার প্রায়ই অযথা বিলম্ব ঘটিয়া যাইত। কিন্তু মেয়ের প্রশ্নের উত্তরে কি যে তাঁহার বলা উচিত তাহা ভাবিয়া পাইলেন না।

জবাব না পাইয়া রেণু বলিতে লাগিল, কিন্তু আমার নতুন-মার বেলা সইতো না, খেতে একটু দেরি হলেও তিনি ভয়ানক রেগে যেতেন। বাবা তাই আমাকে একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন যে, দেশের বাড়িতে কতদিন যে আপনার এ-বেলা খাওয়া হতো না, উপোস করে কাটাতে হতো তার সংখ্যা নাই, কিন্তু কোনদিন রাগ করে বলেন নি ঠাকুর বিলিয়ে দিতে।

সারদা আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কি ঠাকুর বিলিয়ে দিতে বলেন নাকি?

হাঁ, কতদিন। বলেন গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসতে।

তোমার বাবা কি বলেন?

সারদার প্রশ্নের উত্তর সে মাকেই দিল, বলিল, আমার বয়স তখন ন'বচ্ছর। বাবা ডেকে পাঠালেন, তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়চে। আমাকে কাছে বসিয়ে আদর করে বললেন, আমার গোবিন্দর সব ভার ছিল একদিন তোমার মায়ের উপর। আজ থেকে তুমিই তাঁর কাজ করবে—পারবে ত মা? বললুম, পারবো বাবা। তখন থেকে আমিই ঠাকুরের কাজ করি। পূজো না হওয়া পর্যন্ত আমিই বাড়িতে না খেয়ে থাকি; কিন্তু আজ থাকতুম না মা। জ্বরের ভয় না থাকলে আপনাকে বসিয়ে রেখে আমরা সবাই মিলে আজ

খেয়ে নিতুম। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল, ভাবিয়াও দেখিল না ইহা কতদূর অসম্ভব এবং কি মর্মান্তিক আঘাতই তাহার মাকে করিল।

সবিতা আর একদিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল, একটা কথারও উত্তর দিলেন না। মেয়ে যাহাই বলুক, মা জানেন এ গৃহের আর তিনি কেহ নহেন, পারিবারিক নিয়ম-পালনে আজ তাঁহার খাওয়া-না-খাওয়া সম্পূর্ণ অর্থহীন।

রেণু সারদাকে ঠাকুর দেখাইতে লইয়া গেল। সবিতা সেইখানেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। মেয়েটা কতটুকু বা বলিয়াছে! তাহার বিমাতার উত্ত্যক্ত-চিত্তের সামান্য একটুখানি বিবরণ, ঠাকুর-দেবতায় হতশ্রদ্ধার তুচ্ছ একটা উদাহরণ। এই ত! এমন কত ঘরেই ত আছে। অভাবিতও নয়, হয়তো বিশেষ দোষেরও নয়, তথাপি এই সামান্য বস্তুটাই তাঁহার কল্পনার বারো বছরের অজানা ইতিহাস চক্ষের পলকে দাগিয়া দিয়া গেল। এই স্ত্রীলোকটিই হয়তো তাহার স্বামীকে একটা মুহূর্তের জন্যও বুঝে নাই, তাহার কতদিনের কত মুখভার, কত চাপা-কলহ, কত ছোট ছোট সংঘর্ষের কাঁটায় অনুবিদ্ধ শান্তহীন দিন, কত বেদনা-বিক্ষত দুঃখময় স্মৃতি—এমনি করিয়াই এই স্নেহ-শ্রদ্ধা-হীনা, কোপনস্বভাবা নারীর একান্ত সান্নিধ্য ও শাসনে এই দুটি প্রাণীর—তাহার স্বামী ও কন্যার—দিনের পর দিন কাটিয়া আজ দুর্দশার শেষ সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছে।

অথচ, কিসের জন্য? এই প্রশ্নটাই এখন সবচেয়ে বড় করিয়া বিঁধিল সবিতাকে। যে-ভার ছিল স্বভাবতঃ তাহারি আপনার, সে-বোঝা যদি অপরে বহিতে না পারে, সে দোষ কি তাহাকে দিবার? তাহার নিজের ছাড়া অপরাধ কার? অধর্মের মার যে এত নির্দয়, একাকী এত দুঃখও যে সংসারে সৃষ্টি করা যায়, তাহার মূর্তি যে এত কদাকার, ইতিপূর্বে এমন করিয়া আর সে উপলব্ধি করে নাই। গ্লানি ও ব্যথার গুরুভারে তাহার নিশ্বাস পর্যন্ত যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল, তথাপি, প্রাণপণ বলে কেবলি মনে মনে বলিতে লাগিল, ইহার প্রতিকার কি নাই? সংসারে চিরস্থায়ী ত কিছুই নয়, শুধু কি তাহার দুষ্কৃতিই জগতে অবিনশ্বর?

কল্যাণের সকল পথ চিররুদ্ধ করিয়া কি শুধু সে-ই বিদ্যমান রহিবে, কোনদিনই তাহার ক্ষয় হইবে না?

মা, বাবা এসেছেন।

সবিতা মুখ তুলিয়া দেখিলেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া ব্রজবাবু। মুহূর্তের জন্য সে সমস্ত বাধা-ব্যবধান ভুলিয়া গেল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এত দেরি করলে যে? বাইরে বেরুলে কি তুমি ঘর-সংসারের কথা চিরকালই ভুলে যাবে? দেখো ত বেলার দিকে চেয়ে?

ব্রজবাবু মহা অপ্রতিভভাবে বিলম্বের কৈফিয়ত দিতে লাগিলেন; সবিতা বলিল, কিন্তু আর বেলা করতে পাবে না। ঠাকুর-পূজোটি আজ কিন্তু তোমাকে সংক্ষেপে সারতে হবে তা বলে দিচ্চি!

তাই হবে নতুন-বৌ, তাই হবে। রেণু, দে ত মা আমার গামছাটা, জামাটা ছেড়ে চট্ করে নেয়ে আসি।

না বাবা, তুমি একটু জিরোও। দেরি যা হবার হয়েছে, আমি তামাক সেজে দিই।

মা ও পিতা উভয়েই কন্যার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন; ব্রজবাবু কহিলেন, মেয়ে নইলে বাপের উপর এত দরদ আর কারও হয় না নতুন-বৌ। ওর কাছে তুমি ঠকলে। এই বলিয়া তিনি হাসিলেন।

সবিতা কহিল, ঠকতে আপত্তি নেই মেজকর্তা, কিন্তু এ-ই একমাত্র সত্যি নয়। সংসারে আর একজন আছে তার কাছে মেয়েও লাগে না, মা-ও না। এই বলিয়া তিনিও হাসিলেন। এই হাসি দেখিয়া ব্রজবাবু হঠাৎ যেন চমকিয়া গেলেন। কিন্তু আর কোন কথা না বলিয়া জামা-কাপড় ছাড়িতে ঘরে চলিয়া গেলেন।

সেদিন খাওয়া-দাওয়া চুকিল প্রায় দিনান্ত-বেলায়। ব্রজবাবু বিছানায় বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন, সবিতা ঘরে ঢুকিয়া মেঝের উপর একধারে দেয়াল ঠেস দিয়া বসিলেন।

ব্রজবাবু বলিলেন, খেলে?

হাঁ।

মেয়ে অযত্ন অবহেলা করেনি ত?

না।

ব্রজবাবু ক্ষণেক স্থির থাকিয়া বলিলেন, গরীবের ঘর, কিছুই নেই। হয়তো তোমার কষ্ট হলো নতুন-বৌ।

সবিতা তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া কহিল, সে হবে না মেজকর্তা, তুমি আমাকে কটু কথা বলতে পাবে না। এইটুকুই আমার শেষ সম্বল। মরণকালে যদি জ্ঞান থাকে ত শুধু এই কথাই তখন ভাববো আমার মতো স্বামী সংসারে কেউ কখনো পায়নি।

ব্রজবাবু মুখ দিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল, বলিলেন, তোমার নিজের খাবার কষ্টের কথা বলিনি নতুন-বৌ। বলছিলুম, আজ এ-ও তোমাকে চোখে দেখতে হলো। কেনই বা এলে!

সবিতা কহিলেন, দেখা দরকার মেজকর্তা, নইলে শাস্তি অসম্পূর্ণ থাকতো। তোমার গোবিন্দর একদিন সেবা করেছিলুম, বোধ হয় তিনিই টেনে এনেছেন। একেবারে পরিত্যাগ করতে পারেন নি। বলিতে বলিতে দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, একমনে যদি তাঁকে চাই, মনের কোথাও যদি ছলনা না রাখি, তিনি কি আমাকে মার্জনা করেন না মেজকর্তা?

ব্রজবাবু কষ্টে অশ্রুসংবরণ করিয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই করেন।

কিন্তু কি করে জানতে পারবো?

তা জানিনে নতুন-বৌ, সে দৃষ্টি বোধ করি তিনিই দেন।

সবিতা বহুক্ষণ অধোমুখে বসিয়া থাকিয়া মুখ তুলিল, জিজ্ঞাসা করিল, আজ তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

ব্রজবাবু বলিলেন, নন্দ সাহার কাছে কিছু টাকা পেতুম—

দিলেন?

কি জানো—

সে শুনতে চাইনে, দিলে কিনা বলো?

ব্রজবাবু না দিবার কারণটা ব্যক্ত করিতে কতই যেন কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, আনন্দপুরের সাহাদের ত জানোই, তারা অতি সজ্জন ধর্মভীরু লোক, কিন্তু দিনকাল এমন পড়েচে যে, মানুষে ইচ্ছে করলেও পেরে ওঠে না। তাছাড়া নন্দ সা এখন অন্ধ, কারবার গিয়ে পড়েচে ভাইপোদের হাতে—কিন্তু দেবে একদিন নিশ্চয়ই।

সে আমি জানি। কেননা ফাঁকি দিতে তাদের আমি দেবো না। নন্দ সাকে আমি ভুলিনি।

কি করবে,—নালিশ?

হাঁ, আর কোন উপায় যদি না পাই।

ব্রজবাবু হাসিয়া বলিলেন, মেজাজটি দেখছি এক তিলও বদলায় নি।

কেন বদলাবে? মেজাজ তোমারই বদলেছে নাকি? দুঃসময় কার বেশি তোমার চেয়ে? কিন্তু কাকে ফাঁকি দিতে পারলে? আমার মতো কৃতঘ্নের ঋণও শেষ কপর্দকও দিয়ে শোধ করে দিলে। তাদেরও তাই করতে হবে, শেষ কড়িটা পর্যন্ত আদায় দিয়ে, তবে তারা অব্যাহতি পাবে।

তাদের ওপর তোমার এত রাগ কিসের?

রাগ তো নয়, আমার জ্বালা। তোমাকে ভাই ঠকালে, বন্ধু ঠকালে, আত্মীয়-স্বজন—কর্মচারী,—স্ত্রী পর্যন্ত তোমাকে ঠকাতে ছাড়লে না। এবার আমার সঙ্গে তাদের বোঝা-পড়া। তোমার নতুন কুটুম্বরা আমাকে চেনে না, কিন্তু তারা চেনে।

ব্রজবাবুর বহুদিন পূর্বের কথা মনে পড়িল, তখনও একবার ডুবিতে বসিয়াছিলেন। তখন এই রমণীই হাত ধরিয়া তাঁহাকে ডাঙ্গায় তুলিয়াছিল।

বলিলেন, হাঁ, তারা বেশ চেনে। নতুন-বৌ মরেছে জেনে যারা স্বস্তিতে আছে তারা একটু ভয় পাবে। ভাববে ভূতের উপদ্রব ঘটলো। হয়তো গয়ায় পিণ্ডি দিতে ছুটবে।

সবিতা কহিল, তারা যা ইচ্ছে করুক ভয় করিনে। শুধু, তুমি পিণ্ডি দিতে না ছুটলেই হলো—এইখানেই আমার ভাবনা। নিজে করবে না ত সে কাজ?

ব্রজবাবু চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

উত্তর দিলে না যে?

ব্রজবাবু বলিলেন, না হয় তুমিই নিজে পথ বলে দাও! আমাদের রতন খুড়ো ও রতন খুড়ীর কথা তোমার মনে আছে? সে অবস্থায় রাজী আছ? এত দুঃখেও সবিতা হাসিয়া ফেলিল, সলজ্জে কহিল, ছি ছি, কি কথা তুমি বলো!

ব্রজবাবু কহিলেন, তবে কি করতে বলো? নতুন-বৌ গয়না চুরি করে পালিয়েছে বলে পুলিশে ধরিয়ে দেবো?

প্রস্তাবটা এত হাস্যকর যে বলামাত্রই দুজনে হাসিয়া ফেলিলেন। সবিতা বলিল, তোমার যত সব উদ্ভট কল্পনা।

বহুদিন পরে উভয়ের রহস্যোজ্জ্বল একটুমাত্র হাসির কিরণে ঘরের গুমোট অন্ধকার যেন অনেকখানি কাটিয়া গেল। ব্রজবাবু বলিলেন, শাস্তির বিধান সকলের এক নয় নতুন-বৌ। দণ্ড দিতেই যদি হয় তোমাকে আর কি দণ্ড দিতে পারি? যেদিন রাত্রে তোমার নিজের সংসার পায়ে ঠেলে চলে গেলে, সেদিনই আমি স্থির করেছিলাম, আবার যদি কখনো দেখা হয়, তোমার যা-কিছু পড়ে রইলো ফিরিয়ে দিয়ে আমি অঋণী হবো।

সবিতার বিদ্যুদ্বেগে মনে পড়িল স্বামীর একটা কথা যাহা তিনি তখন প্রায়ই বলিতেন। বলিতেন, ঋণ রেখে মরতে নেই নতুন-বৌ, সে পরজন্মে এসেও দাবী করে। এই তাঁর ভয়। কোন সূত্রেই আর যেন না উভয়ের দেখা হয়,—সকল সম্বন্ধ যেন এইখানেই চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কহিল, আমি বুঝেচি

মেজকর্তা। ইহ-পরকালে আর যেন না তোমার ওপর আমার কোন দাবী থাকে। সমস্তই যেন নিঃশেষ হয়—এই ত?

ব্রজবাবু মৌন হইয়া রহিলেন এবং যে আঁধার এইমাত্র ঈষৎ অপসৃত হইয়াছিল, সে আবার এই মৌনতার মধ্যে দিয়া সহস্রগুণ হইয়া ফিরিয়া আসিল। স্বামীর মুখের প্রতি আর সে চাহিয়া দেখিতেও পারিল না, নতনেত্রে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তোমরা কবে বাড়ি যাবে মেজকর্তা?

যত শীঘ্র পারি।

এখন যাই তবে?

এসো।

সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইল, বুঝিল সব শেষ হইয়াছে। সেই ভূমিকম্পের রাতে রসাতলের গর্ভ চিরিয়া যে পাষাণ-স্তূপ ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত হইয়া উভয়ের মাঝখানে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছিল, আজও সে তেমনি অক্ষয় হইয়াই আছে, তাহার তিলার্ধও নষ্ট হয় নাই। এই নিরীহ শান্ত মানুষটি যে এত কঠিন হইতে পারে, আজিকার পূর্বে এ কথা সে কবে ভাবিয়াছিল!

ঘরের বাহিরে পা বাড়াইয়াও সে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল, বলিল, মুক্তি পাবে না মেজকর্তা। তুমি বৈষ্ণব, কত মানুষের কত অপরাধই তুমি জীবনে ক্ষমা করেছো, কিন্তু আমাকে পারলে না। এ ঋণ তোমার রইলো। একদিন হয়তো তা জানতে পাবে।

ব্রজবাবু তেমনি স্তব্ধ হইয়াই রহিলেন। সন্ধ্যা হয়। যাইবার সময় রেণু তাঁহাকে প্রণাম করিল, কিন্তু কিছু বলিল না। এই নীরবতার মন্ত্র সে-ও হয়তো তাহার পিতার কাছেই শিখিয়াছে।

সারদাকে সঙ্গে লইয়া সবিতা বাহিরে আসিলেন। গাড়িতে উঠিয়াই চোখে পড়িল রাখাল তারককে লইয়া দ্রুতপদে এইদিকেই আসিতেছে। তারক বলিল, নতুন-মা, একবার নেমে দাঁড়াতে হবে যে, আমি প্রণাম করবো।

কথা কহা কঠিন, সবিতা ইঙ্গিতে উভয়কে গাড়িতে উঠিতে বলিয়া কোনমতে শুধু বলিলেন, এসো বাবা, আমার সঙ্গে তোমার বাড়ি চলো।

এগার

এক সপ্তাহ পূর্বে রাখাল আসিয়া বলিয়াছিল, নতুন-মা, সতেরো নম্বর বাড়িতে আপনি ত যাবেন না—আজ সন্ধ্যাবেলায় যদি আমার বাসায় একবার পায়ের ধুলো দেন।

কেন রাজু?

কাকাবাবুর জন্যে কিছু ফল-মূল কিনে এনেচি—ইচ্ছে তাঁকে একটু জল খাওয়াই—তিনি রাজী হয়েছেন আসতে।

কিন্তু আমাকে কি তিনি ডেকেছেন?

তিনি না ডাকুন আমি ত ডাকচি মা। কাল তাঁরা চলে যাবেন দেশে, বলেছেন গুছিয়ে-গাছিয়ে তাঁদের ট্রেনে তুলে দিতে।

সবিতা জানিতেন, ব্রজবাবু কোথাও কিছু খান না, তাঁহাকে সম্মত করাইতে রাখালকে অনেক চেষ্টা করিতে হইয়াছে,—বোধ হয় ভাবিয়াছে এ-কৌশলেও যদি আবার দুজনের দেখা হয়। রাখালের আবেদনের উত্তরে সবিতাকে সেদিন অনেক চিন্তা করিতে হইয়াছিল, স্নেহার্দ্র-চক্ষে তাহার প্রতি বহুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিয়াছিলেন, না বাবা, আমি যাবো না। আমাকে দেখে তিনি শুধু দুঃখই পান, আর দুঃখ দিতে আমি চাইনে।

আবার এক সপ্তাহ গত হইয়াছে। রাখালের মুখে খবর মিলিয়াছে, ব্রজবাবু মেয়ে লইয়া দেশে চলিয়া গেছেন। তাঁহার এ পক্ষের স্ত্রী-কন্যা রহিল কলিকাতায় ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে। রাখাল বলিয়াছে তাঁহাদের কোন শোক নাই, কারণ অর্থ-কষ্ট নাই। বাড়িভাড়ার আয়ে দিন ভালোই কাটিবে। অলঙ্কারের পুঁজি ত রহিলই।

সন্ধ্যার পরে একাকী বসিয়া সবিতা এই কথাগুলাই ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল, বারো বৎসরব্যাপী প্রতিদিনের সম্বন্ধ, অথচ কত শীঘ্র কত সহজেই

না ঘুচিয়া যায়। তাহার নিজের কপাল যেদিন ভাঙ্গে সেদিন সকালেও সে জানিত না, রাত্রিটাও কাটিবে না, সমস্ত ছাড়িয়া তাহাকে পথে বাহির হইতে হইবে। একান্ত দুঃস্বপ্নেও সে কি কল্পনা করিতে পারিত এতবড় ক্ষতি কাহারও সহে? তবু সহিল ত! আবার সহিল তাহারই। বারো বছর কাটিয়া গেল আজও সে তেমনি বাঁচিয়া আছে—তেমনিই দিনের পর দিন অবাধে বহিয়া গেল, কোথাও আটক খাইয়া বাধিয়া রহিল না।

এ বিড়ম্বনা কেন যে ঘটিল সে আজও তাহার কারণ জানে না। যতই ভাবিয়াছে, আত্মধিক্কারে জ্বলিয়া পুড়িয়া যতবার নিজের বিচার নিজে করিতে গেছে ততবারই মনে হইয়াছে ইহার অর্থ নাই—হেতু নাই—ইহার মূল অনুসন্ধান করিতে যাওয়া বৃথা। কিংবা, হয়তো এমনিই জগৎ—অঘটন এমনি অকারণে ঘটিয়াই জীবন-স্রোত আর একদিকে প্রবাহিত হইয়া যায়। মানুষের মতি, মানুষের বুদ্ধি কোথায় অন্ধ হইয়া মরে, নালিশ করিতে গিয়া আসামীর তল্লাশ মিলে না।

এদিকে রমণীবাবুও আর আসেন না। তিনি আসুন এ ইচ্ছা সবিতা করে না, কিন্তু বিস্মিত হইয়া ভাবে, নিষেধ করামাত্রই কি সকল সম্বন্ধ সত্যই শেষ হইয়া গেল! নিরবচ্ছিন্ন একত্র-বাসের বারোটা বৎসর কোন চিহ্নই কোথাও অবশিষ্ট রাখিল না—নিঃশেষে মুছিয়া দিল!

হয়তো, এমনিই জগৎ!

জগৎ এমনিই—কিন্তু এখানে আছে শুধুই কি অপচয়? উপচয় কোথাও নাই? কেবলই ক্ষতি? তবে, কেন কাছে আসিয়া পড়িল সারদা? তাহার মেয়ের মতো, মায়ের মতো। বাড়িতে অনেকগুলি ভাড়াটের মাঝে সেও ছিল একজন। শুধু নাম ছিল জানা, মুখ ছিল চেনা। কখনো দেখা হইয়াছে সিঁড়িতে, কখনো উঠানে, কখনো বা চলন-পথে। সসঙ্কোচে সরিয়া গেছে, চোখে চোখে চাহিতে সাহস করে নাই। অকস্মাৎ কি ব্যাপার ঘটিল, কে দিল তাহার বাসা বাঁধিয়া

সবিতার হৃদয়ের অন্তস্তলে! কিন্তু এ-ই কি চিরস্থায়ী? কে জানে কবে সে আবার ঘর ভাঙ্গিয়া এমনি সহসা অদৃশ্য হইবে।

আরও একজন আসিয়াছেন তিনি বিমলবাবু। মৃদুভাষী ধীর-প্রকৃতির লোক, স্বল্পক্ষণের জন্য আসিয়া প্রত্যহ খবর নিয়া যান কোথায় কি প্রয়োজন। হিতাকাঙ্ক্ষার আতিশয্যে উপদেশ দেওয়ার ঘটা নাই, বন্ধুতার আড়ম্বরে বসিয়া গল্প করার আগ্রহ নাই, কৌতূহলের কটুতায় পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রশ্ন করার প্রবৃত্তি নাই— দুই-চারিটা সাধারণ কথাবার্তার পরেই প্রস্থান করেন। সময় যেন তাঁহার বাঁধা-ধরা। নিয়ম ও সংযমের শাসন যেন এই মানুষটির সকল কাজে সকল ব্যবহারে বড় মর্যাদা দিয়া রাখিয়াছে। তবু তাঁহার চোখের দৃষ্টিকে সবিতা ভয় করে। ক্ষুধার্ত শ্বাপদের দৃষ্টি সে নয়, সে দৃষ্টি ভদ্র মানুষের—তাই ভয়। সে চোখে আছে আর্তের মিনতি, নাই উন্মাদ ব্যভিচার—শঙ্কা শুধু তার এই কারণে। পাছে অতর্কিতে পরাভব আসে কখন এই পথে।

তিনি আসিলে আলাপ হয় দুজনের এইমতো—

পুবের ঢাকা বারান্দায় একখানা বেতের চৌকি টানিয়া লইয়া বিমলবাবু বসিয়া বলেন, কেমন আছেন আজ?

সবিতা বলে, ভালই ত আছি।

কিন্তু ভালো ত দেখাচ্চে না? যেন শুক্‌নো-শুক্‌নো।

কৈ না।

না বললে শুনবো কেন? খাওয়া-দাওয়ায় কখনো যত্ন নিচ্চেন না। অবহেলা করলে শরীর থাকবে কেন—দু'দিনেই ভেঙ্গে পড়বে যে।

না ভাঙ্গবে না, শরীর আমার খুব মজবুত।

বিমলবাবু উত্তরে অল্প হাসিয়া বলেন, শরীরটা মজবুত হয়েই যেন বালাই হয়ে উঠেচে। এটাকে ভেঙ্গে ফেলাই এখন দরকার—না? সত্যি কিনা বলুন ত?

সবিতা কষ্টে অশ্রু-সংবরণ করিয়া চুপ করিয়া থাকে।

বিমলবাবু বলেন, গাড়িটা পড়ে রয়েছে, মিছিমিছি ড্রাইভারের মাইনে দিচ্চেন, বিকেলের দিকে একটু বেড়াতে যান না কেন?

বেড়াতে আমি ত কোনকালেই যাইনে বিমলবাবু।

শুনিয়া বিমলবাবু পুনরায় একটু হাসিয়া বলেন,তা বটে। বিনা কাজে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যেস আমারও নেই। আজ রাখালবাবু এসেছিলেন?

না।

কালও আসেন নি ত?

না, চার-পাঁচদিন তাকে দেখিনি। হয়তো কোন বাজে কাজে ব্যস্ত আছে।

বাজে কাজে? ঐ তাঁর স্বভাব, না?

হাঁ, ঐ ওর স্বভাব। বিনা স্বার্থে পরের বেগার খাটতে ওর জোড়া নেই।

বিমলবাবু অন্যমনে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকেন। দূরে সারদাকে দেখা যায়, তিনি হাত নাড়িয়া কাছে ডাকেন, বলেন, কৈ, আজ আমাকে জল দিলে না মা? তোমার হাতের জল আর পান না খেলে আমার তৃপ্তি হয় না।

সারদা জল ও পান আনিয়া দেয়। নিঃশেষ করিয়া এক গ্লাস জল খাইয়া পান মুখে দিয়া বিমলবাবু উঠিয়া দাঁড়ান, বলেন, আজ তা হলে আসি।

সবিতা নিজেও উঠিয়া দাঁড়ায়, নমস্কার করিয়া বলে, আসুন।

দিন-তিনেক পরে এমনিধারা আলাপের পরে বিমলবাবু উঠিবার উপক্রম করিতেই সবিতা কহিল, আজ আপনার কাজের একটু আমি ক্ষতি করবো। এখুনি যেতে পাবেন না, বসতে হবে।

বিমলবাবু বসিয়া বলিলেন, একটু বসলে আমার কাজের ক্ষতি হয়, এ আপনাকে কে বললে?

সবিতা কহিল, কেউ বলেনি, এ আমার অনুমান। আপনার কত কাজ—মিছে সময় নষ্ট হয় ত?

বিমলবাবু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, তা জানিনে; কিন্তু এইজন্যেই কি কখনো বসতে বলেন না? সত্যি বলুন ত?

এ কথা সত্য নয়, কিন্তু এই লইয়া সবিতা বাদানুবাদ করিল না, বলিল, রমণীবাবুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়?

হাঁ, প্রায়ই হয়।

তিনি আর এখানে আসেন না—আপনি জানেন?

জানি বৈ কি।

আর কি তিনি এ-বাড়িতে আসবেন না।

সে-কথা জানিনে। বোধ হয় আপনি ডেকে পাঠালেই আসতে পারেন।

সবিতা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, আজ সকালের ডাকে একটা দলিল এসে পৌঁছেচে। এই বাড়ি রমণীবাবু আমাকে বিক্রি-কবালায় রেজেস্ট্রি করে দিয়েছেন। আপনি জানেন?

জানি।

কিন্তু দেবার ইচ্ছেই যদি ছিল, সোজা দানপত্র না করে বিক্রি করার ছলনা কেন? দাম ত আমি দিইনি।

কিন্তু দানপত্র জিনিসটা ভালো না।

সবিতা বলিল, সে আমি জানি বিমলবাবু! আমার স্বামী ছিলেন বিষয়ী লোক, তাঁর সকল কাজেই সেদিনে আমার ডাক পড়তো। এ আমার অজানা নয় যে, আমাকে দান করার কারণ দেখাতে দলিলে এমন সব কথা লিখতে হতো, যা কোন নারীর পক্ষেই গৌরবের নয়। তবু বলি, এ মিথ্যের চেয়ে সেই ছিল ভালো।

ইতিপূর্বে এরূপ হেতুও ঘটে নাই, এমন করিয়া সবিতা কথাও বলে নাই। বিমলবাবু মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, ব্যাপারটা একেবারেই যে মিথ্যে তা-ও নয় নতুন-বৌ।

নতুন-বৌ সম্বোধনটা নূতন। সবিতার মুখ দেখিয়া মনে হইল না সে খুশী হইল, কিন্তু, কণ্ঠস্বরের সহজতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই বলিল, ঠিক এই জিনিসটি আমি সন্দেহ করেছিলুম বিমলবাবু। দাম আপনি দিয়েছেন, কিন্তু কেন দিলেন? তাঁর দান নেওয়ার তবু একটা সান্ত্বনা ছিল, কিন্তু আপনার দেওয়া ত নিছক ভিক্ষে। এ আমি কিসের জন্যে নিতে যাবো বলুন?

বিমলবাবু নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিলেন।

সবিতা কহিল, উত্তর না দিলে দলিল ফিরিয়ে দিয়ে আমি চলে যাবো বিমলবাবু।

এবার বিমলবাবু মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, এই ভয়েই দাম দিয়েছি, পাছে আপনি কোথাও চলে যান। না দিয়ে থাকতে পারিনি বলেই বাড়িটা আপনার কিনে রেখেচি।

টাকা তিনি নিলেন?

হাঁ, ভেতরে ভেতরে রমণীবাবুর বড় অভাব হয়েছিল। আর যেন পেরে উঠছিলেন না।

সবিতা কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, আমারও সন্দেহ হতো, কিন্তু এতটা ভাবিনি। আবার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, শুনেচি আপনার অনেক টাকা। এ ক'টা টাকা হয়তো কিছুই নয়, তবু আসল কথাই যে বাকী রয়ে গেল বিমলবাবু। দিতে আপনি পারেন, কিন্তু আমি নেবো কি বলে?—না, সে হবে না—বার বার চুপ করে জবাব এড়িয়ে গেলে আমি শুনবো না। বলুন।

বিমলবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, একজন অকৃত্রিম বন্ধুর উপহার বলেও ত নিতে পারেন।

সবিতা তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, নিলে কৈফিয়তের অভাব হয় না সে আমি জানি। আপনি যে আমার বন্ধু নয় তাও বলিনে, কিন্তু সে কথা যাক। এখানে আর কেউ নেই, শুধু আপনি আর

আমি।আমাকে বলতে সঙ্কোচ হয়, এ অধিকার পুরুষের কাছে আমার আর নেই—বলুন ত এই কি সত্যি? এই কি আপনার মনের কথা?

বিমলবাবু মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, তার পরে বলিলেন, মনের কথা আপনাকে জানাবো কেন? জানিয়ে ত লাভ নেই।

লাভ নেই তা-ও জানেন?

হ্যাঁ, তা-ও জানি।

সবিতা নিঃশ্বাস চাপিয়া ফেলিল। এই স্বল্পভাষী শান্ত মানুষটির প্রতিদিনের আচরণ মনে করিয়া তাহার চোখে জল আসিতে চাহিল, তাহাও সংবরণ করিয়া কহিল, আমার জীবনের ইতিহাস জানেন বিমলবাবু?

না, জানিনে। শুধু যা ঘটেছে—যা অনেকে জানে—আমিও কেবল সেইটুকুই জানি নতুন-বৌ, তার বেশী নয়।

কথাটা শুনিয়া সবিতা যেন চমকিয়া উঠিল—যা ঘটেছে সে কি তবে আমার জীবনের ইতিহাস নয় বিমলবাবু? ও দুটো কি একেবারে আলাদা? বলুন ত সত্যি করে?

তাহার প্রশ্নের আকুলতায় বিমলবাবু দ্বিধায় পড়িলেন, কিন্তু তখনি নিঃসঙ্কোচে বলিলেন, হাঁ, ও দুটো এক নয় নতুন-বৌ। অন্ততঃ নিজের জীবনের মধ্যে দিয়ে এই কথাই আজ অসংশয়ে জানতে পেরেছি ও-দুটো এক নয়।

ইহার অর্থটা যদিচ স্পষ্ট হইল না, তথাপি কথাটা সবিতাকে অন্তরে গভীর আঘাত করিল। নীরবে মনে মনে বহুক্ষণ আন্দোলন করিয়া শেষে বলিল, শুনেছেন ত আমি স্বামী ত্যাগ করে রমণীবাবুর কাছে এসেছিলুম,—আবার সেদিন তাঁকেও পরিত্যাগ করেছি। আমি ত ভালো মেয়ে নই—আবার একদিন অন্য পুরুষ গ্রহণ করতে পারি, এ কথা কি আপনার মনে আসে না?

বিমলবাবু বলিলেন, না। যদি-বা আসতে চেয়েছে তখনি সরিয়ে দিয়েছি।

কেন?

শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, এ হলো ছেলেদের প্রশ্ন। ও এই করেছে, এই করেছে, অতএব ওর এ-ই করা চাই, এ জবাব পাবেন আপনি তাদেরি পড়ার বইয়ে। আমি তার চেয়ে বেশী পড়েছি নতুন-বৌ।

পড়ালে কে?

সে ত একজন নয়। ক্লাসে প্রহরে প্রহরে মাস্টার বদল হয়েছে, তাঁদের কাউকে বা মনে আছে, কাউকে নেই, কিন্তু হেডমাস্টার যিনি, আড়ালে থেকে এঁদের যিনি নিযুক্ত করেছিলেন তাঁকে ত দেখিনি, কি করে আপনার কাছে তাঁর নাম করবো বলুন?

সবিতা ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিল, আপনি বোধ হয় খুব ধার্মিক লোক, না বিমলবাবু?

বিমলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ধার্মিক লোক আপনি কাকে বলেন? আপনার স্বামীর মতো?

সবিতা চকিত হইয়া প্রশ্ন করিল, তাঁকে কি চেনেন? তাঁর সঙ্গে জানাশুনো আছে নাকি?

বিমলবাবু তাহার উদ্বেগ লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু পূর্বের মতোই শান্তস্বরে বলিলেন, হাঁ চিনি। একদিন কোনমতে কৌতূহল দমন করতে পারলুম না, গেলুম তাঁর কাছে। অনেক চেষ্টায় দেখা মিললো, কথাবার্তাও অনেক হলো—না নতুন-বৌ, ধর্মকে যে-ভাবে তিনি নিয়েছেন আমি তা নিইনি, যে-ভাবে বুঝেছেন আমি তা বুঝিনি, ওখানে আমাদের মিল নেই। ধার্মিক লোক আমি নয়।

আবেগ ও উত্তেজনায় সবিতার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। এ কথা বুঝিতে তাহার বাকী নাই, সমস্ত কৌতূহলের মূল কারণ সে নিজে। থামিতে পারিল না, জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, ওখানে মিল না থাক, কোথাও কি আপনাদের মিল নেই? দুজনের স্বভাব কি সম্পূর্ণ আলাদা?

বিমলবাবু বলিলেন, এ উত্তর আপনাকে দেবো না, অন্ততঃ দেবার এখনো সময় আসেনি।

অন্ততঃ বলুন এ কথাও কি তখন মনে আসেনি এ-মানুষটিকে কেউ ছেড়ে চলে গেল কি করে?

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, কেউ মানে আপনি ত? কিন্তু ছেড়ে চলে ত আপনি যাননি। সবাই মিলে বাধ্য করেছিল আপনাকে চলে যেতে।

এ-ও শুনেছেন?

শুনেছি বৈ কি।

সমস্তই?

সমস্তই শুনেচি।

সবিতার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, কহিল, তাদের দোষ আমি দিইনে, তারা ভালোই করেছিল। স্বামীর সংসার অপবিত্র না করে আমার আপনিই চলে যাওয়া উচিত ছিল। এই বলিয়া সে আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিল। একটু পরে বলিল, কিন্তু এত জেনেও আমাকে ভালোবাসলেন কি করে বলুন তো?

ভালোবাসি এ কথা ত আজো বলিনি নতুন-বৌ।

না, বলেন নি বলেই ত এ কথা এমন সত্যি করে জানতে পেরেচি বিমলবাবু। কিন্তু, মনে ভাবি সংসারে যে-লোক এত দেখেচে, আমার সব কথাই যে শুনেচে, সে আমাকে ভালোবাসলে কি বলে? বয়স হয়েছে, রূপ আর নেই—বাকী যেটুকু আছে তাও দু'দিনে শেষ হবে—তাকে ভালোবাসতে পারলে মানুষে কি ভেবে?

বিমলবাবু তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, ভালোবেসেই যদি থাকি নতুন-বৌ, সে হয়তো সংসারে অনেক দেখেচি বলেই সম্ভব হয়েছে। বইয়ে পড়া পরের উপদেশ মেনে চললে হয়তো পারতুম না। কিন্তু সে যে রূপ-যৌবনের লোভে নয়, এ কথা যদি সত্যিই বুঝে থাকেন আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

সবিতা মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ, এ কথা আমি সত্যিই বুঝেচি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমাকে পেয়ে আপনার লাভ কি হবে? কি করবেন আমাকে নিয়ে?

বিমলবাবু উত্তর দিলেন না, শুধু নীরবে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমশঃ সে-দৃষ্টি যেন ব্যথায় ভরিয়া আসিল।

সবিতা অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, এমনি করে কি শুধু চেয়েই থাকবেন বিমলবাবু, জবাব দেবেন না আমার?

জবাব নেই নতুন-বৌ। শুধু জানি আপনাকে আমি পাবো না—পাবার পথ নেই আমার।

কেন নেই? কি করে বুঝলেন সে কথা?

বুঝেচি অনেক দুঃখ পেয়ে। আমিও নিষ্কলঙ্ক নই নতুন-বৌ। একদিন অনেক মেয়েকেই আমি জেনেছিলুম। সেদিন ঐশ্বর্যের জোরে এনেছিলুম তাদের ছোট করে—তারা নিজেরাও হয়ে গেল ছোট, আমাকেও করে দিলে তাই। তারা আর নেই—কোথায় কে-যে ভেসে গেলো আজ খবরও জানিনে।

একটু থামিয়া বলিলেন, তখন এ-খেলায় নামতে আমার বাধেনি, কিন্তু আজ বাধে পদে পদে।

সবিতা শিহরিয়া প্রশ্ন করিল, শুধুই ঐশ্বর্য দিয়ে ভুলিয়েছিলেন তাদের? কাউকে ভালোবাসেন নি?

বিমলবাবু বলিলেন, বেসেছিলুম বৈ কি। একজন আপনার মতোই গৃহ ছেড়ে কাছে এসেছিল, কিন্তু খেলা ভাঙলো—তাকে রাখতে পারলুম না। দোষ তাকে দিইনে, কিন্তু আজ আর আমার বুঝতে বাকী নেই, ভালোবাসার ধনকে ছোট করে ধরে রাখা যায় না—তাকে হারাতেই হয়। সেদিন রমণীবাবুকেও ত এমনি হারাতে দেখলুম।

সবিতা প্রশ্ন করিল,—এই কি আপনার ভয়?

বিমলবাবু বলিলেন, ভয় নয় নতুন-বৌ—এখন এই আমার ব্রত, এর থেকে বিচ্যুত না হই এই আমার সাধনা। আপনার মেয়েকে দেখেচি, আপনার স্বামীকে দেখে এসেচি। কি করে সমস্ত দিয়ে ঋণ শুধে তিনি চলে গেছেন তাও জেনেছি। শুনতে আমার বাকী কিছু নেই, এর পরে আপনাকে পাবো আমি কি দিয়ে? দোর যে বন্ধ। জানি, ছোট করে আপনাকে আমি কোনদিন নিতে পারবো না, আবার তার চেয়েও বেশী জানি যে, ছোট না করেও আপনাকে পাবার আমার এতটুকু পথ খোলা নেই। তাই ত বলেছিলুম নতুন-বৌ, নিন আমাকে আপনার অকৃত্রিম বন্ধু বলে। এই বাড়িটা সেই বন্ধুর দেওয়া উপহার। এ আপনাকে ছোট করার কৌশল নয়।

সবিতা নতমুখে নীরবে বসিয়া রহিল, কত কথাই যে তাহার মনের মধ্যে ভাসিয়া গেল তাহার নির্দেশ নাই, শেষে মুখ তুলিয়া কহিল, এ বন্ধুত্ব কতদিন স্থির থাকবে বিমলবাবু? এ মিথ্যের আবরণ টিকবে কেন? নর-নারীর মূল সম্বন্ধে একদিন যে আমাদের টেনে নামাবেই। সে থামাবে কে?

বিমলবাবু বলিলেন, আমি থামাবো নতুন-বৌ। আপনার অপেক্ষা করে থাকবো, কিন্তু মন ভোলাবার আয়োজন করবো না। যদি কখনো নিজের পরিচয় পান, আমার মতো দু'চোখ চেয়ে দৃষ্টি যদি কখনো বদলায়, কাছে আমাকে ডাকবেন—বেঁচে যদি থাকি ছুটে আসবো। ছোট করে নেবার জন্যে নয়—আসবো মাথায় তুলে নিতে।

সবিতার চোখ ছলছল করিতে লাগিল, কহিল, আপন পরিচয় পেতে আর বাকি নেই বিমলবাবু, চোখের এ-দৃষ্টি আর ইহজীবনে বদলাবে না। শুধু আশীর্বাদ করুন, যে-দুঃখ নিজে ডেকে এনেচি তা যেন সইতে পারি।

বিমলবাবুর চোখও সজল হইয়া উঠিল, বলিলেন, দুঃখ কে দেয়, কোথা দিয়ে সে আসে আমি আজও জানিনে। তাই তোমার অপরাধের বিচার করতে

আমি বসবো না, শুধু প্রার্থনা করবো, যেমন করেই এসে থাক এ দুঃখ যেন তোমার চিরস্থায়ী না হয়।

কিন্তু চিরস্থায়ীই ত হয়ে রইলো।

তাও জানিনে নতুন-বৌ। আমার আশা, সংসারে আজো তোমার জানতে কিছু বাকী আছে, আজো তোমার সকল দেখাই এখানে শেষ হয়ে যায়নি। আশীর্বাদ তোমাকে যদি করতেই হয়, এই আশীর্বাদ করি সেদিন যেন তুমি সহজেই এর একটা কূল দেখতে পাও।

সবিতা উত্তর দিল না, আবার দুজনের বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল। মুখ যখন সে তুলিল তখন উজ্জ্বল দীপালোকে স্পষ্ট দেখা গেল তাহার চোখের পাতা দুটি ভিজিয়া ভারী হইয়া উঠিয়াছে; মৃদুকণ্ঠে কহিল, তারক বর্ধমানের কোন একটা গ্রামে মাস্টারি করে, সে আমাকে ডেকেছে। যাবো দিনকতক তার কাছে?

যাও।

তুমি কি এখন কিছুদিন কলকাতাতেই থাকবে?

থাকতেই হবে। এখানে একটা নতুন আপিস খুলেচি, তার অনেক কাজ বাকী।

সবিতা একটুখানি হাসিয়া বলিল, টাকা ত অনেক জমালে—আর কি করবে?

প্রশ্ন শুনিয়া বিমলবাবুও হাসিলেন, বলিলেন, জমাই নি, ওগুলো আপনি জমে উঠেছে নতুন-বৌ, ঠেকাতে পারিনি বলে। কি করবো জানিনে, ভেবেচি, সময় হলে একজনের কাছে শিখে নেবো তার প্রয়োজন।

সবিতা উঠিয়া গিয়া পাশের জানালাটা খুলিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিল, বলিল,—এ বাড়িটায় আর আমার দরকার ছিল না—ভেবেছিলুম ভালোই হলো যে গেলো, একটা ঝঞ্ঝাট মিটলো; কিন্তু তুমি তা হতে দিলে না। ভাড়াটেরা রইলো এদের দেখো।

দেখবো।

আর একটি অনুরোধ করবো, রাখবে?

কি অনুরোধ নতুন-বৌ?

আমার মেয়ে, আমার স্বামী রইলেন বনবাসে। যদি সময় পাও তাঁদের একটু খোঁজ নিও।

বিমলবাবু হাসিমুখে একটুখানি ঘাড় নাড়িলেন, কিছুই বলিলেন না। ইহার কি যে অর্থ সবিতা ঠিক বুঝিল না, কিন্তু বুকের মধ্যে যেন আনন্দের ঝড় বহিয়া গেল। হাত দুটি এক করিয়া নীরবে কপালে ঠেকাইল, সে স্বামীর উদ্দেশে, না বিমলবাবুকে, বোধ করি নিজেও জানিল না। একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া, তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, আমার স্বামীর কথা একদিন তোমাকে নিজের মুখে শোনাবো—সে শুধু আমিই জানি, আর কেউ না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমাকে, আমি বাপের বাড়িতে যখন ছোট ছিলুম তখন কেন আসোনি বলো ত?

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, তার কারণ আমাকে আজকে যিনি পাঠিয়েছেন সেদিন তাঁর খেয়াল ছিল না। সেই ভুলের মাশুল যোগাতে আমাদের প্রাণান্ত হয়, কিন্তু এমনি করেই বোধ করি সে-বুড়োর বিচিত্র খেলার রস জমে ওঠে। কখনো দেখা পেলে দুজনে নালিশ রুজু করে দেবো। কি বলো?

দূরে সারদাকে বার-কয়েক যাতায়াত করিতে দেখিয়া কাছে ডাকিয়া বলিলেন, তোমার মায়ের খাবার দেরি হয়ে গেছে—না মা? উঠতে হবে?

সারদা ভারী অপ্রতিভ হইয়া বার বার প্রতিবাদ করিয়া বলিতে লাগিল, না কখ্খনো না! দেরি হয়ে গেছে আপনার—আপনাকে আজ খেয়ে যেতে হবে।

বিমলবাবু হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন,—তোমার এই কথাটিই কেবল রাখতে পারবো না মা, আমাকে না খেয়েই যেতে হবে।

চললুম।'

সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল, কিন্তু সারদার অনুরোধে যোগ দিল না।

বিমলবাবু প্রত্যহের মতো আজও প্রতি-নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেলেন।

বার

রমণীবাবু আর আসেন না, হয়তো ছাড়াছাড়ি হইল।দুজনের মাঝখানে অকস্মাৎ কি যে ঘটিল ভাড়াটেরা ভাবিয়া পায় না। আড়াল হইতে চাহিয়া দেখে সবিতার শান্ত বিষণ্ণ মুখ—পূর্বের তুলনায় কত-না প্রভেদ। জ্যৈষ্ঠের শূন্যময় আকাশ আষাঢ়ের সজল মেঘভারে যেন নত হইয়া তাহাদের কাছে আসিয়াছে। তেমনি লতা-পাতায়,তৃণ-শস্পে,গাছে গাছে লাগিয়াছে অশ্রু-বাষ্পের সকরুণ স্নিগ্ধতা, তেমনি জলে-স্থলে, গগনে-পবনে সর্বত্র দেখা দিয়াছে তাঁহার গোপন বেদনার স্তব্ধ ইঙ্গিত। কথায়, আচরণে উগ্রতা ছিল না তাঁর কোনদিনই, তথাপি কিসের একটা অজানিত ব্যবধানে এতদিন কেবলি রাখিত তাঁকে দূরে দূরে। এখন সেই দূরত্ব মুছিয়া গিয়া তাঁহাকে টানিয়া আনিয়াছে সকলের বুকের কাছে। বাড়ির মেয়েরা এই কথাটাই বলিতেছিল সেদিন সারদাকে। ভাবিয়াছে, বুঝি বিচ্ছেদের দুঃখই তাঁহাকে এমন করিয়া বদলাইয়াছে।

রমণীবাবু মোটের উপর ছিলেন ভালোমানুষ লোক, থাকিতেন পরের মতো, কাহারো ভালোতেও না, মন্দতেও না। মাঝে মাঝে ভাড়া বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করা ভিন্ন অন্য অসদাচরণ করেন নাই। তাঁহার চলিয়া যাওয়াটা লাগিয়াছে অনেককেই, তবু ভাবে সেই যাওয়ার কলঙ্কিত-পথে নতুন-মার সকল কালি যদি এতদিনে ধুইয়া যায় ত শোকের পরিবর্তে তাহারা উল্লাসবোধই করিবে। এ-যেন তাহাদের গ্লানি ঘুচিয়া নিজেরাই নির্মল হইয়া বাঁচিল। কেবল একটা ভয় ছিল তিনি নিজে না থাকিলে তাহারাই বা দাঁড়াইবে কোথায়? আজ সারদা এই বিষয়েই তাহাদের নিশ্চিন্ত করিল। বলিল, পিসীমা, বাড়িটার একটা ব্যবস্থা হলো। তোমরা যেমন আছো তেমনি থাকো—তোমাদের কোথাও বাসা খুঁজতে হবে না, মা বলে দিলেন।

তবে বুঝি মা আর কোথাও যাবেন না সারদা?

যাবেন, কিন্তু আবার ফিরে আসবেন। বাড়ি ছেড়ে কোথাও বেশীদিন থাকবেন না বললেন।

আনন্দে পিসীমার চোখে জল আসিয়া পড়িল, সারদাকে আশীর্বাদ করিয়া তিনি এই সুসংবাদ অন্য সকলকে দিতে গেলেন।

প্রতিদিন বিমলবাবু বিদায় লইবার পরে সবিতা আসিয়া তাঁহার পূজার ঘরে প্রবেশ করে। পূর্বে তাহার আহ্নিক সারিতে বেশী সময় লাগিত না, কিন্তু এখন লাগে দু-তিন ঘণ্টা। কোনদিন বা রাত্রি দশটা বাজে, কোনদিন বা এগারোটা। এই সময়টায় সারদার ছুটি, সে নীচে নামিয়া নিজের গৃহকর্ম সারে। আজ ঘরে ঢুকিয়া দেখিল রাখাল বিছানায় বসিয়া প্রদীপের আলোকে তাহার খাতাখানা পড়িতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, কখন এলেন? তার পরে কুণ্ঠিত-স্বরে কহিল, না-জানি কত ভুলচুকই হয়েছে! না?

রাখাল মুখ তুলিয়া বলিল, হলেও ভুলচুক শুধরে নিতে পারবো, কিন্তু লেখাটা ত কিছুই এগোয় নি দেখচি।

না। সময় পাইনে যে।

পাও না কেন?

কি করে পাবো বলুন? মায়ের সব কাজ আমাকেই করতে হয় যে।

নতুন-মার দাসী-চাকরের অভাব নেই। তাঁকে বলো না কেন তোমারো সময়ের দরকার—তোমারো কাজ আছে। এ কিন্তু ভারী অন্যায় সারদা।

রাখালের কণ্ঠস্বরে তিরস্কারের আভাস ছিল, কিন্তু সারদার মুখ দেখিয়া মনে হইল না সে কিছুমাত্র লজ্জা পাইয়াছে। বলিল, আপনারই কি কম অন্যায় দেব্‌তা? ভিক্ষের দান ঢাকতে অকাজের বোঝা চাপিয়েছেন আমার ঘাড়ে। পরকে অকারণ পীড়ন করলে নিজের হয় জ্বর, ঘরের মধ্যে একলা পড়ে ভুগতে হয়, সেবা করার লোক জোটে না। এত রোগা দেখচি কেন বলুন ত?

রাখাল বলিল, রোগা নই, বেশ আছি। কিন্তু লেখাটা হঠাৎ অকাজ হয়ে উঠলো কিসে?

সারদা বলিল, অকাজ নয় ত কি! হলো জ্বর, তাও ঢাকতে হলো হয়নি বলে। এমনি দশা। ভালো, ওটা লিখেই না হয় দিলুম, কিন্তু কি কাজে আপনার লাগবে শুনি?

কাজে লাগবে না? তুমি বলো কি সারদা?

সারদা কহিল, এই বলচি যে, এ-সব কিচ্ছু কাজে লাগবে না। আর যদিই বা লাগে আমার কি? মরতে আমাকে আপনি দেননি, এখন বাঁচিয়ে রাখার গরজ আপনার। একছত্রও আর আমি লিখবো না।

রাখাল হাসিয়া বলিল, লিখবে না ত আমার ধার শোধ দেবে কি করে?

ধার শোধ দেবো না—ঋণী হয়েই থাকবো।

রাখালের ইচ্ছা করিল, তাহার হাতটা নিজের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলে, তাই থেকো, কিন্তু সাহস করিল না। বরঞ্চ, একটুখানি গম্ভীর হইয়াই বলিল, যেটুকু লিখেচো তার থেকে কি বুঝতে পারো না ও-গুলোর সত্যিই দরকার আছে?

সারদা বলিল, দরকার আছে শুধু আমাকে হয়রান করার—আর কিছু না। কেবল কতকগুলো রামায়ণ-মহাভারতের কথা—এখান-সেখান থেকে নেওয়া—ঠিক যেন যাত্রা-দলের বক্তৃতা। ও-সব কিসের জন্যে লিখতে যাবো?

তাহার কথা শুনিয়া রাখাল যতটা হইল বিস্ময়াপন্ন তার ঢের বেশী হইল বিপদাপন্ন। বস্তুতঃ লেখাগুলা তাই বটে। সে যাত্রার পালা রচনা করে, নকল করাইয়া অধিকারীদের দেয়, ইহাই তাহার আসল জীবিকা। কিন্তু উপহাসের ভয়ে বন্ধু-মহলে প্রকাশ করে না, বলে ছেলে পড়ায়। ছেলে পড়ায় না যে তাহা নয়, কিন্তু এ আয়ে তাহার ট্রামের মাশুলের সঙ্কুলান হয় না। তাহার ইচ্ছা নয় যে, উপার্জনের এই পন্থাটা কোথাও ধরা পড়ে—যেন এ বড় অগৌরবের, ভারী লজ্জার। তাহার এমন সন্দেহও জন্মিল, নিজেকে সারদা যতটা অশিক্ষিতা বলিয়া

প্রচার করিয়াছিল হয়তো তাহা সত্য নয়, হয়তো বা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কি জানি হয়তো বা তাহার চেয়েও—রাগে মনের ভিতরটা কেমন জ্বলিয়া উঠিল, কারণ, সে জানে তাহার পল্লবগ্রাহী বিদ্যা—যতটা জানে আইনস্টিনের রিলেটিভিটি ততটাই জানে সে সফোক্লিজের অ্যানটিগন অ্যাজাক্স। অন্ধকারে চলার মতো প্রতি পদক্ষেপেই তাহার ভয় পাছে গর্তে পা পড়ে। যাত্রার পালা লেখার লজ্জাটাও তাহার এই-জাতীয়। সারদার প্রশ্নের উত্তরে কথা খুঁজিয়া না পাইয়া বলিয়া উঠিল,—আগে ত তুমি ঢের ভালোমানুষ ছিলে সারদা, হঠাৎ এমন দুষ্টু হয়ে উঠলে কি করে?

সারদা হাসিয়া কহিল, দুষ্টু হয়ে উঠেচি?

ওঠোনি? ভালো, তোমার মতে দরকারী কাজটা কি শুনি?

বলচি। আগে আপনি বলুন ছ-সাতদিন আসেন নি কেন?

শরীরটা একটু খারাপ হয়েছিল।

মিছে কথা। এই বলিয়া সারদা তাহার মুখের প্রতি কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, হয়েছিল জ্বর এবং তা-ও খুব বেশী। এ-কে শরীর খারাপ বলে উড়িয়ে দিলে সে হয় মিথ্যে কথা। আপনার বুড়ো-ঝি, যাকে নানী বলে ডাকেন, সে-ও ছিল শয্যাগত। স্টোভ জ্বালিয়ে নিজেকে করতে হয়েচে সাগু-বার্লি তৈরি। শুনি আপনার বন্ধুবান্ধব আছে অনেক, তাদের কাউকে খবর দেননি কেন?

প্রশ্নটা রাখালের নতুন নয়—গত বছরেও প্রায় এমনি অবস্থাই ঘটিয়াছিল; কিন্তু সে চুপ করিয়া রহিল—এ কথা স্বীকার করিতে পারিল না যে, সংসারে বন্ধু-সংখ্যা যাহার অপরিমিত, দুঃখের দিনে ডাক দিবার মতো বন্ধুর তাহারি সবচেয়ে অভাব?

সারদা বলিল, তারা যাক, কিন্তু নতুন-মাকে খবর দিলেন না কেন?

প্রত্যুত্তরে রাখাল সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, নতুন-মা! নতুন-মা যাবেন আমার সেই পচা এঁদো-পড়া বাসায় সেবা করতে? তুমি কি যে বলো সারদা তার ঠিকানা নেই। কিন্তু আমার অসুখের সংবাদ তোমাকেই বা দিলে কে?

সারদা কহিল, যে-ই দিক, কিন্তু দুঃখ এই যে সময়ে দিলে না। শুনে নতুন-মা বললেন, রাজু আমার রেণুকে বাঁচালে দিনের বেলায় রেঁধে সকলের মুখে অন্ন যুগিয়ে, রাত্তিরে সারারাত জেগে সেবা করে, নিজের সমস্ত পুঁজি খুইয়ে ডাক্তার-বদ্যির ঋণ শুধে। আর ও যখন পড়লো অসুখে তখন আপনি গেল জ্বরের তেষ্টার জল কল থেকে আনতে, উনুন জ্বেলে আপনি করলে ক্ষিধের পথ্যি তৈরি, ও ওষুধ পেলে না আনবার লোক নেই বলে। কিন্তু আমাকে খবর দেবে কেন মা—আমাকে তার বিশ্বাস ত নেই। মেয়ের অসুখে পরের নাম করে এসেছিল যখন সাহায্য চাইতে—তাকে দিইনি ত। বলিতে বলিতে সারদার নিজের চোখেই জল উপচিয়া উঠিল, কহিল, কিন্তু সে না হয় নতুন-মা, আমি কি দোষ করেছিলাম দেব্‌তা? কেরানীগিরি করে আজও টাকা শোধ দিইনি, সেই রাগে নাকি?

রাখাল হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, এ চায়ের পেয়ালায় তুফান তুললে সারদা। তুচ্ছ ব্যাপারটাকে কি ঘোরালো করেই তুলচো। জ্বর কি কারো হয় না? দুদিনেই ত সেরে গেল।

সারদা বলিল, সেরে যে গেলো ভগবানের সে দয়া আমাদের ওপর,—আপনাকে না। আসলে আপনি ভারী খারাপ লোক। বিষ খেয়ে মরতে গেলুম, দিলেন না,—হাসপাতালে দিন-রাত লেগে রইলেন। ফিরে এসে যে না খেয়ে মরবো তাতেও বাদ সাধলেন। একদিকে ত এই, আবার অন্যদিকে অসুখের মধ্যে যে একটুখানি সেবা করবো তাও আপনার সইলো না। চিরকাল কি এমনি শত্রুতাই করবেন, নিষ্কৃতি দেবেন না? কি করেছিলুম আপনার? এ জন্মের ত দোষ দেখিনে, একি গতজন্মের দণ্ড নাকি?

রাখাল জবাব দিতে পারিল না, অবাক হইয়া ভাবিল এই মুখচোরা ঠাণ্ডা মেয়েটাকে হঠাৎ এমন প্রগল্‌ভ করিয়া দিল কিসে!

সারদা থামিল না। দিনের বেলায় কড়া আলোতে এত কথা এমন অজস্র নিঃসঙ্কোচে সে কিছুতেই বলিতে পারিত না, কিন্তু এ ছিল রাত্রিকাল—নিরালা গৃহের ছায়াচ্ছন্ন অভ্যন্তরে শুধু সে আর অন্য জন—আজ বুদ্ধি ছিল শিথিল তন্দ্রাতুর, তাই অন্তর্গূঢ় ভাবনা তাহার বাক্যের স্রোতঃপথে অবারিত হইয়া আসিল, হিতাহিতের তর্জনী শাসন ভ্রূক্ষেপ করিল না। বলিতে লাগিল, জানেন দেব্‌তা, জানি আমি, কেন আপনি আজো বিয়ে করেন নি। আসলে মেয়েদের ওপর আপনার ভারী ঘৃণা। কিন্তু এ-ও জানবেন যাদের আপনি এতকাল দেখেছেন, ফরমাস খেটেছেন, পিছু পিছু ঘুরেছেন, তারাই সমস্ত মেয়ে-জাতির নিরিখ নয়। জগতে অন্য মেয়েও আছে।

এবার রাখাল হাসিয়া ফেলিল, জিজ্ঞাসা করিল, আজ তোমার হলো কি বলো ত?

সত্যি আজ আমার ভারী রাগ হয়েচে।

কেন?

কেন! কিসের জন্য আমাকে অসুখের খবর দেননি বলুন?

দিলেই বা কি হতো? সেখানে অন্য কোন মেয়ে নেই,—একলা যেতে কি আমার সেবা করতে?

সারদা দৃপ্তচোখে কহিল, যেতুম না ত কি শুনে চুপ করে ঘরে বসে থাকতুম?

তোমার স্বামী বলতেন কি যখন ফিরে এসে শুনতেন এ কথা?

ফিরে আসবেন না তা আপনাকে অনেকবার বলেচি—আপনি বলবেন তুমি জানলে কি করে? তার জবাব এই যে, আমি জানবো না ত সংসারে জানবে কে? এই বলিয়া সারদা ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, এ ছাড়া আরো একটা

কথা আছে। একাকী আপনার সেবা করতে যাওয়াটাই হতো আমার দোষের, কিন্তু এ বাড়িতেই বা কার ভরসায় আমাকে তিনি একলা ফেলে গেছেন? এই যে আপনি আমার ঘরে এসে বসেন—যদি যেতে না দিই, ধরে রাখি, কে ঠেকাবে বলুন ত?

এ কি তামাশা! এমন কথা কোন মেয়ের মুখেই রাখাল কখনো শোনে নাই। বিশেষতঃ সারদা। গভীর লজ্জায় মুখ তাহার রাঙ্গা হইয়া উঠিল, কিন্তু প্রকাশ পাইলে সে লজ্জা বাড়িবে বৈ কমিবে না, তাই জোর করিয়া কোনমতে হাসির প্রয়াস করিয়া বলিল, একলা পেয়ে আমাকে ত অনেক কথাই বললে, কিন্তু সে থাকলে কি পারতে বলতে?

সারদা কহিল, বলার তখন ত দরকার হতো না। কিন্তু আজ এলে তাকে অন্য কথা বলতুম। বলতুম, যে সারদা তোমাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসতো,—সে কত যে সয়েচে তার সাক্ষী আছেন শুধু ভগবান—যাকে বিয়ের নাম করে এনে ফাঁকি দিলে, এঁটো-পাতের মতো যাকে স্বচ্ছন্দে ফেলে গেলে, ফেরবার পথ যার কোথাও খোলা রাখোনি, সে সারদা আর নেই, সে বিষ খেয়ে মরেছে। নিজের নয়,—তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। এ সারদা অন্য জন। তার পুনর্জন্মে তার ’পরে আর কারো দাবী নেই।

শুনিয়া রাখাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

সারদা বলিতে লাগিল, আপনার কি মনে নেই দেব্‌তা হাসপাতালে বিরক্ত হয়ে আপনি বার বার জিজ্ঞেসা করেচেন, তুমি কোথায় যেতে চাও; উত্তরে আমি বার বার কেঁদে বলেচি, আমার যাবার জায়গা কোথাও নেই। শুধু একটা স্থান ছিল—সেইখানেই চলেছিলুম—কিন্তু মাঝপথে সেই পথটাই দিলেন আপনি বন্ধ করে।

কিছুক্ষণ উভয়ের নিঃশব্দে কাটিল। রাখাল বলিল, জীবনবাবুকে চোখে দেখিনি, শুধু বাড়ির লোকের মুখে তাঁর নাম শুনেচি। তিনি কি তোমার স্বামী নন? সবই মিথ্যে?

হাঁ, সবই মিথ্যে। তিনি আমার স্বামী নন।

তবে কি তুমি বিধবা?

হাঁ, আমি বিধবা।

আবার কিছুকাল নীরবে কাটিল। সারদা জিজ্ঞাসা করিল, আমার কাহিনী শুনে কি আমার ওপর আপনার ঘৃণা জন্মালো?

রাখাল কহিল, না সারদা, আমি অতো অবুঝ নই। তোমার চেয়ে ঢের বেশী অপরাধ করেছিলেন নতুন-মা, আমি তাঁকেও ঘৃণা করিনি। কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই সে অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে চুপ করিল। তখনই বুঝিল, এ উল্লেখ অনধিকার-চর্চা, এ তাহার আপন অপমান। একি বিশ্রী কটু কথা মুখ দিয়া তাহার হঠাৎ বাহির হইয়া গেল!

সারদা বলিল, নতুন-মা আপনাকে মায়ের মতো মানুষ করেছিলেন—

রাখাল কহিল, হাঁ, তিনি আমার মা-ই ত। এই বলিয়া প্রসঙ্গটা সে তাড়াতাড়ি চাপা দিয়া কহিল, তোমার মা-বাপ আত্মীয়-স্বজন আছেন কিনা বলতে চাও না, অন্ততঃ তাঁদের কাছে যে যাবে না এ আমি নিশ্চয় বুঝেচি, কিন্তু কি এখন করবে?

সারদা বলিল, যা করচি তাই। নতুন-মার কাজ করবো।

কিন্তু এ কি তোমার চিরকাল ভালো লাগবে সারদা?

সারদা বলিল, দাসীবৃত্তি ত নয়—মায়ের সেবা। অন্ততঃ, বহুকাল ভালো লাগবে এ আমি জানি।

রাখাল বলিল, কিন্তু বহুকালের পরেও একটা কাল থাকে বাকি, তখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়, তাতে টাকার দরকার। নিছক সেবা করেই সে সমস্যার মীমাংসা হয় না।

সারদা বলিল, যত টাকারই দরকার হোক, আপনার কেরানীগিরি করতে আমি পারবো না। বরঞ্চ ছোট্ট একখানি চিঠি লিখে ফেলে রাখবো বিছানায়, কেউ একজন তা পড়ে টাকা লুকিয়ে রেখে যাবে আমার বালিশের নীচে। তাতেই আমার অভাব মিটবে।

রাখাল হাসিয়া বলিল, সে ত ভিক্ষে নেওয়া।

সারদাও হাসিল, বলিল, ভিক্ষেই নেবো। কেউ তা জানবে না—ঘুষ দিয়ে লোকে বলে না—আমার লজ্জা কিসের?

রাখালের আবার ইচ্ছা হইল হাত ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া আনে এবং এই ধৃষ্টতার জন্য শাস্তি দেয়। কিন্তু আবার সাহসে বাধিল,—সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

ঝি বাহির হইতে সাড়া দিয়া বলিল, দিদিমণি, মা ডাকচেন তোমাকে।

মার আহ্নিক কি শেষ হয়েচে?

হাঁ, হয়েছে; বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সারদা কহিল, আপনি যাবেন না মার সঙ্গে দেখা করতে?

রাখাল কহিল, তুমি যাও, আমি পরে যাবো।

পরে কেন? চলুন না দুজনে একসঙ্গে যাই। বলিয়া সে চাপা-হাসির একটা তরঙ্গ তুলিয়া দ্বার খুলিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

রাখাল চোখ বুজিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। মনে হইল ঘরখানি যে রসে, মাধুর্যে নিবিড় হইয়া উঠিল সজীব মানুষের হাতের মতো সে তাহাকে সকল অঙ্গে স্পর্শ করিয়াছে, কতদিনের পরিচিত এই সামান্য গৃহখানির আজ যেন আর রহস্যের অন্ত নাই।

তাহার দেহ-মনে আজ এ কিসের আকুলতা, কিসের স্পন্দন? বক্ষের নিগূঢ় অন্তস্তলে এ কে কথা কয়? কি বলে? স্বর অস্ফুটে কানে আসে, ভাষা বুঝা যায় না কেন? কত শত মেয়েকে সে চেনে, কতদিনের কত আনন্দোৎসব তাহাদের সাহচর্যে গল্পে-গানে হাসিতে-কৌতুকে অবসিত হইয়াছে, তাহার স্মৃতি আজো অবলুপ্ত হয় নাই,—মনের কোণে খুঁজিলে আজো দেখা মিলে, কিন্তু সারদার—এই একটিমাত্র মেয়ের মুখের কথায় যে-বিস্ময় আজ মূর্তিতে উদ্ভাসিয়া উঠিল, এ-জীবনের অভিজ্ঞতায় কোথায় তাহার তুলনা? এই কি নারীর প্রণয়ের রূপ? তাহার ত্রিশ বর্ষ বয়সে সে অজানার আজই কি প্রথম দেখা মিলিল? এরই কি জয়গানের অন্ত নাই? এরই কলঙ্ক গাহিয়া আজও কি শেষ করা গেল না?

কিন্তু ভুল নাই, ভুল নাই,—সারদার মুখের কথায় ভুল বুঝিবার অবকাশ নাই। এমন সুনিশ্চিত নিঃসংশয়ে যে আপনি আসিয়া কাছে দাঁড়াইল, তাহাকে না বলিয়া ফিরাইবে সে কিসের সঙ্কোচে, কোন্ বৃহত্তরের আশায়? কিন্তু তবু দ্বিধা জাগে, মন পিছু হটিতে চায়। সংস্কার কুণ্ঠা জানাইয়া বলে, সারদা বিধবা, সারদা নিন্দিতা, স্বৈরাচারের কলঙ্ক-প্রলেপে সে মলিন। বন্ধু-সমাজে স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিবে সে কোন্ দুঃসাহসে? আবার তখনি মনে পড়ে প্রথম দিনের কথা—সেই হাসপাতালে যাওয়া। মৃতকল্প নারীর পাংশু পাণ্ডুর মুখ, মরণের নীল ছায়া তাহার ওষ্ঠে, কপোলে, নিমীলিত চোখের পাতায় পাতায়—গাড়ির বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়া আসে পথের আলো—তার পরে যমে-মানুষে সে কি লড়াই! কি দুঃখে সেই প্রাণ ফিরিয়া পাওয়া! এ-সব কথা ভুলিবে রাখাল কি করিয়া? কি করিয়া ভুলিবে সে তাহারি হাতে সারদার সমস্ত সমর্পণ! সেই দু’চোখের জল মুছিয়া বলা—আর আমি মরবো না দেব্‌তা আপনার হুকুম না নিয়ে। সেদিন জবাবে রাখাল বলিয়াছিল—অঙ্গীকার মনে থাকে যেন চিরদিন।

সেই দাসী আসিয়া বলিল, রাজুবাবু, মা ডাকচেন আপনাকে।

আমাকে? চকিত হইয়া রাখাল উঠিয়া বসিল। হাত দিয়া দেখিল চোখের জল গড়াইয়া বালিশের অনেকখানি ভিজিয়া উঠিয়াছে, তাড়াতাড়ি সেটা উলটাইয়া রাখিয়া সে উপরে গিয়া নতুন-মার পায়ের ধূলা লইয়া অদূরে উপবেশন করিল। এতদিন না আসার কথা, তাহার অসুখের কথা, কিছুই নতুন-মা উল্লেখ করিলেন না, শুধু স্নেহার্দ্র স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, ভালো আছো বাবা?

রাখাল মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া বলিল, একটা মস্ত বড় অপরাধ হয়ে গেছে মা, আমাকে মার্জনা করতে হবে। কয়েকদিন জ্বরে ভুগলুম, আপনাকে খবর দিতে পারিনি।

নতুন-মা কোন উত্তর না দিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। রাখাল বলিতে লাগিল, ওটা ইচ্ছে করেও না, আপনাদের আঘাত দিতেও না। মনে পড়ে মা, একদিন যত জ্বালাতন আমি করেছি তত আপনার রেণুও না। তার পরে হঠাৎ একদিন পৃথিবী গেল বদলে—সংসারে এত ঝড়-বাদল যে তোলা ছিল সে তখনি শুধু টের পেলুম। ঠাকুরঘরে গিয়ে কেঁদে বলতুম, গোবিন্দ, আর ত সইতে পারিনে, আমাদের মাকে ফিরিয়ে এনে দাও। আমার প্রার্থনা এতদিনে ঠাকুর মঞ্জুর করেছেন। আমার সেই মাকেই করবো অসম্মান এমন কথা আপনি কি করে ভাবতে পারলেন মা?

এবার নতুন-মা আস্তে আস্তে বলিলেন, তবে কিসের অভিমানে খবর দাওনি বাবা? দরোয়ানকে পাঠিয়ে যখন খোঁজ নিতে গেলুম তখন কিছু করবারই আর পথ রাখোনি।

রাখাল সহাস্যে কহিল, সেটা শুধু ভুলের জন্যে। অভ্যাস ত নেই, দুঃখের দিনে মনেই পড়ে না মা, ত্রিসংসারে আমার কোথায় কেউ আছে।

নতুন-মা উত্তর দিলেন না—কেবল তাহার একটা হাত ধরিয়া আরো কাছে টানিয়া আনিয়া গভীর স্নেহে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিলেন।

সারদা আড়াল হইতে বোধ হয় শুনিতেছিল, সুমুখে আসিয়া বলিল, দেব্‌তাকে খেয়ে যেতে বলুন না মা, সেই ত বাসায় গিয়ে ওঁকে নিজেই রাঁধতে হবে।

নতুন-মা বলিলেন, আমি কেন সারদা, তুমি নিজেই ত বলতে পারো মা। তার পরে স্মিতহাস্যে কহিলেন, এই কথাটি ও প্রায় বলে রাজু। তোমাকে যে আপনি রাঁধতে হয় এ যেন ও সইতে পারে না—ওর বুকে বাজে। ওকে বাঁচিয়েছিলে একদিন এ কথা সারদা একটি দিন ভোলে না।

পলকের জন্য রাখাল লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল, তিনি বলিতে লাগিলেন, এমন স্ত্রীকে যে কি করে তার স্বামী ফেলে দিয়ে গেলো আমি তাই শুধু ভাবি। যত অঘটন কি বিধাতা মেয়েদের ভাগ্যেই লিখে দেন! এবং বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মুখ দিয়া দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

সারদা কহিল, এইবার ওঁকে একটি বিয়ে করতে বলুন মা। আপনার আদেশকে উনি কখনো না বলতে পারবেন না।

সবিতা কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু রাখাল তাড়াতাড়ি বাধা দিল। বলিল, তুমি আমাকে মোটে দু-চারদিন দেখচো, কিন্তু উনি করেচেন আমাকে মানুষ—আমার ধাত চেনেন। বেশ জানেন, ওর না আছে বাড়িঘর, না আছে আত্মীয়-স্বজন, না আছে উপার্জন করার শক্তি-সামর্থ্য। ও বড় অক্ষম, কোনমতে ছেলে পড়িয়ে দু'বেলা দুটো অন্নের উপায় করে। ওকে মেয়ে দেওয়া শুধু মেয়েটাকে জবাই করা। এমন অন্যায় আদেশ মা কখনো দেবেন না।

সারদা বলিল, কিন্তু, দিলে?

রাখাল বলিল, দিলে বুঝবো এ আমার নিয়তি।

ঠাকুর আসিয়া খবর দিল খাবার তৈরি হইয়াছে। রাখাল বুঝিল, এ আয়োজন সারদা উপরে আসিয়াই করিয়াছে।

বহুকালের পরে সবিতা তাহাকে খাওয়াইতে বসিলেন। বলিলেন, রাজু, তারক যেখানে চাকরি করে সে গ্রামটি নাকি একেবারে দামোদরের তীরে। আমাকে ধরেছে দিন-কয়েক গিয়ে তার ওখানে থাকি। স্থির করেচি যাবো।

প্রস্তাব করে সে চিঠি লিখেচে নাকি?

চিঠিতে নয়, দিন-দুয়েক ছুটি নিয়ে সে নিজে এসেছিল বলতে। বড় ভালো ছেলে। যেমন বিনয়ী তেমনি বিদ্বান। সংসারে ও উন্নতি করবেই।

রাখাল সবিস্ময় মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, তারক এসেছিলো কলকাতায়? কৈ আমি ত জানিনে!

সবিতা বলিলেন, জানো না? তবে বোধ করি দেখা করার সময় করতে পারেনি। শুধু দুটো দিনের ছুটি কিনা!

রাখাল আর কিছু বলিল না, মাথা হেঁট করিয়া অন্নের গ্রাস মাখিতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল অসুখের পূর্বের দিনই সে তারককে একখানা পত্র লিখিয়াছে; তাহাতে বলিয়াছে, ইদানীং শরীরটা কিছু মন্দ চলিতেছে, তাহার সাধ হয় দিন-কয়েকের ছুটি লইয়া পল্লীগ্রামে গিয়া বন্ধুর বাড়িতে কাটাইয়া আসে। সে চিঠির জবাব এখনো আসে নাই।

তের

সেদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে বাসায় ফিরিবার সময়ে সারদা সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিয়াছিল, ভারী অনুরোধ করিয়া বলিয়াছিল, আমার বড় ইচ্ছে আপনাকে একদিন নিজে রেঁধে খাওয়াই। খাবেন একদিন দেব্‌তা?

খাবো বৈ কি। যেদিন বলবে।

তবে পরশু। এমনি সময়ে। চুপি চুপি আমার ঘরে আসবেন, চুপি চুপি খেয়ে চলে যাবেন। কেউ জানবে না, কেউ শুনবে না।

রাখাল সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, চুপি চুপি কেন? তুমি আমাকে খাওয়াবে এতে দোষ কি?

সারদাও হাসিয়া জবাব দিয়াছিল, দোষ ত খাওয়ার মধ্যে নেই দেব্‌তা, দোষ আছে চুপিচুপি খাওয়ানোর মধ্যে। অথচ নিজে ছাড়া আর কাউকে না জানতে দেবার লোভ যে ছাড়তে পারিনি।

সত্যি পারো না, না বলতে হয় তাই বলচো?

অত জেরার জবাব আমি দিতে পারবো না, বলিয়া সারদা হাসিয়া মুখ ফিরাইল।

রাখালের বুকের কাছটা শিহরিয়া উঠিল, বলিল, বেশ, তাই হবে—পরশুই আসবো বলিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া পড়িল।

সেই পরশু আজ আসিয়াছে। রাত্রি বেশী নয়, বোধ হয় আটটা বাজিয়াছে। সকলেই কাজে ব্যস্ত, রাখালকে বোধ হয় কেহ লক্ষ্য করিল না। রান্নার কাজ শেষ করিয়া সারদা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, রাখালকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বিছানায় বসিতে দিল, বলিল, আমি

ভেবেছিলুম হয়তো আপনার রাত হবে, কিংবা হয়তো ভুলেই যাবেন, আসবেন না।

ভুলে যাবো এ তুমি কখনো ভাবোনি সারদা, এ তোমার মিছে কথা।

সারদা হাসিমুখে মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ, আমার মিছে কথা। একবারও ভাবিনি আপনি ভুলে যাবেন। খেতে দিই?

দাও।

হাতের কাছে সমস্ত প্রস্তুত ছিল, আসন পাতিয়া সে খাইতে দিল। পরিমিত আয়োজন, বাহুল্য কিছুতে নাই। রাখাল খুশী হইয়া বলিল, ঠিক এমনই আমি মনে মনে চেয়েছিলুম সারদা, কিন্তু আশা করিনি। ভেবেছিলুম আরও পাঁচজনের মতো যত্ন দেখানোর আতিশয্যে কত বাড়াবাড়িই না করবে। কত জিনিস হয়তো ফেলা যাবে। কিন্তু সে চেষ্টা তুমি করোনি।

সারদা কহিল, জিনিস ত আমার নয় দেব্‌তা, আপনার। নিজের হলে বাড়াবাড়ি করতে ভয় হোতো না, হয়তো করতুমও—নষ্টও হোতো।

ভাল বুদ্ধি তোমার!

ভালোই ত! নইলে আপনি ভাবতেন মেয়েটার অন্যায় ত কম নয়! দেনা শোধ করে না, আবার পরের টাকায় বাবুয়ানি করে।

রাখাল হাসিয়া বলিল, টাকার দাবী আমি ছেড়ে দিলুম সারদা, আর তোমাকে শোধ করতে হবে না, ভাবতেও হবে না। কেবল খাতাটা দাও, আমি ফিরে নিয়ে যাই।

সারদা কৃত্রিম গাম্ভীর্যে মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, তা হলে ছাড়-রফা হয়ে গেল বলুন? এর পরে আপনিও টাকা চাইতে পাবেন না, আমিও না। অভাবে যদি মরি তবুও না। কেমন?

রাখাল বলিল, তুমি ভারী দুষ্টু সারদা। ভাবি, জীবন তোমাকে ফেলে গেল কি করে? সে কি চিনতে পারলে না?

সারদা মাথা নাড়িয়া বলিল, না। এ আমার ভাগ্যের লেখা দেব্‌তা। স্বামী না, যিনি ভুলিয়ে আনলেন তিনি না, আর যিনি যমের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে এলেন তিনিও না। কি জানি আমি কি-যে, কেউ চিনতেই পারে না।

একটুখানি থামিয়া বলিল, আমার স্বামীর কথা থাক, কিন্তু জীবনবাবুর কথা বলি। সত্যই আমাকে তিনি চিনতে পারেন নি। সে বুদ্ধিই তাঁর ছিল না।

রাখাল কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, বুদ্ধি থাকলে কি করা তাঁর উচিত ছিল?

উচিত ছিল পালিয়ে না যাওয়া। উচিত ছিল বলা, আর আমি পারিনে সারদা, এবার তুমি ভার নাও।

বললে ভার নিতে?

নিতুম বৈ কি। ভেবেচেন ভার নিতে পারে শুধু পুরুষে, মেয়েরা পারে না! পারে। আমি দেখিয়ে দিতুম কি করে সংসারের ভার নিতে হয়।

রাখাল বলিল, এতই যদি জানো ত আত্মহত্যা করতে গেলে কেন?

ভেবেছেন মেয়েরা বুঝি এইজন্যে আত্মহত্যা করে? এমনি বুদ্ধিই পুরুষদের। বলিয়াই সে তৎক্ষণাৎ হাসিয়া কহিল, আমি করেছিলুম আপনাকে দেখতে পাবো বলে। নইলে পেতুম না ত,—আজও থাকতেন আমার কাছে তেমনি অজানা।

রাখালের মুখে একটা কথা আসিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু চাপিয়া গেল। তাহার আর কোন শিক্ষা না হোক, মেয়েদের কাছে সাবধানে কথা বলার শিক্ষা হইয়াছিল।

সারদা জিজ্ঞাসা করিল, দেব্‌তা, আপনি বিয়ে করেন নি কেন? সত্যি বলুন না?

রাখাল মুখের গ্রাস গিলিয়া লইয়া বলিল, তোমার এ খবর জেনে লাভ কি?

সারদা বলিল, কি জানি কেন আমার ভারী জানতে ইচ্ছে করে। সেদিনও জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আপনি যা-তা বলে কাটিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু আজ কিছুতে শুনবো না, আপনাকে বলতেই হবে।

রাখাল বলিল, সারদা, আমাদের সমাজে কারও বা বিয়ে হয়, কেউ বা নিজে বিয়ে করে। আমার হয়নি দেবার লোক ছিল না বলে। আর নিজে সাহস করিনি গরীব বলে। জানো ত, সংসারে আপনার বলতে আমার কিচ্ছু নেই।

সারদা রাগ করিয়া বলিল, এ আপনার অন্যায় কথা দেব্‌তা। গরীব বলে কি মানুষের বিয়ে হবে না? তার সে অধিকার নেই? জগতে তারা এমনি আসবে আর যাবে, কোথাও বাসা বাঁধবে না? কিন্তু সে ত নয়, আসলে আপনি ভারী ভীতু লোক—কিচ্ছু সাহস নেই।

রাখাল তাহার উত্তাপ দেখিয়া হাসিয়া অভিযোগ স্বীকার করিয়া লইল, বলিল, হয়ত তোমার কথাই সত্যি, হয়ত সত্যিই আমি ভীতু মানুষ—অনিশ্চিত ভাগ্যের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে ভয় পাই।

কিন্তু ভাগ্য তো চিরকালই অনিশ্চিত দেব্‌তা, সে ছোটবড় বিচার করে না, আপন নিয়মে আপনি চলে যায়।

তা-ও জানি, কিন্তু আমি যা,—তাই। নিজেকে ত বদলাতে পারবো না সারদা।

না-ই বা পারলেন? যে স্ত্রী হয়ে আপনার পাশে আসবে বদলাবার ভার নেবে যে সে,—নইলে কিসের স্ত্রী, বিয়ে আপনাকে করতেই হবে।

করতেই হবে নাকি?

সারদা এবার কণ্ঠস্বরে অধিকতর জোর দিয়া বলিল, হাঁ করতেই হবে, নইলে কিছুতে আমি ছাড়বো না। এখুনি বলছিলেন কেউ ছিল না বলেই বিয়ে হয়নি, এতদিনে আপনার সেই লোক এসেচি আমি। তাকে শিখিয়ে দিয়ে আসবো কি করে গরীবের ঘর চলে, কি করে সেখানেও যা-কিছু পাবার সব পাওয়া যায়।

কাঙালের মতো আকাশে হাত পেতে কেবল হায় হায় করে মরার জন্যেই ভগবান গরীবের সৃষ্টি করেন নি, এ বিদ্যে তাকে দিয়ে আসবো।

তাহার কথা শুনিয়া রাখাল মনে মনে সত্যিই বিস্ময়াপন্ন হইল, কিন্তু মুখে বলিল, এ বিদ্যে শিখতে যদি সে না পারে—শিখতে না যদি চায়, তখন আমার দুঃখের ভার নেবে কে সারদা? কার কাছে গিয়ে নালিশ জানাবো?

সারদা অবাক হইয়া রাখালের মুখের প্রতি কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কারো কাছে না। মেয়েমানুষ হয়ে এ কথা সে বুঝবে না, স্বামীর দুঃখের অংশ নেবে না, বরঞ্চ তাকে বাড়িয়ে তুলবে এমন হতেই পারে না দেব্‌তা। এ আমি কিছুতে বিশ্বাস করবো না।

আর একবার রাখাল জিহ্বাকে শাসন করিল, বলিল না যে মেয়েদের আমি কম দেখিনি সারদা, কিন্তু তারা তুমি নয়। সারদাকে সবাই পায় না।

জবাব না দিয়া রাখাল নিঃশব্দে আহারে মন দিয়াছে, দেখিয়া সে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, কৈ কিছুই ত বললেন না দেব্‌তা।

এবার রাখাল মুখ তুলিয়া হাসিল, বলিল, সব প্রশ্নের উত্তর বুঝি তখনি মেলে? ভাবতে সময় লাগে যে!

সময় ত লাগে, কিন্তু কত লাগে শুনি?

সে কথা আজই বলবো কি করে সারদা? যেদিন নিজে পাবো, উত্তর তোমাকেও জানাবো সেদিন।

সেই ভালো, বলিয়া সারদা চুপ করিল। ঘরের মধ্যে একজন নীরবে ভোজন করিতেছে, আর একজন তেমনি নীরবে চাহিয়া আছে। খাওয়া প্রায় শেষ হয় এমন সময়ে একটা ঘন নিঃশ্বাসের শব্দে চকিত হইয়া রাখাল চোখ তুলিয়া কহিল, ও কি?

সারদা সলজ্জে মৃদু হাসিয়া বলিল, কিছু না ত! একটু পরে বলিল, পরশু বোধ হয় আমরা হরিণপুরে যাচ্ছি দেব্‌তা।

পরশু? তারকের ওখানে?

হাঁ। কাল শনিবার, তারকবাবু রাতের গাড়িতে আসবেন, পরের দিন রবিবারে আমাদের নিয়ে যাবেন।

যাওয়া স্থির হোলো কি করে?

কাল নিজেই তিনি এসেছিলেন।

তারক এসেছিল কলকাতায়? কৈ, আমার সঙ্গে ত দেখা করেনি!

একদিন বৈ তো ছুটি নয়—দুপুরবেলায় এলেন, আবার সন্ধ্যার গাড়িতেই ফিরে গেলেন।

একটু পরে বলিল, বেশ লোক। উনি খুব বিদ্বান, না?

রাখাল সায় দিয়া কহিল, হাঁ।

ওঁর মতো আপনিও কেন বিদ্বান হননি দেব্‌তা?

রাখাল হাত দিয়া নিজের কপালটা দেখাইয়া বলিল, এখানে লেখা ছিল বলে।

সারদা বলিতে লাগিল, আর শুধু বিদ্যেই নয়, যেমন চেহারা তেমনি গায়ের জোর।বাজার থেকে অনেক জিনিস কাল কিনেছিলেন—মস্ত ভারী বোঝা—যাবার সময় নিজে তুলে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে রাখলেন। আপনি কখনো পারতেন না দেব্‌তা।

রাখাল স্বীকার করিল, না, আমি পারতাম না সারদা—আমার গায়ে জোর নেই—আমি বড় দুর্বল।

কিন্তু এ-ও কি কপালের লেখা? তার মানে আপনি কখনো চেষ্টা করেন নি। তারকবাবু বলছিলেন, চেষ্টায় সমস্ত হয়, সব-কিছু সংসারে মেলে।

এ কথায় রাখাল হাসিয়া বলিল, কিন্তু সেই চেষ্টাটাই যে কোন্ চেষ্টায় মেলে তাকে জিজ্ঞেসা করলে না কেন? তার জবাবটা হয়তো আমার কাজে লাগতো।

শুনিয়া সারদাও হাসিল, বলিল, বেশ জিজ্ঞেসা করবো; কিন্তু এ কেবল আপনার কথার ঘোর-ফের,—আসলে সত্যিও নয়, তাঁর জবাবও আপনার কোন কাজে লাগবে না। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর ওপর আপনি রাগ করে আছেন—না?

রাখাল সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, আমি রাগ করে আছি তারকের ওপর? এ সন্দেহ তোমার হলো কি করে?

কি জানি কি করে হলো, কিন্তু হয়েচে তাই বললুম।

রাখাল চুপ করিয়া রহিল, আর প্রতিবাদ করিল না।

সারদা বলিতে লাগিল, তাঁর ইচ্ছে নয় আর গ্রামে থাকা। একটা ছোট্ট জায়গার ছোট্ট ইস্কুলে ছেলে পড়িয়ে জীবন ক্ষয় করতে তিনি নারাজ। সেখানে বড় হবার সুযোগ নেই, সেখানে শক্তি হয়েচে সঙ্কুচিত, বুদ্ধি রয়েচে মাথা হেঁট করে, তাই শহরে ফিরে আসতে চান। এখানে উঁচু হয়ে দাঁড়ানো তাঁর কাছে কিছুই শক্ত নয়।

রাখাল আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কথাগুলো কি তোমার, না তার সারদা?

না আমার নয়, তাঁরই মুখের কথা। মাকে বলছিলেন আমি শুনেচি।

শুনে নতুন-মা কি বললেন?

শুনে মা খুশিই হলেন। বললেন, তার মতো ছেলের গ্রামে পড়ে থাকা অন্যায়। থাকতে যেন না হয় এ তিনি করবেন।

করবেন কি করে?

সারদা বলিল, শক্ত নয় ত দেব্‌তা। মা বিমলবাবুকে বললে না হতে পারে এমন ত কিছু নেই।

শুনিয়া রাখাল তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। অর্থাৎ, জিজ্ঞাসা করিতে চাহিল ইহার তাৎপর্য কি?

সারদা বুঝিল আজও রাখাল কিছুই জানে না। বলিল, খাওয়া হয়ে গেছে, হাত ধুয়ে এসে বসুন আমি বলচি

মিনিট-কয়েক পরে হাতমুখ ধুইয়া সে বিছানায় আসিয়া বসিল। সারদা তাহাকে জল দিল, পান দিল, তার পরে অদূরে মেঝের উপরে বসিয়া বলিল, রমণীবাবু চলে গেছেন আপনি জানেন?

চলে গেছেন? কৈ না! কোথায় গেছেন?

কোথায় গেছেন সে তিনিই জানেন, কিন্তু এখানে আর আসেন না। যেতে তাঁকে হতোই—এ ভার বইবার আর তাঁর জোর ছিল না—কিন্তু গেলেন মিথ্যে ছল করে। এতখানি ছোট হয়ে বোধ করি আমার কাছে থেকে জীবনবাবুও যায়নি। এই বলিয়া সে সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিল, এ ঘটতোই, কিন্তু উপলক্ষ হলেন আপনি। সেই যে রেণুর অসুখে পরের নামে টাকা ভিক্ষে চাইতে এলেন, আর না পেয়ে অভুক্ত চলে গেলেন, এ অন্যায় মাকে ভেঙ্গে গড়লো, এ ব্যথা তিনি আজও ভুলতে পারলেন না। আমাকে ডেকে বললেন, সারদা, রাজুকে আজ আমার চাই-ই, নইলে বাঁচবো না। এসো তুমি আমার সঙ্গে। যা-কিছু মায়ের ছিল পুঁটুলিতে বেঁধে নিয়ে আমরা লুকিয়ে গেলুম আপনার বাসায়, তার পরে গেলুম ব্রজবাবুর বাড়ি, কিন্তু সব খালি, সব শূন্য! নোটিশ ঝুলছে বাড়ি ভাড়া দেবার। জানা গেল না কিছুই, বুঝা গেল শুধু কোথায় কোন্ অজানা গৃহে মেয়ে তাঁর পীড়িত, অর্থ নেই ওষুধ দেবার, লোক নেই সেবা করার। হয়তো বেঁচে আছে, হয়তো বা নেই। অথচ উপায় নেই সেখানে যাবার—পথের চিহ্ন গেছে নিঃশেষে মুছে।

মাকে নিয়ে ফিরে এলুম। তখন বাইরের ঘরে চলেছে খাওয়া-দাওয়া নাচ-গান আনন্দ-কলরব। করবার কিছু নেই, কেবল বিছানায় শুয়ে দু'চোখ বেয়ে তাঁর অবিরল জল পড়তে লাগলো। শিয়রে বসে নিঃশব্দে শুধু মাথায় হাত বুলোতে লাগলুম—এ-ছাড়া সান্ত্বনা দেবার তাঁকে ছিলই বা আমার কি!

সেদিন বিমলবাবু ছিলেন সামান্য-পরিচিত আমন্ত্রিত অতিথি, তাঁরই সম্মাননার উদ্দেশ্যে ছিল আনন্দ-অনুষ্ঠান। রমণীবাবু এলেন ঘরের মধ্যে তেড়ে, বললেন, চলো সভায়। মা বললেন, না, আমি অসুস্থ। তিনি বললেন, বিমলবাবু কোটিপতি ধনী, তিনি আমার মনিব, নিজে আসবেন এই ঘরে দেখা করতে। মা বললেন, না, সে হবে না। এতে অতিথির কত যে অসম্মান সে কথা মা না জানতেন তা নয়, কিন্তু অনুশোচনায়, ব্যথায়, অন্তরের গোপন ধিক্কারে তখন মুখ-দেখানো ছিল বোধ করি অসম্ভব। কিন্তু দেখাতে হলো। বিমলবাবু নিজে এসে ঢুকলেন ঘরে। প্রশান্ত সৌম্য মূর্তি, কথাগুলি মৃদু বললেন, অনধিকার-প্রবেশের অন্যায় হলো বুঝি, কিন্তু যাবার আগে না এসেও পারলাম না। কেমন আছেন বলুন? মা বললেন, ভালো আছি। তিনি বললেন, ওটা রাগের কথা, ভালো আপনি নেই। কিছুকাল আগে ছবি আপনার দেখেচি আর আজ দেখচি সশরীরে। কত যে প্রভেদ সে আমিই বুঝি। এ চলতে পারে না, শরীর ভালো আপনাকে করতেই হবে। যাবেন একবার সিঙ্গাপুরে? সেখানে আমি থাকি—সমুদ্রের কাছাকাছি একটা বাড়ি আছে আমার। হাওয়ারও শেষ নেই, আলোরও সীমা নেই। পূর্বের দেহ আবার ফিরে আসবে,—চলুন।

মা শুধু জবাব দিলেন, না।

না কেন? প্রার্থনা আমার রাখবেন না?

মা চুপ করে রইলেন। যাবার উপায় ত নেই, মেয়ে যে পীড়িত, স্বামী যে গৃহহীন।

সেদিন রমণীবাবু ছিলেন মদ খেয়ে অপ্রকৃতিস্থ, জ্বলে উঠে বললেন, যেতেই হবে। আমি হুকুম করচি যেতে হবে তোমাকে।

না, আমি যেতে পারবো না।

তার পরে শুরু হলো অপমান আর কটু কথার ঝড়। সে যে কত কটু আমি বলতে পারবো না দেব্‌তা। ঘূর্ণি হাওয়ায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জড়ো করে তুললে

যেখানে যত ছিল নোংরামির আবর্জনা—প্রকাশ পেতে দেরি হলো না যে, মা ও-লোকটার স্ত্রী নয়—রক্ষিতা। সতীর মুখোশ পরে ছদ্মবেশে রয়েচে শুধু একটা গণিকা। তখন আমি একপাশে দাঁড়িয়ে, নিজের কথা মনে করে ভাবলুম, পৃথিবী দ্বিধা হও। মেয়েদের এ-যে এতবড় দুর্গতি তার আগে কে জানতো দেব্‌তা?

রাখাল নিষ্পলক-চক্ষে এতক্ষণ তাহার প্রতি চাহিয়াছিল, এবার ক্ষণিকের জন্য একবার চোখ ফিরাইল।

সারদা বলিতে লাগিল, মা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন যেন পাথরের মূর্তি! রমণীবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, যাবে কিনা বলো? ভাবচো কি বসে?

মার কণ্ঠস্বর পূর্বের চেয়েও মৃদু হয়ে এলো, বললেন, ভাবচি কি জানো সেজবাবু, ভাবচি শুধু বারো বছর তোমার কাছে আমার কাটলো কি করে? ঘুমিয়ে কি স্বপ্ন দেখছিলুম? কিন্তু আর না, ঘুম আমার ভেঙ্গেচে। আর তুমি এসো না এ-বাড়িতে, আর যেন না আমরা কেউ কারো মুখ দেখতে পাই। বলতে বলতে তাঁর সর্বাঙ্গ যেন ঘৃণায় বার বার শিউরে উঠলো।

রমণীবাবু এবার পাগল হয়ে গেলেন, বললেন, এ-বাড়ি কার? আমার। তোমাকে দিইনি।

মা বললেন, সেই ভালো যে তুমি দাওনি। এ-বাড়ি আমার নয় তোমারই। কালই ছেড়ে দিয়ে আমি চলে যাবো। কিন্তু এ জবাব রমণীবাবু আশা করেন নি, হঠাৎ মার মুখের পানে চেয়ে তাঁর চৈতন্য হলো—ভয় পেয়ে নানাভাবে তখন বোঝাতে চাইলেন এ শুধু রাগের কথা, এর কোন মানে নেই।

মা বললেন, মানে আছে সেজবাবু। সম্বন্ধ আমাদের শেষ হয়েচে, কিছুতেই সে আর ফিরবে না।

রাত্রি হয়ে এলো, রমণীবাবু চলে গেলেন। যে উৎসব সকালে এত সমারোহে আরম্ভ হয়েছিল সে যে এমনি করে শেষ হবে তা কে ভেবেছিল।

রাখাল কহিল, তারপরে?

সারদা বলিল, এগুলো ছোট, কিন্তু তার পরেরটাই বড় কথা দেব্‌তা। বিমলবাবুর অভ্যর্থনা বাইরের দিক দিয়ে সেদিন পণ্ড হয়ে গেল বটে, কিন্তু অন্তরের দিক দিয়ে আর এক রূপে সে ফিরে এলো। মার অপমান তাঁর কি-যে লাগলো—তিনি ছিলেন পর—হলেন একান্ত আত্মীয়। আজ তাঁর চেয়ে বন্ধু আমাদের নেই। রমণীবাবুকে টাকা দিয়ে তিনি বাড়ি কিনে নিয়ে মাকে ফিরিয়ে দিলেন, নইলে আজ আমাদের কোথায় যেতে হতো কে জানে।

কিন্তু এই খবরটা রাখালকে খুশী করিতে পারিল না, তাহার মন যেন দমিয়া গেল। বলিল, বিমলবাবুর অনেক টাকা, তিনি দিতে পারেন। এ হয়তো তাঁর কাছে কিছুই নয়—কিন্তু নতুন-মা নিলেন কি করে? পরের কাছে দান নেওয়া ত তাঁর প্রকৃতি নয়!

সারদা বলিল, হয়তো তিনি আর পর নয়, হয়তো নেওয়ার চেয়ে না নেওয়ার অন্যায় হতো ঢের বেশী।

রাখাল বলিল, এ ভাবে বুঝতে শিখলে সুবিধে হয় বটে, কিন্তু বোঝা আমার পক্ষে কঠিন। এই বলিয়া এবার সে জোর করিয়া হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, রাত হলো, আমি চললুম। তোমরা ফিরে এলে আবার হয়তো দেখা হবে।

সারদা তড়িৎবেগে উঠিয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল, বলিল, না, এমন করে হঠাৎ চলে যেতে আমি কখনো দেবো না।

তুমি হঠাৎ বলো কাকে? রাত হলো যে—যাবো না?

যাবেন জানি, কিন্তু মার সঙ্গে দেখা করেও যাবেন না?

আমাকে তাঁর কিসের প্রয়োজন? দেখা করার শর্তও ত ছিল না। চুপি চুপি এসে তেমনি চুপি চুপি চলে যাবো এই ত ছিল কথা।

সারদা বলিল, না, সে শর্ত আর আমি মানবো না। দেখার প্রয়োজন নেই বলচেন? মার নিজের না থাক আপনারও কি নেই?

রাখাল বলিল, যে প্রয়োজন আমার সে রইলো অন্তরে—সে কখনো ঘুচবে না,—কিন্তু বাইরের প্রয়োজন আর দেখতে পাইনে সারদা।

চাপিবার চেষ্টা করিয়াও গূঢ় বেদনা সে চাপা দিতে পারিল না, কণ্ঠস্বরে ধরা পড়িল। তাহার মুখের প্রতি চোখ পাতিয়া সারদা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তার পরে ধীরে ধীরে বলিল, আজ একটা প্রার্থনা করি দেব্‌তা, ক্ষুদ্রতা ঈর্ষা আর যেখানেই থাক আপনার মনে যেন না থাকে। দেব্‌তা বলে ডাকি, দেব্‌তা বলেই যেন চিরদিন ভাবতে পারি। চলুন মার কাছে, আপনি না বললে যে তাঁর যাওয়া হবে না।

আমি না বললে যাওয়া হবে না? তার মানে?

মানে আমিও জিজ্ঞাসা করেছিলুম। মা বললেন, ছেলে বড় হলে তার মত নিতে হয় মা। জানি, রাজু বারণ করবে না, কিন্তু সে হুকুম না দিলেও যেতে পারবো না সারদা।

এ কথা শুনিয়া রাখাল নিরুত্তরে স্তব্ধ হইয়া রহিল। বুকের মধ্যে যে জ্বালা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহা নিভিতে চাহিল না, তথাপি দু'চোখ অশ্রু-সজল হইয়া আসিল, বলিল, তাঁর কাছে সহজে যেতে পারি এ সাহস আজ মনের মধ্যে খুঁজে পাইনে সারদা, কিন্তু বলো তাঁকে, কাল আসবো পায়ের ধুলো নিতে। বলিয়াই সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল, উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিল না।

চোদ্দ

তারক আসিয়াছে লইতে। আজ শনিবারের রাত্রিটা সে এখানে থাকিয়া কাল দুপুরের ট্রেনে নতুন-মাকে লইয়া যাত্রা করিবে। সঙ্গে যাইবে জন-দুই দাসী-চাকর এবং সারদা। তাহার হরিণপুরের বাসাটা তারক সাধ্যমতো সুব্যবস্থিত করিয়া আসিয়াছে। পল্লীগ্রামে নগরের সকল সুবিধা পাইবার নয়, তথাপি আমন্ত্রিত অতিথিদের ক্লেশ না হয়, তাঁহাদের অভ্যস্ত জীবন-যাত্রায় এখানে আসিয়া বিপর্যয় না ঘটে, এদিকে তাহার খর দৃষ্টি ছিল। আসিয়া পর্যন্ত বারে বারে সেই আলোচনাই হইতেছিল। নতুন-মা যতই বলেন, আমি গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে বাবা, পাড়াগাঁয়েই জন্মেচি, আমার জন্যে তোমার ভাবনা নেই। তারক ততই সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলে, বিশ্বাস করতে মন চায় না মা, যে-কষ্ট সাধারণ দশজনের সহ্য হয় আপনারও তা সইবে। ভয় হয়, মুখে কিছুই বলবেন না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে শরীর ভেঙ্গে যাবে।

ভাঙ্গবে না তারক, ভাঙ্গবে না। আমি ভালোই থাকবো।

তাই হোক মা। কিন্তু দেহ যদি ভাঙ্গে আপনাকে আমি ক্ষমা করবো না তা বলে রাখচি।

নতুন-মা হাসিয়া বলিলেন, তাই সই। তুমি দেখো, আমি মোটা হয়ে ফিরে আসবো।

তথাপি পল্লীগ্রামের কত ছোট ছোট অসুবিধার কথা তারকের মনে আসে। নানাবিধ খাদ্য-সামগ্রী সে যথাসাধ্য ভালোই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু খাওয়াই ত সব নয়। গোটা-দুই জোর আলো চাই, রাত্রে চলাফেরায় উঠানের কোথাও না লেশমাত্র ছায়া পড়িতে পারে। একটা ভালো ফিলটারের প্রয়োজন, খাবার বাসনগুলার কিছু কিছু অদল-বদল আবশ্যক। জানালার পর্দাগুলা কাচাইয়া

রাখিয়াছে বটে, তবু নতুন গোটা-কয়েক কিনিয়া লওয়া দরকার। নতুন-মা চা খান না সত্য, কিন্তু কোনদিন ইচ্ছা হইতেও পারে। তখন ঐ কষ-লাগা কানা-ভাঙ্গা পাত্রগুলা কি কাজে আসিবে? এক-সেট নূতন চাই। আহ্নিকের সাজসজ্জা ত কিনিতেই হইবে। ভালো ধূপ পাড়াগাঁয়ে মিলে না—সে ভুলিলে চলিবে না। এমনি কত-কি প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় ছোট-খাটো জিনিসপত্র সংগ্রহ করিতে সে বাজারে চলিয়া গেছে, এখনো ফিরে নাই।

বাক্স-বিছানা বাঁধাছাঁদা চলিতেছে, কালকের জন্য ফেলিয়া রাখার পক্ষপাতী সারদা নয়। বিমলবাবু আসিলেন দেখা করিতে। প্রত্যহ যেমন আসেন তেমনি। জিজ্ঞাসা করিলেন, নতুন-বৌ, কতদিন থাকবে সেখানে?

সবিতা বলিল, যতদিন থাকতে বলবে তুমি ততদিন। তার একটি মিনিটও বেশী নয়।

কিন্তু এ কথা কেউ শুনলে যে তার অন্য মানে করবে নতুন-বৌ!

অর্থাৎ নতুন-বৌয়ের নতুন কলঙ্ক রটবে, এই তোমার ভয়,—না? এই বলিয়া সবিতা একটুখানি হাসিল।

শুনিয়া বিমলবাবুও হাসিলেন, ভয় ত আছেই। কিন্তু আমি সে হতে দেবো কেন?

দেবে না বলেই ত জানি, আর সেই ত আমার ভরসা। এতদিন নিজের খেয়াল আর বুদ্ধি দিয়েই চলে দেখলুম, এবার ভেবেচি তাদের ছুটি দেবো। দিয়ে দেখি কি মেলে, আর কোথায় গিয়ে দাঁড়াই।

বিমলবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। সবিতা বলিতে লাগিল, তুমি হয়ত ভাবচো হঠাৎ এ বুদ্ধি দিলে কে? কেউ দেয়নি। সেদিন তুমি চলে গেলে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলুম পথের বাঁকে তোমার গাড়ি হলো অদৃশ্য, চোখের কাজ শেষ হলো, কিন্তু মন নিলে তোমার পিছু। সঙ্গে সঙ্গে কতদূর যে গেলো তার ঠিকানা নেই। ফিরে এসে ঘরে বসলুম—একলা নিজের মনে ছেলেবেলা থেকে সেই সে-

দিন পর্যন্ত কত ভাবনাই এলো গেলো, হঠাৎ একসময় আমার মন কি বলে উঠলো জানো? বললে, সবিতা, তোমার যৌবন গেছে, রূপ ত আর নেই! তবুও যদি উনি ভালোবেসে থাকেন সে তাঁর মোহ নয়, সে সত্যি। সত্য কখনো বঞ্চনা করে না—তাকে তোমার ভয় নেই। যা নিজে মিথ্যে নয়, সে কিছুতে তোমার মাথায় মিথ্যে অকল্যাণ এনে দেবে না,—তাকে বিশ্বাস করো।

বিমলবাবু বলিলেন, তোমাকে সত্যি ভালোবাসতে পারি, এ তুমি বিশ্বাস করো নতুন-বৌ?

হাঁ করি। নইলে ত তোমার কোন দরকার ছিল না। আমার ত আর রূপ নেই।

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, এমন ত হতে পারে আমার চোখে তোমার রূপের সীমা নেই। অথচ রূপ আমি সংসারে কম দেখিনি নতুন-বৌ।

শুনিয়া সবিতাও হাসিল, বলিল, আশ্চর্য মানুষ তুমি। এ-ছাড়া আর কি বলবো তোমাকে?

বিমলবাবু বলিলেন, তুমি নিজেও কম আশ্চর্য নয় নতুন-বৌ! এই ত সেদিন এমন করে ঠকলে, অতবড় আঘাত পেলে, তবু যে কি করে এত শীঘ্র আমাকে বিশ্বাস করলে আমি তাই শুধু ভাবি!

সবিতা কহিল, আঘাত পেয়েচি সত্যি, কিন্তু ঠকিনি। কুয়াশার আড়ালে একটানা দিনগুলো অবাধে বয়ে যাচ্ছিল এই তোমরা দেখেচো। হয়তো এমনিই চিরদিন বয়ে যেতো—যাবজ্জীবন দণ্ডিত কয়েদীর জীবন যেমন করে কেটে যায় জেলের মধ্যে, কিন্তু হঠাৎ উঠলো ঝড়, কুয়াশা গেল কেটে, জেলের প্রাচীর পড়লো ভেঙ্গেচুরে। বেরিয়ে এলুম অজানা পথের ’পরে, কিন্তু কোথায় ছিলে তুমি অপরিচিত বন্ধু, হাত বাড়িয়ে দিলে। এ-কে কি ঠকা বলে? কিন্তু কি বলে তোমাকে ডাকি বলো ত?

আমার নামটা বুঝি বলতে চাও না?

না, মুখে বাধে।

বিমলবাবু বলিলেন, ছেলেবেলায় আমার আর একটা নাম ছিল দিদিমার দেওয়া। তার ইতিহাস আছে। কিন্তু সে নামটা যে তোমার মুখে আরো বেশী বাধবে নতুন-বৌ!

কি বলো ত, দেখি যদি মনে ধরে।

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, পাড়ায় তারা ডাকতো আমাকে দয়াময় বলে।

সবিতা বলিল, নামের ইতিহাস জানতে চাইনে,—সে আমি বানিয়ে নেবো। ভারী পছন্দ হয়েচে নামটি—এখন থেকে আমিও ডাকবো দয়াময় বলে।

বিমলবাবু বলিলেন, তাই ডেকো। কিন্তু যা জিজ্ঞেসা করেছিলুম সে ত বললে না?

কি জিজ্ঞেসা করেছিলে দয়াময়?

এত শীঘ্র আমাকে ভালোবাসলে কি করে?

সবিতা ক্ষণকাল তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, ভালোবাসি এ কথা তো বলিনি। বলেচি, তুমি বন্ধু, তোমাকে বিশ্বাস করি। বলেচি, যে ভালোবাসে তার হাত থেকে কখনো অকল্যাণ আসে না।

উভয়েই ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সবিতা কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, কিন্তু, আমার কথা শুনে চুপ করে রইলে যে তুমি? কিছু বললে না ত?

বিমলবাবু প্রত্যুত্তরে একটুখানি শুষ্ক হাসিয়া বলিলেন, বলবার কিছুই নেই নতুন-বৌ,—তুমি ঠিক কথাই বলেচো। ভালোবাসার ধনকে সত্যিই কেউ আপন হাতে অমঙ্গল এনে দিতে পারে না। তার নিজের দুঃখ যতই হোক না, সইতে তাকে হবেই।

সবিতা কহিল, কেবল সইতে পারাই ত নয়। তুমি দুঃখ পেলে আমিও পাবো যে।

বিমলবাবু আবার একটু হাসিয়া বলিলেন, পাওয়া উচিত নয় নতুন-বৌ। তবু যদি পাও, তখন এই কথা ভেবো যে, অকল্যাণের দুঃখ এর চেয়েও বেশি।

এ কথা কি তোমার পক্ষেও খাটে দয়াময়?

না, খাটে না। তার কারণ, আমার মনের মধ্যে তুমি কল্যাণের প্রতিমূর্তি, কিন্তু তোমার কাছে আমি তা নয়। হতেও পারিনে। কিন্তু সেজন্য তোমাকে দোষও দিইনে, অভিমানও করিনে, জানি নানা কারণে এমনিই জগৎ। তুমি এলে আমার বিগত দিনের ত্রুটি যেতো ঘুচে, ভবিষ্যৎ হতো উজ্জ্বল, মধুর শান্ত, তার কল্যাণ ব্যাপ্ত হতো নানাদিকে—আমাকে করে তুলতো অনেক বড়—

কিন্তু আমি নিজে দাঁড়াবো কোন্‌খানে?

তুমি নিজে দাঁড়াবে কোন্‌খানে? বিমলবাবু একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। কয়েক মুহূর্ত স্থির থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, সে-ও বুঝতে পারি নতুন-বৌ। তুমি হয়ে যাবে অপরের চোখে ছোট, তারা বলবে তোমাকে লোভী, বলবে—আরও যে-সব কথা তা ভাবতেও আমার লজ্জা করে। অথচ, একান্ত বিশ্বাসে জানি একটি কথাও তার সত্য নয়, তার থেকে তুমি অনেক দূরে—অনেক উপরে।

সবিতার চোখ সজল হইয়া আসিল। এমন সময়েও যে লোক মিথ্যা বলিতে পারিল না, তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, দয়াময়, আমি আনবো তোমার জীবনে পরিপূর্ণ কল্যাণ, আর তুমি এনে দেবে আমাকে তেমনি পরিপূর্ণ অকল্যাণ,—এমন বিপরীত ঘটনা কি করে সত্যি হয়? কি এর উত্তর?

বিমলবাবু বলিলেন, এর উত্তর আমার দেবার নয় নতুন-বৌ। আমার কাছে এই আমার বিশ্বাস। তোমার কাছেও এমনি বিশ্বাস যদি কখনো সত্য হয়ে দেখা দেয়, তখনি কেবল মনের দ্বন্দ্ব ঘুচবে, এর উত্তর পাবে,—তার আগে নয়।

সবিতা কহিল, উত্তর যদি কখনো না পাই, সংশয় যদি না ঘোচে, তোমার বিশ্বাস এবং আমার বিশ্বাস যদি চিরদিন এমনি উলটো মুখেই বয়, তবু তুমি আমার ভার বয়ে বেড়াবে?

বিমলবাবু বলিলেন, যদি উলটো মুখেই বয়, তবু তোমাকে আমি দোষ দেবো না। তোমার ভার আজ আমার ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য, আমার আনন্দের সেবা। কিন্তু এ ঐশ্বর্য যদি কখনো ক্লান্তির বোঝা হয়ে দেখা দেয়, সেদিন তোমার কাছে আমি ছুটি চাইবো। আবেদন মঞ্জুর করো, বন্ধুর মতোই বিদায় নিয়ে যাবো,—কোথাও মালিন্যের চিহ্নমাত্র রেখে যাবো না তোমার কাছে এই শপথ করলাম নতুন-বৌ।

সবিতা তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। মিনিট দুই-তিন পরে বিমলবাবু ম্লান হাসিয়া বলিলেন, কি ভাবছো বলো ত?

ভাবচি সংসারে এমন ভয়ানক সমস্যার উদ্ভব হয় কেন? একের ভালবাসা যেখানে অপরিসীম অপরে তাকে গ্রহণ করবার পথ খুঁজে পায় না কেন?

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, খোঁজা সত্যি হলেই তবে পথ চোখে পড়ে, তার আগে নয়। নইলে অন্ধকারে কেবলি হাতড়ে মরতে হয়। সংসারে এ পরীক্ষা আমাকে বহুবার দিতে হয়েচে।

পথের সন্ধান পেয়েছিলে?

হাঁ। প্রার্থনায় যেখানে কপটতা ছিল না, সেখানেই পেয়েছিলাম।

তার মানে?

মানে এই যে, যে কামনায় দ্বিধা নেই, দুর্বলতা নেই, তাকে না-মঞ্জুর করার শক্তি কোথাও নেই। এরই আর এক নাম বিশ্বাস। সত্য বিশ্বাস জগতে ব্যর্থ হয় না নতুন-বৌ।

সবিতা কহিল, আমি যাই কেন না করি দয়াময়, তোমার নিজের চাওয়ার মধ্যে ত ছলনা নেই, তবে সে কেন আমার কাছে ব্যর্থ হলো?

বিমলবাবু বলিলেন, ব্যর্থ হয়নি নতুন-বৌ। তোমাকে চেয়েছিলাম বড় করে পেতে—সে আমি পেয়েচি। তোমাকে সম্পূর্ণ করে পাইনি তা মানি, কিন্তু নিজের যে বিশ্বাসকে আমি আজো দৃঢ়ভাবে ধরে আছি, লুব্ধতা-বশে, দুর্বলতা-বশে তাকে যদি ছোট না করি, আমার কামনা পূর্ণ হবেই একদিন। সেদিন তোমাকে পরিপূর্ণ করেই পাবো। আমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না কেউ—তুমিও না।

সবিতা নীরবে চাহিয়া রহিল। যা অসম্ভব, কি করিয়া আর একদিন যে তাহা সম্ভব হইবে সে ভাবিয়া পাইল না। দয়াময়ের কাছে নিচু হইয়া বুকে হাঁটিয়া যাওয়ার পথ আছে, কিন্তু স্বচ্ছন্দে সোজা হইয়া চলার পথ কৈ?

সারদা আসিয়া বলিল, রাখালবাবু এসেছেন মা।

রাজু? কৈ সে?

এইত মা আমি, বলিয়া রাখাল প্রবেশ করিল। তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল, পরে বিমলবাবুকে নমস্কার করিয়া, মেঝেয় পাতা-গালিচার উপরে গিয়া বসিল।

সবিতা বলিলেন, তারক এসেছে আমাকে নিতে, কাল যাবো আমরা তার হরিণপুরের বাড়িতে। শুনেচো রাজু?

রাখাল কহিল, সারদার মুখে হঠাৎ শুনতে পেয়েছি মা।

হঠাৎ তো নয় বাবা। ওকে যে তোমার মত নিতে বলেছিলুম।

আমার মত কি আপনাকে জানিয়েছে সারদা?

সবিতা বলিলেন, না। কিন্তু জানি সে তোমার বন্ধু, তার কাছে যেতে তোমার আপত্তি হবে না।

রাখাল প্রথমটা চুপ করিয়া রহিল, তার পরে বলিল, আমার মতামতের প্রয়োজন নেই মা। আমার চেয়েও আপনাদের সে ঢের বড় বন্ধু।

এ কথায় সবিতা বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এর মানে রাজু?

রাখাল কহিল, সমস্ত কথার মানে খুলে বলতে নেই মা, মুখের ভাষায় তার অর্থ বিকৃত হয়ে ওঠে। সে আমি বলবো না, কিন্তু আমার মতামতের ’পরেই যদি আপনাদের যাওয়া না-যাওয়া নির্ভর করে তাহলে যাওয়া আপনাদের হবে না। আমার মত নেই।

সবিতা অবাক হইয়া বলিলেন, সমস্ত স্থির হয়ে গেছে যে রাজু! আমার কথা পেয়ে তারক জিনিসপত্র দোকানে কিনতে গেছে, আমাদের জন্যেই তার পল্লীগ্রামের বাসায় সকল প্রকারের ব্যবস্থা করে রেখে এসেছে—আমাদের যাতে কষ্ট না হয়—এখন না গিয়ে উপায় কি বাবা?

রাখাল শুষ্ক হাসিয়া বলিল, উপায় যে নেই সে আমি জানি। আমার মত নিয়ে আপনি কর্তব্য স্থির করবেন সে উচিতও নয়, প্রয়োজনও নয়। কাল সারদা বলছিলেন আপনি নাকি তাঁকে বলেছেন ছেলে বড় হলে তার মত নিয়ে তবে কাজ করতে হয়। আপনার মুখের এ কথা আমি চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবো, কিন্তু যে ছেলের শুধু পরের বেগার খেটেই চিরকাল কাটলো, তার বয়েস কখনো বাড়ে না। পরের কাছেও না, মায়ের কাছেও না। আমি আপনার সেই ছেলে নতুন-মা।

সবিতা অধোমুখে নীরবে বসিয়া রহিলেন; রাখাল বলিল, মনে দুঃখ করবেন না নতুন-মা, মানুষের অবজ্ঞার নীচে মানুষের ভার বয়ে বেড়ানোই আমার অদৃষ্ট। আপনারা চলে যাবার পরে আমার যদি কিছু করবার থাকে আদেশ করে যান, মায়ের আজ্ঞা আমি কোন ছলেই অবজ্ঞা করবো না।

সারদা চুপ করিয়া শুনিতেছিল, সহসা যে যেন আর সহিতে পারিল না, বলিয়া উঠিল, আপনি অনেকের অনেক কিছুই করেন, কিন্তু এমন করে মাকে খোঁটা দেওয়াও আপনার উচিত নয়।

সবিতা তাহাকে চোখের ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, সারদা বলে বলুক রাজু, এমন কথা আমার মুখ দিয়ে কখনো বার হবে না।

রাখাল কহিল, তার মানে আপনি ত সারদা নয় মা। সারদাদের আমি অনেক দেখেছি, ওরা কড়া কথার সুযোগ পেলে ছাড়তে পারে না, তাতে কৃতজ্ঞতার ভারটা ওদের লঘু হয়। ভাবে দেনা-পাওনা শোধ হলো।

সবিতা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না বাবা, ওকে তুমি বড্ড অবিচার করলে। সংসারে সারদা একটিই আছে, অনেক নেই রাজু।

সারদা মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া ছিল, নিঃশব্দে উঠিয়া চলিয়া গেল।

সবিতা মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেসা করিলেন, তারকের সঙ্গে কি তোমার ঝগড়া হয়েছে রাজু?

না মা, তার সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি।

আমাদের নিয়ে যাবার কথা তোমাকে জানায় নি সে?

কোনদিন না। সারদা বলে, আমার বাসাতে যাবার সে সময় পায় না। কিন্তু আর নয় মা, আমার যাবার সময় হলো, আমি উঠি। এই বলিয়া রাখাল উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিমলবাবু এতক্ষণ পর্যন্ত একটি কথাও বলেন নাই, এইবার কথা কহিলেন। সবিতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, তোমার ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় করে দেবে না নতুন-বৌ? এমনি অপরিচিত হয়েই দুজনে থাকবো?

সবিতা বলিলেন, ও আমার ছেলে এই ওর পরিচয়। কিন্তু তোমার পরিচয় ওর কাছে কি দেবো দয়াময়, আমিই নিজেই ত এখনো জানিনে।

যখন জানতে পারবে দেবে?

দেবো। ওর কাছে আমার গোপন কিছুই নেই। আমার সব দোষ-গুণ নিয়েই আমি ওর নতুন-মা।

রাখাল কহিল, ছেলেবেলায় যখন কেউ আমার আপনার রইলো না, তখন আমাকে উনি আশ্রয় দিয়েছিলেন, মানুষ করেছিলেন, মা বলে ডাকতে

শিখিয়েছিলেন, তখন থেকে মা বলেই জানি। চিরদিনই মা বলেই জানবো। এই বলিয়া হেঁট হইয়া সে আর একবার নতুন-মার পায়ের ধূলা লইল।

বিমলবাবু বলিলেন, তারকের ওখানে তোমার নতুন-মা যেতে চান কিছুদিনের জন্যে, এখানে ভালো লাগচে না বলে। আমি বলি যাওয়াই ভালো, তোমার সম্মতি আছে?

রাখাল হাসিয়া কহিল, আছে।

সত্যি বলো রাজু। কারণ তোমার অসম্মতিতে ওঁর যাওয়া হবে না। আমি নিষেধ করবো।

আপনার নিষেধ উনি শুনবেন?

অন্ততঃ নিজের কাছে নতুন-বৌ এই প্রতিজ্ঞাই করেছেন। এই বলিয়া বিমলবাবু একটুখানি হাসিলেন।

সবিতা তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া বলিলেন, হাঁ এই প্রতিজ্ঞাই করেছি। তোমার আদেশ আমি লঙ্ঘন করবো না।

শুনিয়া রাখালের চোখের দৃষ্টি মুহূর্তকালের জন্য রুক্ষ হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনি নিজেকে শান্ত করিয়া সহজ গলায় বলিল, বেশ, আপনারা যা ভালো বুঝবেন করুন, আমার আপত্তি নেই নতুন-মা। এই বলিয়া সে আর কোন প্রশ্নের পূর্বেই নীচে নামিয়া গেল।

নীচে পথের একধারে দাঁড়াইয়াছিল সারদা। সে সম্মুখে আসিয়া কহিল, একবার আমার ঘরে যেতে হবে দেব্‌তা।

কেন?

সারদাদের অনেক দেখেচেন বললেন! আপনার কাছে তাদের পরিচয় নেবো।

কি হবে নিয়ে?

মেয়েদের প্রতি আপনার ভয়ানক ঘৃণা। কৃতজ্ঞতার ঋণ তারা কি দিয়ে শোধ করে আপনার কাছে বসে তার গল্প শুনবো।

রাখাল বলিল, গল্প করবার সময় নেই, আমার কাজ আছে।

সারদা বলিল, কাজ আমারও আছে। কিন্তু আমার ঘরে যদি আজ না যান, কাল শুনতে পাবেন সারদারা অনেক ছিল না, সংসারে কেবল একটিই ছিল।

তাহার কণ্ঠস্বরের আকস্মিক পরিবর্তনে রাখাল স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহার মনে পড়িল সেই প্রথম দিনটির কথা—যেদিন সারদা মরিতে বসিয়াছিল।

সারদা জিজ্ঞাসা করিল, বলুন কি করবেন?

রাখাল কহিল, থাক কাজ। চলো তোমার ঘরে যাই।

পনর

সারদার ঘরে আসিয়া রাখাল বিছানায় বসিল, জিজ্ঞাসা করিল, ডেকে আনলে কেন?

সারদা বলিল, যাবার আগে আর একবার আপনার পায়ের ধুলো আমার ঘরে পড়বে বলে।

ধুলো ত পড়লো, এবার উঠি?

এতই তাড়া? দুটো কথা বলবারও সময় দেবেন না?

সে-দুটো কথা ত অনেকবার বলেছো সারদা। তুমি বলবে দেব্‌তা, আপনি আমার প্রাণ রক্ষে করেচেন, কুড়ি-পঁচিশটে টাকা দিয়ে চাল-ডাল কিনে দিয়েছেন, নতুন-মাকে বলে বাকি বাড়িভাড়া মাফ করিয়ে দিয়েছেন, আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, যতদিন বাঁচবো, আপনার ঋণ পরিশোধ করতে পারবো না। এর মধ্যে নতুন কিছু নেই। তবু যদি যাবার পূর্বে আর একবার বলতে চাও বলে নাও। কিন্তু একটু চটপট করো, আমার বেশি সময় নেই।

সারদা কহিল, কথাগুলো নতুন না হোক ভারী মিষ্টি। যতবার শোনা যায় পুরোনো হয় না—ঠিক না দেব্‌তা?

হাঁ ঠিক। মিষ্টি কথা তোমার মুখে আরো মিষ্টি শুনোয়, আমি অস্বীকার করিনে। সময় থাকলে বসে বসে শুনতুম। কিন্তু সময় হাতে নেই। এখুনি যেতে হবে।

গিয়ে রাঁধতে হবে?

হাঁ।

তারপরে খেয়ে শুতে হবে?

হাঁ।

তারপরে চোখে ঘুম আসবে না, বিছানায় পড়ে সারা রাত ছটফট করতে হবে,—না দেব্‌তা?

এ তোমাকে কে বললে?

কে বললে জানেন? যে-সারদা সংসারে কেবল একটিই আছে অনেক নেই,—সে-ই।

রাখাল বলিল, তা হলে সে-সারদাও তোমাকে ভুল বলেছে। আমি এমন কোন অপরাধ করিনে যে, দুশ্চিন্তায় বিছানায় পড়ে ছটফট করতে হয়। আমি শুই আর ঘুমোই। আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।

সারদা কহিল, বেশ আর ভাববো না। আপনার কথাই শুনবো, কিন্তু আমিই বা কোন্ অপরাধ করেছি যার জন্যে ঘুমোতে পারিনে—সারারাত জেগে কাটাই?

সে তুমিই জানো।

আপনি জানেন না?

না। পৃথিবীতে কোথায় কার ঘুমের ব্যাঘাত হচ্চে এ জানা সম্ভবও নয়, সময়ও নেই।

সময় নেই—না? এই বলিয়া সারদা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল, বলিল, আচ্ছা দেব্‌তা, আপনি এত ভীতু মানুষ কেন? কেন বলচেন না, সারদা, হরিণপুরে তোমার যাওয়া হবে না। নতুন-মার ইচ্ছে হয় তিনি যান, কিন্তু তুমি যাবে না। তোমার নিষেধ রইলো। এইটুকু বলা কি এতই শক্ত?

ইহার উত্তরে কি বলা উচিত রাখাল ভাবিয়া পাইল না, তাই কতকটা হতবুদ্ধির মতোই কহিল, তোমরা স্থির করেচো যাবে, খামকা আমি বারণ করতে যাবো কিসের জন্যে?

সারদা কহিল, কেবল এই জন্যে যে, আপনার ইচ্ছে নয় আমি যাই। এই ত সবচেয়ে বড় কারণ দেব্‌তা।

না, কোন-একজনের খেয়ালটাকেই কারণ বলে না। তোমাকে নিষেধ করার আমার অধিকার নেই।

সারদা কহিল, হোক খেয়াল, সেই আপনার অধিকার। বলুন মুখ ফুটে, সারদা হরিণপুরে তুমি যেতে পাবে না।

রাখাল মাথা নাড়িয়া জবাব দিল, না, অন্যায় অধিকার আমি কারো 'পরেই খাটাই নে।

রাগ করে বলছেন না ত?

না, আমি সত্যিই বলচি।

সারদা তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপরে বলিল, না, এ সত্যি নয়,—কোনমতেই সত্যি নয়। আমাকে বারণ করুন দেব্‌তা, আমি মাকে গিয়ে বলে আসি, আমার হরিণপুরে যাওয়া হবে না, দেব্‌তা নিষেধ করেছেন।

ইহারও প্রত্যুত্তরে রাখাল মূঢ়ের মতো জবাব দিল, না, তোমাকে নিষেধ করতে আমি পারবো না। সে অধিকার আমার নেই।

সারদা বলিল, ছিল অধিকার। কিন্তু এখন এই কথাই বলবো যে, চিরদিন কেবল পরের হুকুম মেনে মেনে আজ নিজে হুকুম করার শক্তি হারিয়েছেন। এখন বিশ্বাস গেছে ঘুচে, ভরসা গেছে নিজের 'পরে। যে লোক দাবী করতে ভয় পায়, পরের দাবী মেটাতেই তার জীবন কাটে। শুভাকাঙ্ক্ষিণী সারদার এই কথাটা মনে রাখবেন।

এ তুমি কাকে বলচো? আমাকে?

হাঁ, আপনাকেই।

রাখাল কহিল, পারি মনে রাখবো; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমাকে বারণ করায় আমার লাভ কি? এ যদি বোঝাতে পারো হয়তো এখনও তোমাকে সত্যিই বারণ করতে পারি।

সারদা বলিল, স্বেচ্ছায় আপনার বশ্যতা স্বীকার করতে একজনও যে সংসারে আছে, এই সত্যিটা জানতেও কি ইচ্ছে করে না?

জেনে কি হবে?

সারদা তাহার মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, হয়তো কিছুই হবে না। হয়তো আমারও সময় এসেছে বোঝবার। তবু একটা কথা বলি দেব্‌তা, অকারণে নির্মম হতে পারাটাই পুরুষের পৌরুষ নয়।

রাখাল জবাব দিল, সে আমিও জানি। কিন্তু অকারণে অতি-কোমলতাও আমার প্রকৃতি নয়। এই বলিয়া সে কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া অধিকতর রুক্ষকণ্ঠে কহিল, দেখো সারদা, হাসপাতালে যেদিন তোমার চৈতন্য ফিরে এলো, তুমি সুস্থ হয়ে উঠলে, সেদিনের কথা মনে পড়ে কিছু? তুমি ছলনা করে জানালে তুমি অল্পশিক্ষিত সহজ সরল পল্লীগ্রামের মেয়ে, নিঃস্ব ভদ্রঘরের বৌ। বললে, আমি না বাঁচালে তোমার বাঁচার উপায় নেই। তোমাকে অবিশ্বাস করিনি। সেদিন আমার সাধ্যে যেটুকু ছিল অস্বীকারও করিনি। কিন্তু আজ সে-সব তোমার হাসির জিনিস। তাদের অবহেলায় ফেলে দিলে। আজ এসেচেন বিমলবাবু—ঐশ্বর্যের সীমা নেই যাঁর—এসেচে তারক, এসেচেন নতুন-মা। সেদিনের কিছুই বাকি নেই আর। এ ছলনার কি প্রয়োজন ছিল বল ত?

অভিযোগ শুনিয়া সারদা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। তার পরে আস্তে আস্তে বলিল, আমার কথায় মিথ্যে ছিল, কিন্তু ছলনা ছিল না দেব্‌তা। সে মিথ্যেও শুধু মেয়েমানুষ বলে। তার লজ্জা ঢাকতে। একেই যখন আমার চরিত্র বলে আপনিও ভুল করলেন তখন আর আমি ভিক্ষে চাইবো না। কাল মা আমাকে কিছু টাকা দিয়েছেন জিনিসপত্র কিনতে। আমার কিন্তু দরকার নেই। যে টাকাগুলো আপনি দিয়েছিলেন সে কি ফিরিয়ে দেবো?

রাখাল কঠিন হইয়া বলিল, তোমার ইচ্ছে। কিন্তু পেলে আমার সুবিধে হয়। আমি বড়লোক নই সারদা, খুবই গরীব সে তুমি জানো।

সারদা বালিশের তলা হইতে রুমাল বাঁধা টাকা বাহির করিয়া গণিয়া রাখালের হাতে দিয়া বলিল, তা হলে এই নিন। কিন্তু টাকা দিয়ে আপনার ঋণ পরিশোধ হয় এত নির্বোধ আমি নই। তবু বিনা দোষে যে দণ্ড আমাকে দিলেন সে অন্যায় আর একদিন আপনাকে বিঁধবে। কিছুতে পরিত্রাণ পাবেন না বলে দিলুম।

রাখাল কহিল, আর কিছু বলবে?

না।

তা হলে যাই। রাত হয়েছে।

প্রণাম করিতে গিয়া সারদা হঠাৎ তাহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তার পরে নিজেই চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

চললুম।

সারদা বলিল, আসুন।

পথে বাহির হইয়া রাখাল ভাবিয়া পাইল না এইমাত্র সে পুরুষের অযোগ্য যে-সকল মান-অভিমানের পালা সাঙ্গ করিয়া আসিল সে কিসের জন্য! কিসের জন্য এই-সব রাগারাগি? কি করিয়াছে সারদা? তাহার অপরাধ নির্দেশ করাও যেমন কঠিন, তাহার নিজের জ্বালা যে কোন্‌খানে, অঙ্গুলি সঙ্কেতও তেমনি শক্ত। রাখালের অন্তর আঘাত করিয়া তাহাকে বারে বারে বলিতে লাগিল, সারদা ভদ্র, সারদা বুদ্ধিমতী, সারদার মতো রূপ সহজে চোখে পড়ে না। সারদা তাহার কাছে কত যে কৃতজ্ঞ তাহা বহুবার বহুপ্রকারে জানাইতে বাকি রাখে নাই। পায়ের 'পরে মাথা পাতিয়া আজও জানাইতে সে ক্রুটি করে নাই। আরও একটা কি যেন সে বারংবার আভাসে জানায় হয়তো, তাহার অর্থ শুধু কৃতজ্ঞতাই নয়, হয়তো সে আরও গভীর আরও বড়। হয়তো সে ভালোবাসা। রাখালের মনের ভিতরটা সংশয়ে দুলিয়া উঠিল। বহুদিন বহু নারীর সংস্পর্শে সে বহুভাবে আসিয়াছে, কিন্তু কোন মেয়ে কোনদিন তাহাকে ভালোবাসিয়াছে, এ-বস্তু এমনি অভাবিত যে, সে

আজ প্রায় অসম্ভবের কোঠায় গিয়া উঠিয়াছে। আজ সেই বস্তুই কি সারদা তাহাকে দিতে চায়? কিন্তু গ্রহণ করিবে সে কোন্ লজ্জায়? সারদা বিধবা, সারদা নিন্দিত কুলত্যাগিনী, এ প্রেমে না আছে গৌরব, না আছে সম্মান। নিজেকে সে বুঝাইয়া বলিতে লাগিল, আমি গরীব বলেই তো কাঙালবৃত্তি নিতে পারিনে। অন্নাভাব হয়েছে বলে পথের উচ্ছিষ্ট তুলে মুখে পুরবো কেমন করে? এ হয় না—এ যে অসম্ভব।

তথাপি বুকের ভিতরটায় কেমন যেন করিতে থাকে। তথায় কে যেন বারবার বলে, বাহিরের ঘটনায় এমনিই বটে; কিন্তু যে অন্তরের পরিচয় সেই প্রথম দিন হইতে সে নিরন্তর পাইয়াছে সে-বিচারের ধারা কি ওই আইনের বই খুলিয়া মিলিবে? যে মেয়েদের সংসর্গে তাহার এতকাল কাটিল সেখানে কোথায় সারদার তুলনা? অকপট নারীত্বের এতবড় মহিমা কোথায় খুঁজিয়া মিলিবে? অথচ সেই সারদাকেই আজ সে কেমন করিয়াই না অপমান করিয়া আসিল।

বাসায় পৌঁছিয়া দেখিল ঝি তখনো আছে। একটু আশ্চর্য হইয়াই জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যাওনি এখনো?

ঝি কহিল, না দাদা, ও-বেলায় তোমার মোটে খাওয়া হয়নি, এ-বেলায় সমস্ত যোগাড় করে রেখেচি, পোয়াটাক মাংস কিনেও এনেচি—সব গুছিয়ে দিয়ে তবে ঘরে যাবো।

সকালে সত্যই খাওয়া হয় নাই, মাছি পড়িয়া বিঘ্ন ঘটিয়াছিল, কিন্তু রাখালের মনে ছিল না। ইতিপূর্বেও এমন কতদিন হইয়াছে, তখন সকালের স্বল্পাহার রাত্রের ভূরিভোজনের আয়োজনে এই ঝি-ই পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। নূতন নয়, অথচ তাহার কথা শুনিয়া রাখালের চোখ অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। বলিল, তুমি বুড়ো হয়েছো নানী, কিন্তু মরে গেলে আমার কি দুর্দশা হবে বল ত? জগতে আর কেউ নেই যে তোমার দাদাবাবুকে দেখবে।

এই স্নেহের আবেদনে ঝির চোখেও জল আসিল। বলিল, সত্যি কথাই ত। কিন্তু বুড়ো হয়েচি, মরবো না? কতদিন বলেচি তোমাকে, কিন্তু কান দাও না—হেসে উড়িয়ে দাও। এবার আর শুনবো না, বিয়ে তোমাকে করতেই হবে। দু'দিন বেঁচে থেকে চোখে দেখে যাবো, নইলে মরেও সুখ পাবো না দাদা।

রাখাল হাসিয়া বলিল, তা হলে সে সুখের আশা নেই নানী। আমার ঘরবাড়ি নেই, বাপ-মা, আপনার লোক নেই, মোটা-মাইনের চাকরি নেই, আমাকে মেয়ে দেবে কে?

ইস! মেয়ের ভাবনা? একবার মুখ ফুটে বললে যে কত গণ্ডা সম্বন্ধ এসে হাজির হবে।

তুমি একটা করে দাও না নানী।

পারিনে বুঝি? আমার হাতে লোক আছে, তাকে কালই লাগিয়ে দিতে পারি।

রাখাল হাসিতে লাগিল। বলিল, তা যেন দিলে; কিন্তু বৌ এসে খাবে কি বলো তো? খাবি খাবে নাকি!

ঝি রাগ করিয়া জবাব দিল, খাবি খেতে যাবে কিসের দুঃখে দাদা; গেরস্ত-ঘরে সবাই যা খায় সে-ও তাই খাবে। তোমাকে ভাবতে হবে না,—জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি।

সে ব্যবস্থা আগে ছিল নানী, এখন আর নেই। এই বলিয়া রাখাল পুনশ্চ হাসিয়া রান্নার ব্যাপারে মনোনিবেশ করিল। তাহার রান্না হয় কুকারে। শৌখিন মানুষ,—ছোট, বড়, মাঝারি নানা আকারের কুকার। আজ রান্না চাপিল বড়টায়। তিন-চারটে পাত্রে নানাবিধ তরকারি এবং মাংস। অনেকদিন ধরিয়া এ কাজ করিয়া ঝি পাকা হইয়া গেছে—বলিতে কিছুই হয় না।

ঠাঁই করিয়া, খাবার পাত্র সাজাইয়া দিয়া ঘরে ফিরিবার পূর্বে ঝি মাথার দিব্য দিয়া গেল পেট ভরিয়া খাইতে। বলিল, সকালে এসে যদি দেখি সব খাওনি, পড়ে আছে, তাহলে রাগ করবো বলে গেলুম।

রাখাল বলিল, তাই হবে নানী, পেট ভরেই খাবো। আর যা-ই করি তোমাকে দুঃখ দেবো না।

ঝি চলিয়া গেলে রাখাল ইজি-চেয়ারটায় শুইয়া পড়িল। খাবার তৈরির প্রায় ঘণ্টা-দুই দেরি, এই সময়টা কাটাইবার জন্য সে একখানা বই টানিয়া লইল, কিন্তু কিছুতেই মন দিতে পারে না, মনে পড়ে সারদাকে। মনে পড়ে নিজের অকারণ অধীরতা। আপনাকে সংবরণ করিতে পারে নাই, অন্তরের ক্রোধ ও ক্ষোভের জ্বালা কদর্য রূঢ়তায় বারে বারে ফাটিয়া বাহির হইয়াছে,—ছেলেমানুষের মতো। বুদ্ধিমতী সারদার কিছুই বুঝিতে বাকি নাই। এমন করিয়া নিজেকে ধরা দিবার কি আবশ্যক ছিল? কি আবশ্যক ছিল নিজেকে ছোট করার? মনে মনে লজ্জার অবধি রহিল না, ইচ্ছা করিল, আজিকার সমস্ত ঘটনা কোনমতে যদি মুছিয়া ফেলিতে পারে।

নিজের জীবনের যে কাহিনী সারদা আজও কাহাকে বলিতে পারে নাই, বলিয়াছে শুধু তাহাকে। সেই অকপট বিশ্বাসের প্রতিদান কি পাইল সে? পাইল শুধু অশ্রদ্ধা ও অকারণ লাঞ্ছনা। অথচ, ক্ষতি তাহার কি করিয়াছিল সে? একটা কথারও প্রতিবাদ করে নাই সারদা, শুধু নিরুত্তরে সহ্য করিয়াছে। নিরুপায় রমণীর এই নিঃশব্দ অপমান এতক্ষণে ফিরিয়া আসিয়া যেন তাহাকেই অপমান করিল। উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া রাখাল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, থাক আমার রান্না—এই রাত্রেই ফিরে গিয়ে আমি তার ক্ষমা চেয়ে আসবো। তাকে স্পষ্ট করে বলবো কোথায় আমার জ্বালা, কোথায় আমার ব্যথা ঠিক জানিনে সারদা, কিন্তু যে-সব কথা তোমাকে বলে গেছি সে-সব সত্যি নয়, সে একেবারে মিথ্যে।

কুকারের খাবার ফুটিতে লাগিল, ঘরের আলো জ্বলিতে লাগিল, গায়ের চাদরটা টানিয়া লইয়া সে দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল।

এ বাটীতে পৌঁছিতে বেশী বিলম্ব হইল না। সোজা সারদার ঘরের সম্মুখে আসিয়া দেখিল তালা ঝুলিতেছে, সে নাই। উপরে উঠিয়া সম্মুখেই চোখে পড়িল দুখানা চেয়ারে মুখোমুখি বসিয়া বিমলবাবু ও সবিতা। গল্প চলিতেছে। তাহাকে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইয়াই প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি এতক্ষণ এ-বাড়িতেই ছিলে রাজু?

না মা, বাসায় গিয়েছিলাম।

বাসা থেকে আবার ফিরে এলে? কেন?

রাখাল চট্ করিয়া জবাব দিতে পারিল না। পরে বলিল, একটু কাজ আছে মা। ভাবলাম তারকের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি, একবার দেখা করে আসি। কাল ত আর সময় পাওয়া যাবে না।

না, আমরা সকালেই রওনা হবো।

বিমলবাবু বলিলেন, তারক কি ফিরেচে?

সবিতা কহিলেন, না। ছেলেটা কি যে এত আমাদের জন্য কিনচে আমি ভেবে পাইনে।

বিমলবাবু এ কথার জবাব দিলেন। বলিলেন, সে জানে তার অতিথি সামান্য ব্যক্তি নয়। তাঁর মর্যাদার উপযুক্ত আয়োজন তার করা চাই।

সবিতা হাসিয়া কহিলেন, তাহলে তার উচিত ছিল তোমার কাছে ফর্দ লিখিয়ে নিয়ে যাওয়া।

শুনিয়া বিমলবাবুও হাসিলেন, বলিলেন, আমার ফর্দ তার সঙ্গে মিলবে কেন নতুন-বৌ? ও যার যা আলাদা। তবেই মন খুশী হয়।

এ আলোচনায় রাখাল যোগ দিতে পারিল না, হঠাৎ মনের ভিতরটা যেন জ্বলিয়া উঠিল। খানিক পরে নিজেকে একটু শান্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সারদাকে ত তার ঘরে দেখলাম না নতুন-মা?

সবিতা বলিলেন, আজ কি তার ঘরে থাকবার জো আছে বাবা! তারক খাবে, বামুন-ঠাকুরকে সরিয়ে দিয়ে সে দুপুরবেলা থেকেই এক-রকম রাঁধতে লেগেছে। কত কি যে তৈরি করচে তার ঠিকানা নেই।

বিমলবাবু বলিলেন, সে আমাকেও যে খেতে বলেছে নতুন-বৌ।

তোমারও নেমন্তন্ন নাকি?

হাঁ, তুমি ত কখনো খেতে বললে না, কিন্তু সে আমাকে কিছুতেই যেতে দিলে না।

আজ তাই বুঝি বসে আছো এতক্ষণ? আমি বলি বুঝি আমার সঙ্গে কথা কইবার লোভে। বলিয়া সবিতা মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

বিমলবাবুও হাসিয়া বলিলেন, মিথ্যে কথা ধরা পড়ে গেলে খোঁটা দিতে নেই নতুন-বৌ। ভারী পাপ হয়।

রাখাল মুখ ফিরাইয়া লইল। এই হাস্য-পরিহাসে আর একবার তাহার মনটা জ্বলিয়া উঠিল।

সবিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, সারদা তোমাকে খেতে বলেনি রাজু?

না, মা।

সবিতা অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, তাহলে বুঝি ভুলে গেছে। এই বলিয়া তিনি নিজেই সারদাকে ডাকিতে লাগিলেন। সে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার রাজুকে খেতে বলোনি সারদা?

না মা, বলিনি।

কেন বলোনি? মনে ছিল না বুঝি?

সারদা চুপ করিয়া রহিল।

সবিতা বলিলেন, মনেই ছিল না রাজু; কিন্তু এ ভুলও অন্যায়।

রাখাল কহিল, মনে না-থাকা দুর্ভাগ্য হতে পারে নতুন-মা, কিন্তু তাকে অন্যায় বলা চলে না। সারদা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাসায় ফিরে গিয়ে এখন বুঝি আপনাকে রাঁধতে হবে? বললাম, হাঁ। প্রশ্ন করলেন, তারপর খেতে হবে? বললাম, হাঁ। কিন্তু এর পরেও আমাকে খেতে বলার কথা ওঁর মনেই এলো না। কিন্তু এটা জেনে রাখবেন নতুন-মা, এ মনে না-থাকা ন্যায়-অন্যায়ের অন্তর্গত নয়, চিকিৎসার অন্তর্গত। এই বলিয়া রাখাল নীরস হাস্যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ মিশাইয়া জোর করিয়া হাসিতে লাগিল।

সবিতা কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। সারদা তেমনি নিঃশব্দেই দাঁড়াইয়া রহিল।

রাখাল মনে মনে বুঝিল অন্যায় হইতেছে, তাহার কথা মিথ্যা না হইয়াও মিথ্যার বেশি দাঁড়াইতেছে, তবু থামিতে পারিল না। বলিল, তারক এখানে এলেও আমার সঙ্গে দেখা করে না। সারদা বলেন তাঁর সময়াভাব। সত্যি হতেও পারে, তাই সময় করে আমিই দেখা করতে এলাম, খেতে আসিনি নতুন-মা।

একটু থামিয়া বলিল, সারদার হয়তো সন্দেহ আমাকে তারক পছন্দ করে না, আমার সঙ্গে খেতে বসা তার ভালো লাগবে না। দোষ দিতে পারিনে মা, তারক এখানে অতিথি, তার সুখ-সুবিধেই আগে দেখা দরকার।

সারদা তেমনি নির্বাক্। সবিতা ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, তারক অতিথি, কিন্তু তুমি যে আমার ঘরের ছেলে রাজু। আমি অসুবিধে কারো ঘটাতে চাইনে, যার যা ইচ্ছে করুক, কিন্তু আমার ঘরে আমার কাছে বসে আজ তুমি খাবে।

রাখাল মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিল, না, সে হয় না। কহিল, আমার বুড়ো নানী বেঁচে থাক, আমার কুকার অক্ষয় হোক, তার সিদ্ধ রান্নাই আমার অমৃত, বড়ঘরের বড়রকমের খাওয়ায় আমার লোভ নেই নতুন-মা।

সবিতা বলিলেন, লোভের জন্যে বলিনে রাজু, কিন্তু না খেয়ে আজ যদি তুমি চলে যাও, দুঃখের আমার সীমা থাকবে না। এ তোমাকে বললুম।

অপরাধ ঢের বেশি বাড়িয়া গেল, রাখাল নির্মম হইয়া কহিল, বিশ্বাস হয় না নতুন-মা। মনে হয় এ শুধু কথার কথা, বলতে হয় তাই বলা। কে আমি, যে আমি না খেয়ে গেলে আপনার দুঃখের সীমা থাকবে না? কারো জন্যেই আপনার দুঃখবোধ নেই। এই আপনার প্রকৃতি।

দুঃসহ বিস্ময়ে সবিতার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল, বলো কি রাজু?

কেউ বলে না বলেই বললাম নতুন-মা। আপনার সৌজন্য, সহৃদয়তা, আপনার বিচারবুদ্ধির তুলনা নেই। আর্তের পরম বন্ধু আপনি, কিন্তু দুঃখীর মা আপনি নয়। দুঃখবোধ শুধু আপনার বাইরের ঐশ্বর্য, অন্তরের ধন নয়। তাই যেমন সহজে গ্রহণ করেন, তেমনি অবহেলায় ত্যাগ করেন। আপনার বাধে না।

বিমলবাবু বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে স্তব্ধভাবে চাহিয়া রহিলেন।

রাখাল বলিল, আপনি আমার অনেক করেছেন নতুন-মা, সে আমি চিরদিন মনে রাখবো। কেবল মুখের কথা দিয়ে নয়, দেহ-মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে। আপনার সঙ্গে আর বোধ করি আমার দেখা হবে না। হয় এ ইচ্ছাও নেই। কিন্তু নিজের যদি কিছু পুণ্য থাকে তার বদলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই, এবার যেন আপনাকে তিনি দয়া করেন—অজানার মধ্যে থেকে জানার মধ্যে এবার যেন তিনি আপনাকে স্থান দেন। শেষের দিকে হঠাৎ তাহার গলাটা ধরিয়া আসিল।

সবিতা একদৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়াছিলেন, কথা শুনিয়া রাগ করিলেন না, বরং গভীর স্নেহের সুরে বলিলেন, তাই হোক রাজু, ভগবান যেন তোমার প্রার্থনাই মঞ্জুর করেন। আমার অদৃষ্টে যেন তাই ঘটতে পায়।

চললাম নতুন-মা।

সবিতা উঠিয়া আসিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া বলিলেন, রাজু, কিছু কি হয়েছে বাবা?

কি হবে নতুন-মা?

এমন কিছু যা তোমাকে আজ এমন চঞ্চল করেছে! তুমি ত নিষ্ঠুর নও—কটু কথা বলা ত তোমার স্বভাব নয়!

প্রত্যুত্তরে রাখাল হেঁট হইয়া শুধু তাঁহার পায়ের ধূলা লইল, আর কিছু বলিল না। চলিতে উদ্যত হইলে বিমলবাবু বলিলেন, রাজু, বিশেষ পরিচয় নেই দু'জনের, কিন্তু আমাকে বন্ধু বলেই জেনো।

রাখাল ইহারও জবাব দিল না, ধীরে ধীরে নীচে চলিয়া গেল। কালকের মতো আজও সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া ছিল সারদা। কাছে আসিতেই মৃদুকণ্ঠে কহিল, দেব্‌তা?

কি চাও তুমি?

বলেছিলেন অনেক সারদার মধ্যে আমিও একজন। হয়তো আপনার কথাই সত্যি।

সে আমি জানি।

সারদা বলিল, নানাভাবে দয়া করে আমাকে বাঁচিয়েছিলেন বলেই আমি বেঁচেছিলুম। আপনি অনেকের অনেক করেন, আমারও করেছিলেন, তাতে ক্ষতি আপনার হয়নি। বেঁচে যদি থাকি এইটুকুই কেবল জেনে রাখতে চাই।

রাখাল এ প্রশ্নের উত্তর দিল না, নীরবে বাহির হইয়া গেল।

[অসমাপ্ত]

মতো আজও সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া ছিল সারদা। কাছে আসিতে মৃদুকণ্ঠে কহিল, দেব্‌তা ?

কি চাও তুমি ?

বলেছিলেন অনেক সারদার মধ্যে আমিও একজন। হয়ত আপনার কথাই সত্যি।

সে আমি জানি।

সারদা বলিল, নানাভাবে দয়া করে আমাকে বাঁচিয়ে ছিলেন বলেই আমি বেঁচেছিলুম। আপনি অনেকের অনেক করেন, আমারও করেছিলেন তাতে ক্ষতি আপনার হয়নি। বেঁচে যদি থাকি এইটুকুই কেবল জেনে রাখতে চাই।

রাখাল এ প্রশ্নের উত্তর দিলনা, নীরবে বাহির হইয়া গেল।

১৬

পরদিন সকাল বেলায় হরিণপুর যাত্রার আয়োজন যখন সম্পূর্ণ, সবিতা সারদাকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমার বাক্স বিছানা এইবেলা উপরে পাঠিয়ে দাও সারদা, সমস্ত মালপত্র তারক লিষ্ট্ করে নিচ্চে।

সারদা কুন্ঠিত হইয়া কহিল, আমার বাক্স বিছানা যাবেনা মা।

একটি নিচু টুলে বসিয়া তারক নোটবুকের পৃষ্ঠায় দ্রুতহস্তে মালপত্রের ফর্দ্দ লিখিয়া লইতেছিল। সারদার উত্তর তাহার কানে পৌঁছিল। অবনত মুখ উঁচু করিয়া তারক বিস্মিতস্বরে বলিল, বাক্স বিছানা যাবেনা কি রকম !!

সবিতাও বিস্মিত হইয়াছিলেন। নিম্নস্বরে বলিলেন, সঙ্গে নেওয়ার মত বাক্স বিছানা কি তোমার নেই সারদা? তা'হলে আগে বললেনা কেন, বন্দোবস্ত করতাম।

ম্লান হাসিয়া সারদা বলিল, বিছানা আমার পুরানো এবং ছেঁড়াও বটে, তা'হলেও সেগুলো সঙ্গে নিতে লজ্জা ছিলনা। হরিণপুরে আমার যাওয়া হবেনা মা।

তারক ও সবিতা প্রায় এক সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন,—সে কি ?

সারদা শুষ্ক হাসিয়া বলিল, আমার কোথাও নড়বার উপায় নেই। নইলে মাকে সেবা করার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে এই শূন্যপুরীতে একলা পড়ে থাকার দণ্ড আমি ভোগ করতামনা।

নির্ব্বাক সবিতা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সারদার মুখের পানে তাকাইয়া কি-যেন খুঁজিতে লাগিলেন।

তারক উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, কি রকম! কালও নতুন-মার সঙ্গে আপনি হরিণপুরে যেতে প্রস্তুত ছিলেন, আর আজ সকালেই এ বাড়ী ছেড়ে নড়বার উপায় নেই স্থির করে ফেললেন! না, ওসব বাজে ওজর চলবেনা, কোনও মেয়েছেলে সঙ্গে না গেলে সেই পাড়াগাঁয়ে একলাটি নতুন-মা—না না, সে হতেই পারেনা।

সারদা বিষণ্ণকণ্ঠে কহিল, আমি সত্যিই বলছি তারকবাবু, আমার যাবার উপায় নেই। এ বাজে ওজর নয়।

অবিশ্বাসপূর্ণকণ্ঠে তারক প্রশ্ন করিল, কেন শুনি? এখানে আপনার কি কাজ?

সারদা স্থিরনেত্রে পাষাণ প্রতিমার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল, কোনও জবাব দিল না।

কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া তারক কহিল,—জবাব দিচ্ছেন না যে?

সারদা তথাপি নিরুত্তর রহিল।

তারক হতাশভাবে হাতের নোটবুক্‌খানি ঘরের মেঝেতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, তা'হলে আর কি করে দুপুরের ট্রেণে আপনার যাওয়া হবে নতুন-মা? মেয়ে ছেলে কেউ সঙ্গে না থাকলে সেই পাড়াগাঁয়ে নির্বান্ধব স্থানে একলাটি টিঁকতে পারবেন কেন?

সবিতা এতক্ষণ কথা কহেন নাই। মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তারক, গাঁয়ে আমার জন্ম, জীবনের বেশিভাগ গাঁয়েই কেটেছে, সেখানে আমার কষ্ট হবেনা।

রুক্ষচোখে সারদার পানে তাকাইয়া তারক বিদ্রূপস্বরে বলিল, কে সে মাতব্বর লোকটি জানতে পারি কি? যাঁর বিনা হুকুমে আপনি নতুন-মার সঙ্গেও এ বাড়ী ছেড়ে যেতে পারেন না? রাখালবাবু নিশ্চয়ই নয়?—

তারকের অসংযত উক্তিতে সারদার মুখ অপমানে রাঙা হইয়া উঠিল। অন্য দিক পানে স্থিরনেত্রে তাকাইয়া শান্তকণ্ঠে বলিল, যিনি আমাকে এই বাড়ীতে রেখে গেছেন। তাঁর বিনা হুকুমে অন্যত্র যাওয়া আমার সম্ভব নয় তারকবাবু! আপনি অকারণ রাগ করছেন।

সারদার উত্তরে সবিতা চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু তারক কণ্ঠস্বর অনেকখানিই নিম্নগ্রামে নামাইয়া বিস্ময়বিমিশ্র সুরে কহিল,—কিন্তু তিনি তো বহুদিন নিরুদ্দেশ।

সারদা তারকের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া সবিতার সামনে আসিয়া নত হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, মা, আর সকলে আমাকে ভুল বুঝুক, আপনি ভুল বুঝবেননা নিশ্চয় জানি।

সবিতা গভীরস্নেহে সারদার মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া আঙুল কয়টি আপন ওষ্ঠাধরে ঠেকাইলেন। অত্যন্ত গাঢ় অথচ মৃদুস্বরে বলিলেন, সোনাকে পিতল বলে চিরদিন কেউ ভুল করতে পারেনা সারদা। আজ না বুঝুক মা, একদিন সকলেই তোমাকে বুঝতে পারবে।

সারদার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল, কি যেন বলিতে গিয়াও বলিতে পারিলনা। অবনত মুখে প্রবল চেষ্টায় নিঃশব্দে অশ্রুসংবরণ করিতে লাগিল।

সবিতা সারদাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন,—তোমাকে কিচ্ছু বলতে হবেনা সারদা। আমার সঙ্গে না যেতে পারা তোমার যে কতবড় দুঃখ, আমি তা' জানি।

ট্রেণ ছাড়িবার ঘণ্টা দেড়েক পূর্ব্বে তারক ষ্টেশনে সবিতাকে লইয়া উপস্থিত হইল। মালপত্র গণিয়া, কুলি ঠিক করিয়া, পুরাতন দরওয়ান মহাদেবের হেফাজতে দেওয়া হইয়াছে। ব্রেক্‌ভ্যানের মালগুলি ওজনান্তে

রেলওয়ে কোম্পানীর দায়িত্বে অর্পণ করিয়া রসিদখানি সযত্নে পকেটে পুরিয়া তারক নিশ্চিন্তচিত্তে সেকেণ্ড্ ক্লাশ্ লেডীস্ ওয়েটিংরুমের সামনে আসিয়া ডাকিল—নতুন-মা—

সবিতা ঘরের ভিতর হইতে দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তারক রুমাল দিয়া কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিল, মালপত্র ওজন করে ব্রেকে দিয়ে রসিদ নিয়ে এলাম। এধারের ঝামেলা চুক্‌ল। এখন ট্রেণটা প্ল্যাটফর্ম্মে ঢুকলেই হয়। আপনাকে বিছানা পেতে বসিয়ে দিতে পারলে তবে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। সবিতা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, নতুন-মার পাছে হরিণপুরে যাওয়া না হয় এ জন্যে তোমার ভয় আর ভাবনার অন্ত নেই, না তারক ?

স্মিতমুখে তারক জবাব দিল, নিশ্চয়ই। যে পর্য্যন্ত না ছেলের কুঁড়েঘরে মায়ের পায়ের ধূলো পড়চে, ততক্ষণ নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করিনে মা !

ছাড়িবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের আধঘণ্টা পূর্ব্বে ট্রেণ প্ল্যাটফর্ম্মের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল।

ব্যতিব্যস্ত ভাবে তারক ওয়েটিংরুমের দ্বারে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, —নতুন-মা, বেরিয়ে আসুন। ট্রেণ এসে গেছে।

মহাদেব দরওয়ান্ ওয়েটিংরুমের বাহিরে কতকগুলি বাক্স বিছানার বাণ্ডিলের উপর বসিয়া খৈনি টিপিতেছিল। তাড়াতাড়ি খৈনি মুখে ফেলিয়া পাগড়ী ঠিক করিতে করিতে শশব্যস্তে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

আপাদমস্তক সিল্কের চাদর মণ্ডিতা সবিতা শিবুর-মা ঝি সহ ট্রেণ অভিমুখে তারকের অনুসরণ করিতে করিতে বলিলেন,—আমাকে তুমি ইণ্টার্ ক্লাসে মেয়েদের কামরায় তুলে দিও তারক। শিবুর-মাও আমার সঙ্গে থাকবে।

তারক থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি আপনার জন্য সেকেণ্ড্ ক্লাসের টিকিট্ কিনেচি নতুন-মা। ইণ্টার্ ক্লাসে অপরিস্কার জেনানা কম্পার্টমেণ্টের দুর্গন্ধের মধ্যে টিঁকতে পারবেন কেন?

সবিতা বলিলেন, কিন্তু, মেয়ে-কামরায় যাতায়াত করাই আমার অভ্যাস ছিল বাবা।

তারক বারংবার জিদ্ করিয়া একাধিক অসুবিধা ও কষ্টের অজুহাত দেখাইয়া দ্বিতীয় শ্রেণী কামরাতেই সবিতাকে উঠাইয়া দিল।

ছোট কামরা। তখনও পর্য্যন্ত অন্য কোনও আরোহী উঠে নাই। তারক ব্যস্তভাবে গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া নিজের ধুতির কোঁচা দিয়া প্ল্যাটফর্ম্মের দিকের বেঞ্চখানির ধূলা ঝাড়িয়া সযত্নে পরিস্কার বিছানা বিছাইয়া দিল। হাওড়া ষ্টেশন হইতে যাওয়া হইবে মাত্র বর্দ্ধমান। কিন্তু তারক যাত্রাপথের আয়োজন করিয়াছে দিল্লী বা লাহোর পর্য্যন্ত যাইতে হইলে যেমন করা উচিত।

সবিতা অন্যমনস্কচিত্তে বিছানার উপরে গিয়া বসিলেন। তারক হয়তো মনে মনে আশা করিতেছিল নতুন-মা তাহার এই সতর্কযত্ন ও সেবাসম্বন্ধে নিশ্চয় কিছু সস্নেহ অনুযোগ করিবেন। কিন্তু ধোপদস্ত ফর্সাধুতির কোঁচা বেঞ্চির ধূলিলিপ্ত হইয়া মলিন বর্ণ ধারণ করা সত্ত্বেও নতুন-মা একটিও কথা কহিলেননা ইহাতে তারকের মন অনেকখানিই ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িল। তথাপি মহা উৎসাহে সে উপরের বাঙ্কে ট্রাঙ্ক, হাতবাক্স, সুট্কেস্ প্রভৃতি সাজাইয়া রাখিল। বেঞ্চির নিচে ফলের টুক্‌রি ও অন্যান্য দ্রব্য সাবধানে সুরক্ষিত করিল। কুলিদের বিদায় দিয়া তারক সবিতার সামনে আসিয়া ক্লান্তকণ্ঠে কহিল, আপনি একটু বসুন নতুন-মা। আমি একগ্লাস লেমনেড্ বরফ দিয়ে নিয়ে আসি আপনার জন্যে। কিংবা একপ্লেট্ আইস্‌ক্রিম্ নিয়ে আসি, কি বলেন?

সবিতা এতক্ষণ বাহিরে জনাকীর্ণ প্ল্যাটফর্মের পানে উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি মেলিয়া তাকাইয়া ছিলেন। তারকের কথায় যেন সংবিৎ ফিরিয়া পাইলেন।

ব্যস্তস্বরে বলিলেন, না তারক, কিছুই আনতে হবেনা। তেষ্টা আমার পায়নি।

তারক সে নিষেধে কর্ণপাত না করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, বাঃ, তা কি হয়? তেষ্টা পায়নি বললে শুনবো কেন নতুন-মা? মুখ আপনার কি রকম শুখিয়ে উঠেছে সে তো দেখতেই পাচ্ছি—

সবিতা মৃদুহাসিয়া শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, লেমনেড্ সোডা বা আইস্‌ক্রিম্ ও-সব আমি কখনও খাইনে। ট্রেণে জলস্পর্শ করাও জীবনে কোনও দিন ঘটেনি। তুমি ব্যস্ত হয়ে অনর্থক ওসব কিনে এনোনা বাবা।

সকল বিষয়ে প্রতিবাদ করা এবং নিজের ইচ্ছাকে অপরের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার বিরুদ্ধে তর্কযুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করাই তারকের প্রকৃতি। কিন্তু নতুন-মার এই কণ্ঠস্বর তাহাকে কোনোটাতেই প্রবৃত্ত হইতে ভরসা দিলনা। সুতরাং সে মনে মনে দুঃখ অপেক্ষা অস্বস্তিই অনুভব করিতে লাগিল বেশি।

প্ল্যাটফর্মের কর্ম্মব্যস্ত জনতায় নিবদ্ধদৃষ্টি সবিতার চক্ষুর্দ্বয় অকস্মাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দূরে বিমলবাবুকে আসিতে দেখা গেল। প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি, পদক্ষেপ ঈষৎ দ্রুত। ট্রেণের কামরাগুলির মধ্যে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন। দেখিতে দেখিতে সবিতার মুখ চোখ আনন্দের স্নিগ্ধ কিরণে ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

বিমলবাবু প্রসন্নহাস্যে সবিতার কামরার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তারক তাড়াতাড়ি প্ল্যাটফর্মে লাফাইয়া পড়িয়া পুলকিত কণ্ঠে কহিল,

এই যে আপনি ষ্টেশনেই এসেছেন দেখচি। আমরা আশা করেছিলাম বাড়ীতেই দেখা করতে আসবেন। ট্রেণ টাইম্ পর্য্যন্ত এলেননা দেখে কিন্তু ভাবনা হয়েছিল।

বিমলবাবু সবিতার মুখের পানে দৃষ্টিস্থাপন করিয়া শান্তকণ্ঠে তারককে প্রশ্ন করিলেন—তোম—রা মানে?

বিমলবাবুর প্রশ্নে তারক সবিতার দিকে চাহিয়া হঠাৎ লজ্জায় অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। কথাটা বহুবচনে না বলিয়া একবচনে বলিলেই বোধহয় শোভন হইত। ছিঃ, নতুন-মা হয়তো কি মনে করিলেন!

কিন্তু তারককে এ লজ্জা হইতে পরিত্রাণ করিলেন নতুনমা-ই। স্নিগ্ধ হাসিয়া কহিলেন, তারক ঠিকই বলেচে। আজ সকাল বেলায় আমরা ওখানে তোমার আসা সম্ভব মনে করেছিলাম। সারদাও বল্‌ছিল তোমার কথা।

বিমলবাবু সবিতার কামরার মধ্যে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া বলিলেন, সারদা কোথায়?

সবিতা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তারক রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল,—হ্যাঁ, তিনি নাকি সহরের কলের জল ইলেক্‌ট্রীক্ আলো ছেড়ে পচা পাড়াগাঁয়ে বাস করতে যাবেন? তবে সেটা দয়া করে গোড়াতে বললেই ভাল করতেন, আমরা এতটা অসুবিধায় পড়তামনা।

বিমলবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, সারদা কি তোমাদের সঙ্গে হরিণপুরে যাচ্ছেনা?

সবিতা উদাস হাসিয়া নীরবে মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন সারদা আসিতে পারে নাই।

বিমলবাবু ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। বাম হাতখানি উল্টাইয়া মণিবন্ধে বাঁধা সোনার রিষ্ট্‌ওয়াচের পানে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া ব্যস্তস্বরে বলিলেন,

যথেষ্ট সময় আছে। এখনি মোটর নিয়ে গিয়ে সারদাকে তুলে আনি নতুন-বৌ। আমি গিয়ে বললে সে 'না' বলতে পারবেনা।

সবিতা বাধা দিয়া বলিলেন, তুমি অনুরোধ করলেও সে আসতে পারবেনা। শুধু তার দুঃখ বাড়বে মাত্র।

বিমলবাবু থমকিয়া দাঁড়াইয়া বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—তার মানে?

সবিতা বলিলেন, আর একদিন শুনো।

বিমলবাবু সবিতার মুখের পানে ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, ব্যাপারটা কি নতুন-বৌ?

সবিতা বলিলেন, তার আসার উপায় নেই দয়াময়! নইলে আমার সঙ্গে আসা থেকে আমি নিজেও তাকে নিবৃত্ত করতে পারতাম কিনা সন্দেহ। যাই হোক্, আমার আরও একটি অনুরোধ তোমার 'পরে রইলো। সারদা একা থাকলো, মধ্যে মধ্যে তুমি তার খোঁজ-খবর নিও।

সারদার ব্যবহারে তারক তার প্রতি এত বেশি অসন্তুষ্ট হইয়াছিল যে নতুন-মা সারদার অকৃতজ্ঞতার উল্লেখমাত্র না করিয়া বরং বিমলবাবুকে তার তদারক করিতে অনুরোধ করিলেন দেখিয়া মনে মনে জ্বলিয়া গেল। মনের বিরক্তি ইঁহাদের সম্মুখে পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে সেজন্য এখান হইতে সরিয়া যাইবার ইচ্ছায় বলিল, শিবুর-মা আর দরোয়ানটা ঠিক উঠেছে কিনা আমি একবার দেখে আসি নতুন-মা! এই বলিয়া অনাবশ্যক দ্রুতপদে অন্যদিকে চলিয়া গেল।

বিমলবাবু সবিতার পানে প্রশ্নসূচক দৃষ্টি মেলিয়া বলিলেন, কি হয়েছে বলো তো? তারককে একটু উত্তেজিত বলে মনে হচ্চে যেন।

সবিতা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, সারদা আমার সঙ্গে না আসায়

তারক তার উপরে বিষম অসন্তুষ্ট হয়েচে। ওর ধারণা আমি পল্লীগ্রামে নানা অসুবিধার মধ্যে যাচ্চি, সারদা সঙ্গে থাকলে হয়তো আমার অনেক সুবিধা হোতো।

বিমলবাবু বলিলেন, সেটা শুধু তারকই যে ভাবছে তা'তো নয়। আমিও যে ঠিক ওই ভাবনাই ভাবচি নতুন-বৌ!

সবিতা করুণ হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু আমি আজ ঠিক এর উল্টো ভাবনাই ভাবচি।

বিমলবাবু সবিতার মুখে এত করুণ হাসি পূর্ব্বে দেখেন নাই। তাঁহার বুকের ভিতরটা বেদনায় যেন মোচড় দিয়া উঠিল। সবিতার মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন, আমি কি শুনতে পাইনে নতুন-বৌ?

ক্লান্তকণ্ঠে সবিতা বলিলেন, সমস্ত কথাই তোমায় একদিন বলবো ভেবেচি। আর কেউই তো আমার এ' অন্তর্দাহ বুঝতে পারবেনা, বিশ্বাস করতেও হয়ত চাইবেনা। আমার অনেক জানবার আছে। এই তেরো বৎসর ধরে দিনের পর দিন রাতের পর রাত ক্রমাগত যে-প্রশ্ন আমার বুকের ভিতর আছ্‌ড়ে পিছ্‌ড়ে মরছে, আজও তার জবাব পাইনি। ভগবানের চরণে বারবার জানিয়েছি, ঠাকুর, তোমার অজানা তো কিছুই নেই। এতবড় নির্ম্মম জিজ্ঞাসা আমার জীবনে তুমিই পাঠিয়েছ। তার জন্যে তোমাকে অভিযোগ করবনা, শুধু এর সত্য উত্তরটাও তুমি এই জীবনে আমাকে দিয়ে দিও। এ'ছাড়া প্রার্থনার আর কিছুই তো রাখোনি! যত বৃহৎ দুঃখই দাওনা কেন, আমি তাকে তোমার হাতের দান বলে মেনে নিয়ে সোজা হয়েই চলতে পারতাম। কিন্তু, আমার জীবনে তো তুমি দুঃখ পাঠাওনি, পাঠিয়েচো শুধু তীব্র পরিহাস। মানুষের পরিহাস সওয়া কঠিন নয়, কিন্তু তোমার এ' নিষ্ঠুর পরিহাস যে সহ্য হয়না!

বিমলবাবুর আনন্দসৌম্য মুখে একটা কঠিন বেদনানুভূতির ছায়া নিবিড় হইয়া উঠিল। তিনি একটিও কথা কহিলেননা। অন্য একদিকে দৃষ্টি মেলিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সে দৃষ্টি যেন ইহলোক হইতে লোকান্তরে নিরুদ্দিষ্ট।

অনেক সময় কাটিয়া গেল। সবিতা অস্ফুট মৃদুস্বরে ডাকিলেন, —দয়াময়!—

বিমলবাবু ফিরিয়া চাহিয়া স্নেহস্নিগ্ধ গাঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন, নতুন-বৌ!—

সবিতা হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন। মুখে উদ্বেগ ও বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। বিমলবাবুর মুখের পানে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া সানুনয় কণ্ঠে কহিলেন, একটি কথা বলবো? বলো, কিছু মনে করবেনা?

বিমলবাবু সবিতার কথায় সহসা কোনও উত্তর দিতে পারিলেননা। অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, নতুন-বৌ, আজও তুমি "কিছু মনে করা"র ধাপ্ উত্তীর্ণ হয়ে উপরে উঠতে পারোনি, জানতাম না। কিন্তু থাক্ সে কথা, কি বলতে চাও বলো, কিছু মনে করবনা।

নতদৃষ্টি সবিতা বলিলেন, তুমি আমাকে নতুন-বৌ বলে ডেকোনা।

বিমলবাবু কিছুক্ষণ সবিতার পানে তাকাইয়া থাকিয়া শান্ত স্বরে বলিলেন, তাই হবে।

এবার মুখ তুলিয়া বিমলবাবুর পানে চাহিতে দেখা গেল সবিতার সুন্দর চোখ দুটি শিশিরসিক্ত পদ্মপাপ্‌ড়ির মত অশ্রুভারে টল্‌টল্ করিতেছে।

বিমলবাবুকে কি-একটা কথা বলিতে গিয়া বলিতে পারিলেননা বাধিয়া গেল। বিমলবাবু তাহা লক্ষ্য করিলেন।

প্ল্যাটফর্মের উপর হইতে কামরার মধ্যে উঠিয়া আসিয়া সবিতার সামনের বেঞ্চে বসিলেন। তারপরে স্নেহকোমল অথচ সম্ভ্রমপূর্ণ স্বরে

বলিলেন, তোমাকে নামধরে ডাকার অধিকার আমায় দিতে পারবে কি তুমি? সঙ্কোচ কোরোনা। যদি কোনও বাধা থাকে, একটুও আমি দুঃখিত হবনা জেনো। শুধু বলে দিও, কি-বলে ডাকলে তোমার মনে দুঃখ বাজবেনা বা স্মৃতির দাহ জেগে উঠবেনা। আমি তো বেশি কিছু জানিনে। হয়তো না জেনে আঘাত দিচ্চি তোমাকে।

সবিতা এবারে উদ্গত অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেননা, ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন। কি যেন একটা কথা বারংবার বলিবার চেষ্টা করিয়াও লজ্জায় ও দুঃখে কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিতে লাগিল।

বিমলবাবু আবার বলিলেন, কুণ্ঠিত হোয়ো না। বলো, কি বলে ডাকলে তুমি সহজে সাড়া দিতে পারবে?

সবিতা তথাপি নিরুত্তর রহিলেন। তারপরে বিপুল সঙ্কোচ প্রাণপণে ঠেলিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, আমাকে রেণুর মা বলে ডেকো।

বিমলবাবুর মুখে কোমল সহানুভূতির কারুণ্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—সত্যি! ভারী সুন্দর! আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি এই ভেবে, তোমার এতবড় পরিচয়টা এতদিন আমার মনে হয়নি কেন বলোতো?

সবিতা চুপ করিয়া রহিলেন।

বিমলবাবু আনন্দমধুর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, এ যে তুমি কত বড়ো দান আজ আমাকে দিলে, তা' হয়তো তুমি নিজেও জানোনা রেণুর মা! তোমার দেওয়া এই সম্মান এই বিশ্বাসের যেন মর্য্যাদা রাখতে পারি। আমার আর কোনও কামনা নেই।

বিমলবাবু হয়তো আরও কিছু বলিতেন, ট্রেণ ছাড়িবার সঙ্কেতসূচক দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িয়া গেল। হাতঘড়ির পানে চাহিয়া তিনি উঠিয়া

দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—যাই এবার। হরিণপুরে থাকতে যদি ভালো না লাগে, চলে আসতে দ্বিধা কোরনা যেন। তারক যদি পৌঁছে দিয়ে যেতে ছুটি না পায়, খবর দিও। রাজু গিয়ে নিয়ে আসবে। প্রয়োজন হলে আমিও যেতে পারি।

বিমলবাবু গাড়ী হইতে নামিয়া গেলেন। তারক দ্রুতপদে আসিতেছিল। হাতে এক গ্লাস বরফখণ্ডপূর্ণ রঙীন পানীয়। সিরাপ জিঞ্জার বা ঐরূপ কিছু। বিমলবাবুর হাতে গ্লাসটি তুলিয়া দিয়া বলিল, নতুন-মাকে তো একফোঁটা জলও মুখে দেওয়াতে পারলামনা। আপনিও যেন এটা রিফিউজ্ করবেননা।

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, দাও। গ্লাসটি বিমলবাবুর হাতে তুলিয়া দিয়া তারক পকেট হইতে কলাপাতা মোড়া পানের দোনা বাহির করিল।

শেষ ঘণ্টা পড়িয়া গার্ডের হুইস্ল্ শোনা গেল। সবিতা বলিয়া উঠিলেন, গাড়ী যে এখনি ছাড়বে তারক। উঠে এসো এইবার। তোমার এই অতিথিবাৎসল্যের মধ্যে আমি যে কি করে দিন কাটাবো তাই ভাবচি।

বিমলবাবু তাঁহার পানীয় তখনও শেষ করিতে পারেন নাই। হাসিতে গিয়া বিষম খাইলেন।

সবিতা ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন, আহা—

বিমলবাবু মুখ হইতে গ্লাসটি নামাইয়া সবিতার দিকে চাহিয়া এইবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

ট্রেণ তখন চলিতে সুরু করিয়াছে। নমস্কার! বলিয়া তারক চলন্ত ট্রেণে উঠিয়া পড়িল।

১৭

ব্রজবাবুর আপন ভাইপোরা এবং খুড়তুতো ছোট ভাই নবীনবাবু, যাঁহারা এই দীর্ঘ বারো তেরো বৎসর দেশের বাড়ী ঘর নিশ্চিন্ত হইয়া ভোগদখল করিতেছিলেন, এতদিন পরে সকন্যা ব্রজবাবুর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন আদৌ প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

গ্রামে ব্রজবাবুর নিজের দোতলা কোঠাবাড়ী, বাগান, পুকুর, জমিজমা সপরিবারে তাঁহারাই এতদিন অধিকার করিয়া বসবাস করিতেছিলেন। যিনি প্রধান সরিক, বলিতে গেলে প্রকৃত মালিক আজ হঠাৎ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত, সুতরাং বিচলিত হইবারই কথা। কিন্তু তবুও ব্রজবাবুর ভাইপোরা ও খুড়তুতো ভাই নবীনবাবু ব্রজবাবুর দেশে আসার প্রতিবাদ করিতে ভরসা করেন নাই। কারণ, মাত্র কয়েকমাস পূর্ব্বে এই ব্রজবাবুই তাঁহাদের একখানি মূল্যবান তালুক লেখাপড়া করিয়া দান করিয়াছেন, যাহার আয় বার্ষিক প্রায় হাজার টাকার কাছাকাছি। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা নিজেদের সংসারে বাসগৃহের অন্তঃপুরে তো ব্রজবাবু ও রেণুকে স্থান দিতে পারেননা। সে কারণে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া যুক্তি-পরামর্শ করিয়া ব্রজবাবুকে তাঁহারা বাড়ীর সদর অংশ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

সদরবাড়ী একতলা কোঠা। দুইখানি বড় বড় ঘর। ঘরের কোলে ভিতর দিকে দর দালান, বাহিরের দিকে খোলা রোয়াক। দালানের দুই প্রান্তে এক একখানি ছোট ঘর। একখানি চাকরদের তামাক সাজিবার ও অন্যখানি আলোবাতি রাখিবার ফরাস ঘর। এই লইয়া সদরবাটী।

ঘরগুলি ঝাঁটপাট দিয়া ধোওয়াইয়া, খান দুই তক্তাপোষ পাতাইয়া, মাটীর নূতন কলসীতে পানীয় জল তুলাইয়া রাখিয়া কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্রগণ তালুকদাতা খুড়ার প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলে ব্রজবাবু ও রেণুর সেদিন একবেলার আহারাদির ব্যবস্থাও তাঁহাদেরই নিকট হইয়াছিল। কিন্তু তাহা বাটীর মধ্যে হয় নাই। খাদ্যসামগ্রী বহির্বাটীতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

ব্রজবাবু বিশেষ লক্ষ্য না করিলেও এ ব্যবস্থার অর্থ বুঝিয়া লইতে বুদ্ধিমতী রেণুর বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু সে আজন্মকালই স্বল্পবাক্ ও সহিষ্ণু প্রকৃতির মেয়ে। কোনও ব্যাপারে মনে আঘাত কিংবা অপমান বোধ করিলেও তাহা লইয়া চঞ্চলতা প্রকাশ করা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

খুড়া দেশের বাড়ীতে পদার্পণ করিবামাত্র ভ্রাতুষ্পুত্রগণ প্রণাম ও কুশল প্রশ্নাদির পর প্রথমেই জানিতে চাহিলেন, কি কারণে তিনি এতদিন পরে বাড়ীতে ফিরিয়াছেন? কথাবার্ত্তার পর যখন জানা গেল যে বিশিষ্ট ধনী খুড়া ব্রজবাবু আজ সর্ব্বস্বান্ত ও গৃহহীন হইয়া অনূঢ়া বয়স্থা কন্যাসহ গ্রামে ফিরিয়াছেন, অবশিষ্ট জীবদ্দশা এইখানেই কাটাইবার সংকল্প লইয়া—তখন তাঁহারা রীতিমত ভীত হইয়া পড়িলেন। ব্রজবাবুর শরীরের যেরূপ অবস্থা, শেষ পর্য্যন্ত ঐ বয়স্থা অবিবাহিতা কন্যা তাঁহাদের স্কন্ধে না পড়িলে হয়। তালুক দান করিয়া অবশেষে কি খুড়া তাঁহার থুব্ড়ো মেয়েটিরও দায়িত্বভার ভাইপোদেরই দান করিয়া যাইবেন নাকি? এমনি হইলেও বা হইত, কিন্তু কুলত্যাগিনী জননীর ঐ অনূঢ়া কন্যাকে সংসারে আশ্রয় দিয়া কে বিপদের ভাগী হইবে?

ব্রজবাবু তাঁহার গৃহদেবতা গোবিন্দজীউকে সঙ্গেই আনিয়াছিলেন। পারিবারিক ঠাকুরঘরে গোবিন্দজীউকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে,

কনিষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্র ভ্রাতুষ্পুত্রগণের মুখপাত্র স্বরূপ সম্মুখে আসিয়া জোড়করে ব্রজবাবুকে বলিলেন, মেজদা একটা কথা আপনাকে না জানালে নয়। মুখে আনতে যদিও বুক ফেটে যাচ্ছে তবু না জানিয়েও উপায় নেই। আপনি ভরসা দিলে আমরা খুলে বলতে পারি।

নির্বিরোধী ব্রজবাবু ভ্রাতার এই সবিনয় ভূমিকায় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, সে কি নবীন! ভরসা আবার দেব কি? বলো বলো, এখনি বলে ফেলো, কী তোমাদের সুবিধা-অসুবিধা হচ্ছে? তাই তো—কি মুস্কিল—তোমরা কিনা শেষকালে—

ব্রজবাবু সমস্ত কথা ভাষায় ব্যক্ত করিতে না পারিলেও তীক্ষবুদ্ধি নবীনচন্দ্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্রদল তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া লইলেন। উৎসাহিত হইয়া নবীনবাবু আরও সাড়ম্বরে অতিবিনয় সমেত দীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকা ফাঁদিলেন। বহু অবান্তর কথা এবং নিজেদের নির্দ্দোষিতার ভূরি ভূরি প্রমাণ সহ যাহা জানাইলেন তাহার সার মর্ম্ম এই যে,—ব্রজবাবু ও রেণুকে যদি নবীনবাবুরা সংসারে স্থান দেন্, তাহা হইলে গ্রামে তাঁহাদের পতিত হইতে হইবে। গ্রামশুদ্ধ সকলেই জানে, এই রেণুকেই তিন বৎসরের শিশু অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া তাহার জননী দূরসম্পর্কের নন্দাই রমণীবাবুর সহিত প্রকাশ্যে কুলত্যাগ করিয়াছিলেন। মাত্র বারো তেরো বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। গ্রামের কেহই আজও তাহা বিস্মৃত হয় নাই।

ব্রজবাবু বিবর্ণমুখে নতশিরে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সেই অসহায় মুখ দেখিলে অতিবড় কঠিন হৃদয়ও ব্যথিত না হইয়া পারেনা। নবীনচন্দ্রেরও হৃদয়ে আঘাত লাগিল। কিন্তু তিনিই বা কি করিতে পারেন! একমাত্র আশা ছিল, ব্রজবাবু বিশিষ্ট অর্থশালী ব্যক্তি,—গ্রামে অর্থব্যয় করিতে পারিলে অনেকেরই মুখে চাপা দেওয়া যায়। কিন্তু, ব্রজবাবু আজ নিঃস্ব অর্থহীন। সুতরাং বয়স্থা কন্যাকে এতকাল অনূঢ়া রাখার অপরাধ গ্রামের

কেহই ক্ষমা করিবেনা,—বিশেষতঃ যে-কন্যার গাত্রহরিদ্রা হইয়াও বিবাহ হয় নাই, জননী যাহার কলঙ্কিনী !

নতুন-বৌ গৃহত্যাগ করিলে গ্রামের কুৎসা-আন্দোলনই যে ব্রজবাবুকে দেশের বাড়ী ছাড়িয়া গোবিন্দজীউ ও শিশুকন্যাসহ কলিকাতাবাসী করিতে বাধ্য করিয়াছিল, বাড়ীতে আসিবার পূর্ব্বে এ কথা যে তাঁহার কেন মনে পড়ে নাই ইহা ভাবিয়া ব্রজবাবু সত্যই বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

দেশের এ অপ্রিয় আন্দোলনের সংবাদ রেণু জানিতনা। জানিলে সে ব্রজবাবুকে গ্রামে আসিবার পরামর্শ দিতনা। কিন্তু এ অবস্থায় এখানে থাকাও তো চলে না। এখন যাইবেনই বা কোথায় ?

ব্রজবাবুর চিন্তাজালে বাধা দিয়া নবীনবাবু ও কৃতজ্ঞ ভ্রাতুষ্পুত্রগণ বারংবার দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ নিরপরাধ। সকন্যা ব্রজবাবুকে নিজেদের মধ্যে সসম্মানে গ্রহণ করিতে একান্ত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও উপায় নাই, ইহা তাঁহাদেরই দুর্ভাগ্য ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

কুণ্ঠিত হইয়া ব্রজবাবু বলিলেন,—নবু, তোমরা লজ্জিত হোয়োনা। আমি সমস্তই বুঝতে পারছি। এটা আগেই আমার বিবেচনা করা উচিত ছিল ভাই ! যাই হোক এটাও বোধহয় গোবিন্দজীউর পরীক্ষা। দেখি, তাঁর ইচ্ছা আবার কোথায় নিয়ে যায় !—

ব্রজবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র বলিলেন—কিন্তু মেজকাকা, সবচেয়ে ভাবনা আমাদের, রেণুর বিয়ের জন্যে।

ব্রজবাবু ধীরকণ্ঠে জবাব দিলেন, কিচ্ছু চিন্তা কোরোনা বাবা, আমি ওকে আর আমার গোবিন্দজীকে নিয়ে বৃন্দাবন যাত্রা করব। গোবিন্দজীর রাজ্যে মায়ের অপরাধের জন্য মেয়েকে কেউ দোষী করে না। যে-পর্য্যন্ত-না যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি, এখানে এই বৈঠকখানা-বাড়ীতেই পৃথক ভাবে থাকব। কারুর কোনও অসুবিধা ঘটাবনা।

জ্ঞাতিদের কথাবার্ত্তায় বুঝা গেল, বাস্তুবাটীর ঠাকুরঘরে গোবিন্দজী তাঁহার পূর্ব্ব বেদীতে অধিষ্ঠিত হওয়ার বাধা নাই, বাধা রেণুর ঠাকুরঘরে প্রবেশের এবং ঠাকুরের ভোগ রন্ধনের।

মুখে যাহাই বলুননা কেন, এই ঘটনায় ব্রজবাবু যথার্থই মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহার সমস্ত জীবনের প্রধান লক্ষ্য, পরম প্রিয়তম গোবিন্দজীউ নিজ পূজামন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিলেননা, বৈঠকখানা-বাড়ীতে পড়িয়া রহিলেন এই ক্ষোভে ও দুঃখে ব্রজবাবু মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। সংসারের নানা বিপর্য্যয় এমন কি সর্ব্বস্বান্ত গৃহহারা অবস্থাও তাঁহার অন্তরকে এমন বিকল করিতে পারে নাই।

গ্রামে আসিয়া পর্য্যন্ত রেণুর মোটে অবকাশ রহিলনা। গোবিন্দজীউর সেবা এবং পিতার যত্ন ও শুশ্রূষা লইয়া তাহাকে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়। অন্য কোনও ব্যাপারে তাহার দৃষ্টি দিবার সময় বিরল, হয়তো ইচ্ছাও নাই।

সদরবাটীর দুইখানি ঘরের একখানি গোবিন্দজীউর জন্য অন্যখানি পিতার জন্য সে নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছে। পিতার শয়নগৃহেরই একপ্রান্তে একখানি সরু তক্তাপোষে নিজের শয়নের ব্যবস্থা করিয়াছে। ছোট ছোট দুইখানি কক্ষের একখানি ভাণ্ডার এবং অপরখানি রন্ধনকক্ষ হইয়াছে। উঠানের এক কোণে একটুখানি জায়গা বেড়া দিয়া ঘিরিয়া রেণু স্নানএর স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছে।

ব্রজবাবু ব্যাকুলচিত্তে চিন্তা করেন,—গোবিন্দ, তোমাকে তোমার আপন মন্দির থেকে বাইরে এনে অসম্মানের মধ্যে ফেলে রাখলাম শেষকালে! এ কি আমার উচিত হ'ল প্রভু? কিন্তু আমার রেণুর যে

তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। তাকে তোমার সেবায় বঞ্চিত করলে সে কী নিয়ে বেঁচে থাকবে? পতিতপাবন, তুমিও কি অবশেষে আমাদের সাথে পতিত সেজে রইলে?—

সন্ধ্যারতির ক্ষণে আরতি করিতে করিতে ব্রজবাবু আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়েন এই ধরণের ভাবনায়। দক্ষিণ হাতের পঞ্চপ্রদীপ বাম হাতের ঘণ্টা নিশ্চল হইয়া যায়। গণ্ড বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়ে, খেয়াল থাকেনা।

রেণু ডাকে—বাবা—

ব্রজবাবুর চমক্ ভাঙ্গে। সলজ্জে ত্রস্তহস্তে আবার আরব্ধ আরতিতে পুনঃপ্রবৃত্ত হন্।

কখনও বা সংশয়উদ্বেল চিত্তে ভাবেন,—গোবিন্দ, সন্তানস্নেহে অন্ধ হয়ে তোমার প্রতি ক্রটী করে প্রত্যবায়ভাগী হলামনা তো প্রভু!

এইরূপ অত্যধিক মানসিক সংঘাতে ব্রজবাবু যখন বিপর্য্যস্ত-চিত্ত, সেই সময়ে ঘটিল এক দুর্ঘটনা। দ্বিপ্রহরে একদিন পূজার ঘর হইতে বাহির হইয়া ব্রজবাবু মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন। রেণু ভয়ে ও উদ্বেগে কাতর হইলেও স্বভাবগত ধীরতার সহিতই অর্দ্ধ-অচেতন পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, বাবা, নবুকাকাকে কিংবা দাদাদের ডাকব কি?

ব্রজবাবু অতিকষ্টে শুধু বলিলেন,—রাজু—

রেণু সেইদিনই রাখালকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়া দিল।

গ্রামের চিকিৎসকটি মেডিক্যাল কলেজে ষষ্ঠ বার্ষিকে এম্-বি ফেল্। গ্রামে পশার মন্দ জমে নাই। ব্রজবাবুকে পরীক্ষা করিয়া তিনি বলিলেন, মাথায় রক্তের চাপ্ অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় এইরূপ হইয়াছে। সতর্কতা সহকারে শুশ্রূষা ও চিকিৎসা হইলে এ যাত্রা বাঁচিয়া যাইবেন। কিন্তু ভবিষ্যতে পুনরায় এইরূপ ঘটিলে জীবনের আশা অল্পই। এখন হইতে বিশেষ সাবধানতা প্রয়োজন।

........................রাখাল তাহার বন্ধু যোগেশের মেস্ হইতে সেদিন বাসায় ফিরিল রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটায়। যোগেশ কোনওমতে রাখালকে ছাড়ে নাই, খাওয়াইয়া দিয়াছে।

দিল্লীতে কয়েকটি বিবাহযোগ্যা অনূঢ়া পাত্রী রাখালকে তাহার আপত্তি সত্ত্বেও দেখানো হইয়াছিল। তাহাদেরই মধ্যে একটি পাত্রীর কাকা কলিকাতায় অফিসে চাকুরী করেন। দিল্লী হইতে পাত্রীর পিতার তাগিদ্ অনুসারে পাত্রীর খুড়া আসিয়া যোগেশকে ধরিয়াছেন। রাখালরাজবাবুর সহিত তাঁহার ভাইঝির বিবাহ দিয়া দিতেই হইবে। সে ভদ্রলোক নাকি যোগেশকে এমনভাবে অনুনয়-বিনয় করিতেছেন যে, নিজে বিবাহিত এবং অন্য জাতি না হইলে যোগেশই হয় তো এই অরক্ষণীয়াটির রক্ষণভার গ্রহণ করিয়া তাহার খুড়ার অনুনয়বিনয়ের উৎপাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ফেলিত।

পাত্রীর একখানি ফটোগ্রাফও যোগেশ রাখালকে দেখাইয়াছে। যদি চেহারা ঠিক মনে না পড়ে সেজন্য খুড়া এই ফোটোখানি যোগেশের নিকট রাখিয়া গিয়াছেন।

রাখাল প্রথমে তো হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিল, কিন্তু যোগেশচন্দ্র না-ছোড়। সে প্রাণপণ তর্ক ও যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে লাগিল, যদি পাত্রীর বয়স, চেহারা, শিক্ষা এবং তাহার পিতৃকুল সম্বন্ধে রাখালের কোনও অপছন্দ না থাকে তবে সে কেন বিবাহ করিবেনা ?

যোগেশ জানে, রাখাল বিবাহে পণগ্রহণ প্রথাকে অকৃত্রিম ঘৃণা করে। সংসারে রাখালের অপেক্ষা অনেক অল্প আয়ের মানুষও বিবাহ করিয়া স্ত্রীপুত্রকন্যা প্রতিপালন করিতেছে। স্বয়ং যোগেশচন্দ্রই তো তাহাদের অন্যতম উদাহরণ। তবে মধ্যবিত্ত বিবাহিত ব্যক্তির জীবনযাত্রাপ্রণালী বড়লোকদের অনুকরণে হয়তো চলেনা, যেমন চলে তাহা অবিবাহিত

অবস্থায়। বন্ধুর বিবাহে বা বান্ধবীর জন্মদিনে নিউ মার্কেটের ফুলের বাস্কেট্ উপহার, কিংবা মরক্কো বাঁধাই মূল্যবান সংস্করণের রবীন্দ্রনাথ অথবা শেলি ব্রাউনিঙের গ্রন্থ উপহার দেওয়ার বাধা ঘটিতে পারে। বিলাতী সেলুনে আট আনায় চুল ছাঁটার পরিবর্ত্তে দেশী নাপিতের কাছে আট পয়সায় চুল ছাঁটিতে তখন হয়তো বাধ্য হইতে হয়। কিন্তু বিবাহের যোগ্যতা সম্পন্ন পুরুষ যদি বিবাহোপযোগী বয়সে কেবলমাত্র দায়িত্বভার বহনের ভয়ে অথবা নিজের বিলাস ও অবাধ মুক্তির বাধা ঘটিবার আশঙ্কায় বিবাহে পরাঙ্মুখ হয়, তবে তার চেয়ে কাপুরুষ সংসারে বিরল। হিসাব করিলে দেখা যায়, বিবাহের অনুপযুক্ত ব্যক্তি বিবাহ করিয়া যতখানি অপরাধ করে তাহাদের চেয়ে বেশি দোষী এবং অশ্রদ্ধেয়,—যাহারা যোগ্যতা সত্ত্বেও মুক্তির বিঘ্ন আশঙ্কায় এবং দায়িত্ব এড়াইবার জন্যই চিরকুমার থাকিতে চায়। ইত্যাদি।

রাখাল নির্ব্বিকার হাসিমুখে বন্ধুর যুক্তি এবং ভৎ´সনা নিঃশব্দে পরিপাক করিয়া গেল। শেষে আহারাদির পর বাসায় ফিরিবার সময় যোগেশের বারংবার পীড়াপীড়ির জবাবে বলিল, আমাকে একটু ভেবে দেখতে সময় দাও ভাই!

যোগেশ উৎসাহিত হইয়া বলিল, বেশ বেশ, এ’ তো ভাল কথাই। তা’ হলে কবে আন্দাজ তোমার উত্তর পাওয়া যাবে বলে দাও। আস্‌ছে পরশু? কেমন?

রাখাল হাসিয়া বলিল, এত বেশি সময় দিচ্ছো কেন? বলোনা আসছে ভোরে—

যোগেশ একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, না না, তা’ নয়। তবে জানো কি, ওদের কন্যাদায় কিনা! একটু বেশিরকম ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। তোমার এই ‘ভেবে দেখা’র সময়টুকু ওদের কাছে খুনী আসামীর

জজের রায়ের জন্য অপেক্ষার মতই শ্বাসরোধকর প্রতীক্ষা। তাই বলছিলাম।

রাখাল বলিল, তুমি ব্যস্ত হোয়োনা। আমি কয়েকদিনের মধ্যে নিজেই তোমাকে জানিয়ে যাব।

যোগেশকে প্রসন্ন করিয়া রাখাল তাহার মেস্ হইতে যখন বাহির হইল রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। বন্ধুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের কথাটাই ভাবিতে ভাবিতে রাস্তা চলিতেছিল।

বিবাহের পাত্রীটি সে দিল্লীতে নিজচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে। বয়স আঠারো উনিশ হইবে। বেশ মোটাসোটা গোলগাল। রং ফর্সা না হইলেও কালোও বলা চলেনা। চেহারায় স্বাস্থ্যের লাবণ্য আছে। লেখাপড়া মোটামুটি শিখিয়াছে। সূচিশিল্প ও রন্ধনাদি গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা বলিয়া পাত্রীর পিতা উচ্ছ্বসিত সার্টিফিকেট্ নিজমুখেই অযাচিত দাখিল করিয়াছিলেন।

মেয়েটি রাখালকে এবং যোগেশকে :নমস্কার করিয়া অতিশয় গম্ভীরমুখে অত্যধিক অবনতশিরে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়াছিল। সেই মেয়েটি যদিই প্রজাপতির দুর্ব্বিপাকে তাহার পত্নী হইয়া গৃহে আসে, কেমন মানাইবে? মেয়েটির সেই অতিগম্ভীর মুখ ও উঁচু করিয়া বাঁধা ঢিবির মত মস্ত খোঁপাসমেত্ অতি অবনত মাথাটি মনে পড়িয়া রাখালের অকস্মাৎ অত্যন্ত হাসি আসিল।

জীবনের সর্ব্ব অবস্থায় সকল প্রকার দুঃখে-সুখে পাশে দাঁড়াইয়া হাসি-মুখে আশ্বাস দিতে পারে, আনন্দ ও তৃপ্তি পরিবেশন করিতে পারে, এমনতর ভরসা করা যাইতে পারে কি ঐ মেয়ের'পরে? দুর দুর!

দিল্লীতে আরও যে কয়টি পাত্রী রাখালকে দেখানো হইয়াছিল তাহারাও কম বেশি তথৈবচ। রাখালের মানসপটে চিন্তায় চিন্তায় বহু-

বালিকা কিশোরী তরুণীর রকমারি রূপচ্ছবি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে এমন একজনকেও সে মনে করিতে পারিলনা যাহার উপরে চিরদিনের মতো আপন জীবনের দুঃখসুখের সকল ভার তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত নির্ভরতা লাভ করা সম্ভব।

সমস্ত মুখগুলিকে আড়াল করিয়া একখানি কোমল শান্ত অথচ বুদ্ধি-দীপ্ত সুন্দর মুখ বারংবার তাহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। অথচ বিবাহের পাত্রী নির্ব্বাচন-ব্যাপারে সে মুখ স্মরণে জাগিবার কোনো অর্থই হয়না, তাহা আর যে-কেহ অপেক্ষা রাখাল নিজেই ভাল করিয়া জানে। কিন্তু সে যাহাই হউক, রাখালের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসে ও শ্রদ্ধায় সে-মুখের কান্তিই অন্যবিধ। যাহা আর কাহারো সহিত তুলনা করা চলেনা।

শুধু বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাই নয়, একান্ত আপনজন সুলভ নিবিড় হৃদ্যতার মাধুর্য্য সেই চক্ষুর্দ্বয়ের স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে, অনাবিল হাসির ভঙ্গীতে যাহা স্বতঃই ক্ষরিত হইয়া পড়িত, তাহার সহিত সংসারে আর দ্বিতীয় কাহারো কি উপমা চলে? রাখাল যে তাহারই ঐকান্তিক শ্রদ্ধা জড়িত অকুণ্ঠ নির্ভরতা লাভ করিয়াই আজ নিজেকে বিবাহের দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া ক্ষণেকের তরেও চিন্তা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ভাবিতে ভাবিতে ভাবনার মূলসূত্র হারাইয়া ফেলিয়া রাখাল সারদার ভাবনাই ভাবিয়া চলিল।

সারদা সেদিন রাত্রে তাহাকে বলিয়াছিল,—আপনি অনেকের অনেক করেন, আমারও করেছিলেন, তাতে ক্ষতি আপনার হয়নি। বেঁচে যদি থাকি এইটুকুই কেবল জেনে রাখতে চাই।

কিন্তু সত্যই কি তাই? রাখাল অনেকেরই অনেক করে একথা হয়তো সত্য, সারদারও সে সামান্য কিছু উপকার বা সাহায্য করিয়াছে।

কিন্তু, তাহাতে রাখালের কি কোনও ক্ষতিই হয় নাই? তাহা যদি না-ই হইবে তবে কেন সে সেদিন রাত্রে অমনভাবে আত্মসংবরণে অক্ষম হইল? শুধু সারদাকেই যে রূঢ় তিরস্কার করিল তাহাই নহে, তাহার মাতৃস্বরূপিণী নতুন-মাকে পর্য্যন্ত কটুকথা শুনাইয়া দিল একজন অপরব্যক্তির সম্মুখেই।

তারককে সারদা যদি যত্ন আদর করে, তাহাতে রাখালের ক্ষুব্ধ হইবার কী আছে! সারদার নিকটে রাখালও যে, তারকও সে। বরং রাখাল অপেক্ষা তারক বিদ্বান্ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। তাহার এই সকল গুণেরই সেদিন উল্লেখ করিয়াছিল সারদা, তাহাতে এমন কি অপরাধ সে করিয়াছে যাহার জন্য রাখাল অমন জ্বলিয়া উঠিল? কেন সে অকস্মাৎ নিজেকে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত অনুভব করিল?

ভাবিতে ভাবিতে মুখ চোখ ও কান উত্তপ্ত হইয়া জ্বালা করিতে লাগিল। নিকটস্থ একটা পার্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিরিবিলি কোণের একটি শূন্য বেঞ্চিতে রাখাল সটান্ শুইয়া পড়িল।

চোখ বুজিয়া ভাবিতে লাগিল দিন দুই-তিন পূর্ব্বে এস্‌প্ল্যানেডের মোড়ে সে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। একখানি চলন্ত মোটর হইতে ঝুঁকিয়া বিমলবাবু হাত নাড়িয়া তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। রাখাল বিমলবাবুর পানে তাকাইলে তিনি মোটর থামাইয়া হাত ইসারায় তাহাকে নিকটে ডাকিয়া গাড়ী হইতে রাস্তায় নামিয়া পড়িয়াছিলেন। রাখাল নিকটে গেলে বিমলবাবু সর্ব্বপ্রথম প্রশ্ন করেন,—তোমার কাকাবাবুর ও রেণুর চিঠিপত্র পেয়েছো কি রাজু?

অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া রাখাল বলিয়াছিল—কেন বলুন তো?

বিমলবাবু বলিলেন—তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। দেশে গিয়ে তাঁরা কেমন আছেন খবর পাইনি, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি।

রাখাল জবাব দিয়াছিল—তাঁরা ভালই আছেন।

বিমলবাবু বলিয়াছিলেন—তুমি কবে চিঠি পেয়েছ ?

সে উত্তর দিয়াছিল—দিন চারেক হবে। তারপর মৌখিক সৌজন্যে বিমলবাবুকে প্রশ্ন করিয়াছিল—আপনি কোন্‌দিকে চলেছেন ?

বিমলবাবু উত্তর দিয়াছিলেন—একবার সারদা-মার খোঁজ নিতে যাচ্চি।

ইহাতে অতিমাত্রায় বিস্ময়াপন্ন হইয়া সে অকস্মাৎ প্রশ্ন করিয়া ফেলিয়াছিল—কোন্ সারদা ?

বিমলবাবুও ঈষৎ আশ্চর্য্য হইয়াই জবাব দিয়াছিলেন—সারদাকে তো তুমি চেনো।

রাখাল শুষ্ককণ্ঠে বলিয়াছিল—সেত' এখানে নেই! নতুন-মার সঙ্গে হরিণপুরে তারকের কাছে গেছে।

বিমলবাবু বলিয়াছিলেন—সে কি ? তুমি কি জানোনা সারদা তোমার নতুন-মার সঙ্গে হরিণপুরে যায়নি ?

রাখাল উত্তর দিয়াছিল—না। এ খবর আমি শুনিনি। আমি তাঁদের যাবার আগের দিন রাত্রি পর্য্যন্ত সারদার সেখানে যাওয়াই স্থির দেখে এসেছিলাম।

বিমলবাবু বলিয়াছিলেন—তাই স্থির ছিল বটে, কিন্তু আমি ষ্টেশনে গিয়ে দেখলাম সারদা আসেননি।

তোমার নতুন-মা বললেন—তার যাওয়ার উপায় নেই। আমাকে বলে গেলেন—সারদা একা থাকলো, মাঝে মাঝে তার খোঁজখবর নিও। তাই মাঝে মাঝে তার খবর নিতে যাই।

রাখাল পুনরায় প্রশ্ন করিয়া বসিল—সারদা কেন হরিণপুরে গেলনা, জানেন কি ?

বিমলবাবু বলিলেন—সারদাকে জিজ্ঞাসা করে শুনলাম, মালিকের হুকুম ভিন্ন এ বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র নড়বার তার উপায় নেই।

রাখাল বিমূঢ়ভাবে বলিয়া ফেলিল—কে মালিক?

বিমলবাবু উত্তর দিয়াছিলেন—ঠিক জানি না। হয়ত তার নিরুদ্দিষ্ট স্বামী বলেই মনে হয়।

রাখাল মুদিতচক্ষে পার্কের বেঞ্চে শুইয়া এস্‌প্ল্যানেডে বিমলবাবুর সহিত সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ চিন্তা করিতে লাগিল। সারদা হরিণপুরে নতুন-মার সহিত কেন গেলনা? বলিয়াছে—মালিকের হুকুম ব্যতিত তাহার অন্যত্র যাওয়ার উপায় নাই। সে মালিক কে? বিমল বাবু কিংবা আর যে কেউ সারদার নিরুদ্দিষ্ট স্বামী জীবনবাবুকে সেই ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করুন না কেন—একমাত্র রাখাল নিজে নিশ্চিতরূপে জানে, আর যাহাকেই সারদা তাহার মালিক বলিয়া নির্দ্দেশ করুক, পলায়িত বিশ্বাসঘাতক জীবনচক্রবর্ত্তীকে কখনই করে নাই।

বুঝিতে কিছুই তাহার বাকি রহিলনা। তবুও রাখালের মনের মধ্যে কোথায় যেন কি-একটা বিরোধ বাধিতে লাগিল।

এগারটা বাজিলে পার্কের রক্ষক আসিয়া রাখালকে উঠিয়া যাইতে অনুরোধ করিল। উঠিয়া ভারাক্রান্ত মনে সে বাসায় যখন পৌছিল সাড়ে এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। বিছানায় শুইয়া ঘুমাইবার পূর্ব্বে মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিল—কাল সকালে উঠিয়াই সারদার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া আসিবে। চা বাসায় খাইবে না। সারদাকেই চা তৈয়ার করিয়া দিতে বলিবে।

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পর রাখাল মনে মনে অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে লাগিল। তার পর নানারূপ সম্ভব অসম্ভব কল্পনা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

১৮

পরদিন যখন রাখালের ঘুম ভাঙিল বেলা অনেক হইয়া গিয়াছে। ফেরিওয়ালার উচ্চ হাঁকে গলি মুখরিত। দেওয়ালের ঘড়ীর দিকে তাকাইয়া রাখাল একটু লজ্জিতভাবে উঠিয়া পড়িল। মুখ হাত ধোওয়া হইলে কামাইবার সরঞ্জাম বাহির করিয়া পরিপাটিরূপে দাড়ি কামাইয়া ফেলিল। ফর্সা ধুতি পাঞ্জাবি বাহির করিয়া জামা কাপড় বদলাইয়া লইল। মনোযোগের সহিত চুল ব্রাশ্ করিতে করিতে চা-পিপাসায় ঘন ঘন তাহার হাই উঠিতে লাগিল। হাসিয়া ষ্টোভ্‌টির পানে তাকাইয়া রাখাল মৃদুকণ্ঠে কহিল—আজ তোমার এ'বেলা ছুটি।

খুঁটিনাটি কাজকর্ম্ম যথাসম্ভব দ্রুতহস্তে সম্পন্ন করিয়া বার্ণিশকরা ঝক্‌ঝকে জুতা জোড়া পরিত্যক্ত ময়লারুমালে সযত্নে ঝাড়িয়া পায়ে দিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে বাহির হইতে পিওন্ হাঁকিল—টেলিগ্রাম—

রাখাল জুতা ফেলিয়া রাখিয়া উৎসুক আগ্রহে ছুটিয়া আসিল। সহি করিয়া দিয়া টেলিগ্রাম খুলিয়া পাঠ করিতে করিতে দুর্ভাবনায় মুখ তাহার অন্ধকার হইয়া উঠিল। ব্রজবাবু বিশেষ পীড়িত। রেণু তাহাকে সত্বর যাইতে অনুরোধ করিতেছে। টেলিগ্রামখানি হাতে লইয়া অল্পক্ষণ দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে সে ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিতে লাগিল সারদার সহিত আজ আর দেখা করিতে যাইবে কিনা! টাইম টেবল্ বাহির করিয়া ট্রেণের সময় দেখিয়া ফেলিল। বেলা ন'টায় একটা ট্রেণ আছে বটে কিন্তু তাহা ধরিতে পারা যাইবে না। এখন সাড়ে আটটা। বেদানা আঙুর কমলা-লেবু প্রভৃতি ফলমূল এবং রোগীর প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীও কিছু কিনিয়া লইতে হইবে। সুতরাং ন'টায় ট্রেণ পাওয়া

অসম্ভব। পরের ট্রেণ বেলা সাড়ে বারোটায়, যথেষ্ট সময় রহিয়াছে। দ্বারে তালাবন্ধ করিয়া রাখাল চিন্তিত মুখে সারদার সহিত দেখা করিতে চলিল। কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইবার পূর্ব্বে একবার তাহাকে জানাইয়া যাওয়া উচিত। ইচ্ছা, সেখানেই সত্বর চা পান করিয়া ফিরিবার মুখে প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি কিনিয়া লইয়া সাড়ে বারোটার ট্রেণে রওনা হইবে।

সারদার বাসায় পৌঁছিয়া রাখাল দেখিল রোয়াকে মাদুর পাতিয়া সারদা চার পাঁচটি ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে পড়াইতেছে। কেহ শ্লেটে লিখিতেছে, কেহ বানান শিখিতেছে, কেহ বা করিতেছে ছড়া মুখস্থ। রাখালকে দেখিয়া সারদা ব্যস্ত অথবা আশ্চর্য্য হইলনা। আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছেলেদের বলিল—যাও, তোমাদের এখন ছুটি। দুপুর বেলায় আজ পড়তে হবে।

ছেলেরা চলিয়া গেলে সারদা রোয়াক হইতে উঠানে নামিয়া রাখালকে প্রণাম করিয়া বলিল—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, ঘরে বসবেন চলুন।

রাখাল শুষ্ক কণ্ঠে কহিল—নাঃ, বসবার আর সময় নেই। দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করেই চলে যাব।

রাখাল হয়তো মনে মনে আশা করিয়াছিল সারদা তাহাকে অভাবিত রূপে দেখিতে পাইয়া বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইবে। কিন্তু সারদার ব্যবহারে মনে হইল রাখাল যে আজ এই সময়ে আসিবে তাহা যেন সে পূর্ব্ব হইতেই জানিত।

একে রেণুর টেলিগ্রাম পাইয়া মন ছিল উদ্বিগ্ন চঞ্চল, তাহার উপর সারদার সহজ শান্ত অভ্যর্থনা রাখালের চিত্ত বিরূপ করিয়া তুলিল।

মনের ভিতরে এমন একটা অহেতুক অভিমান গুমরাইতে লাগিল যাহার কারণ স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা কঠিন।

রাখাল বলিল,—তুমি নতুন-মার সঙ্গে হরিণপুর যাওনি শুনলাম।

সারদা চুপ করিয়া রহিল।

উত্তর না পাইয়া রাখাল পুনরায় বলিল,—কেন গেলেনা জানতে পারি কি?

সারদা তথাপি নিরুত্তর।

রাখাল কহিল—নতুন-মাকে একলা না পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গী হওয়া তোমার উচিত ছিলনা কি?

সারদা কোনই উত্তর দেয়না দেখিয়া রাখালের মনের মধ্যে উত্তাপ উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল। মৌনতা ভাঙাইবার জন্যই বোধহয় এবার বলিয়া বসিল—আমার ঋণ তো সেদিন কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে দিয়েচ, সুতরাং কথার উত্তর না দিলেও চলে, কিন্তু নতুন-মার ঋণও এরই মধ্যে শুধে ফেলেচ নাকি সারদা?

সারদার মুখে বেদনার চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। তবুও সে এই কঠিন উপহাসের উত্তর দিলনা। মৃদুকণ্ঠে বলিল—আপনার যা' বলবার আছে ঘরে এসে বলুন। এখানে দাঁড়িয়ে হাটের মাঝখানে বলবেন না। ঘরে গিয়ে বসুন। আমি এখুনি আসছি। চলে যাবেননা, আমার অনুরোধ রইলো।

কথাগুলি বলিতে বলিতেই সারদা মুহূর্ত্ত মধ্যে রোয়াকের অন্য পাশে বেড়া দেওয়া অপর ভাড়াটেদের অংশে অন্তর্হিত হইয়া গেল। বিরক্ত রাখাল তাহার উদ্দেশে ব্যস্ত সুরে বলিতে লাগিল—না না, বসবার আমার মোটেই সময় নেই। এখুনি যেতে হবে। যা বলতে এসেছি—শুনে যাও—

কিন্তু সারদা তখন চলিয়া গিয়াছে। রাখাল অল্পক্ষণ উঠানে দাঁড়াইয়া চলিয়া যাইবে কি আরও একটু অপেক্ষা করিবে দ্বিধা করিতে লাগিল। অবশেষে বিরক্ত চিত্তে সারদার ঘরে গিয়া বসিয়াই পড়িল। পাঁচজনের বাড়ীর মাঝে চেঁচাইয়া সারদাকে বারবার ডাকাও যায়না; দাঁড়াইয়া থাকাটা আরও অশোভন। রাখাল ঘরে গিয়া বসিবার একমিনিটের মধ্যেই সারদা ক্ষুদ্র এলুমিনিয়ম কেট্‌লীর হাতলে শাড়ীর আঁচল জড়াইয়া মুঠি করিয়া ধরিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ঢাক্‌নী চাপা দেওয়া কেট্‌লী হইতে অল্প অল্প গরম ধোঁয়া বাহির হইতেছিল। ঘরের কোণে কেট্‌লী নামাইয়া রাখিয়া দ্রুত হস্তে জানালার মাথায় তাকের উপর হইতে একটি ধব্‌ধবে শাদা পাত্‌লা কাচের পেয়ালা পিরিচ এবং একখানি নূতন চামচ নামাইল। ক্ষুদ্র চায়ের টিনও একটী নামাইল। চায়ের টিনটি একেবারে নূতন, প্যাক্ খোলা হয় নাই। সারদা লেবেল্ ছিঁড়িয়া ক্ষিপ্রহস্তে টীন খুলিয়া ফেলিয়া কেটলীর জলে চা-পাতা ভিজাইয়া ঢাক্‌নী চাপা দিল। তারপর পেয়ালা পিরিচ ও চামচ বাহির হইতে ধুইয়া আনিল এবং সেই সঙ্গে লইয়া আসিল কাগজের মোড়কে চিনি ও ক্ষুদ্র কাঁসার গ্লাসে টাট্‌কা দুধ।

চৌকিতে বসিয়া রাখাল নিঃশব্দে সারদার কার্য্যকলাপ দেখিতেছিল। বেলা হইয়াছে যথেষ্ট অথচ চা পান করা হয় নাই। মাথাটি বেশ ধরিয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছে। সুতরাং সারদার চায়ের আয়োজন দেখিয়া তাহার বিরক্তি ও অভিমান অনেকখানিই কমিয়া গিয়াছিল। তথাপি সম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্যই বলিল—এত সমারোহ করে চা তৈরি হ'চ্ছে কার জন্য?

সারদা পেয়ালায় চা ছাঁকিতে ছাঁকিতে মৃদু হাসিয়া ঘাড় ফিরাইয়া একবার রাখালের পানে তাকাইল। তারপর আবার নিজের কাজে মন দিল।

মনে মনে লজ্জিত হইলেও রাখাল তখন বলিতে পারিল না—আমি উহা খাইবনা। সারদা ততক্ষণে দুধ চিনি মিশ্রিত সোনালী বর্ণ গরম চায়ে চামচ নাড়িতে নাড়িতে পিরিচ সমেত পেয়ালাটি রাখালের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছে।

লইতে ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া রাখাল বলিল—এর জন্য এতক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখা তোমার উচিত হয়নি সারদা। কিচ্ছু দরকার ছিলনা এর।

সারদা নিতান্ত নিরীহের মত মুখ করিয়া কহিল—আমি তা' জানতামনা। আচ্ছা তবে থাক্, ফিরিয়ে নিয়ে যাই।

ঠোঁটের প্রান্তে চাপা দুষ্ট হাসি। রাখাল ঐ হাসি চেনে। তাহার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। হাত বাড়াইয়া বলিল—নাঃ, করেইছ যখন আমার নাম করে, ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবেনা।

সারদা এইবার ঠোঁট টিপিয়া হাসিতে হাসিতে চায়ের পেয়ালা হাতে তুলিয়া দিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। অল্প একটু পরে শাদা কাচের একখানি প্লেটে খান কয়েক গরম শিঙাড়া ও গোটা দুই টাট্‌কা রাজভোগ রসগোল্লা লইয়া ফিরিয়া আসিল। রাখাল প্লেটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল—ওসব আবার আনালে কেন সারদা?

সারদা গম্ভীর মুখে বলিল—চায়ের সঙ্গে জলযোগের জন্য। কিন্তু চায়ের পেয়ালাটি যে খালি করে দিতে হবে এবার। আর এক পেয়ালা চা আপনাকে ছেঁকে দেব। আমার অন্য পেয়ালা আর নেই।

রাখাল এবার আর আপত্তি তুলিলনা। এক নিশ্বাসে অবশিষ্ট চা টুকু পান করিয়া লইয়া পেয়ালাটি মেঝেয় নামাইয়া দিল। তাহার পর নির্ব্বিবাদে তুলিয়া লইল খাবারের প্লেটখানি।

সারদা দ্বিতীয় পেয়ালা চা লইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে রাখাল

খাবার খাইতে খাইতে মুখ না তুলিয়াই প্রশ্ন করিল—আচ্ছা সারদা, তুমি নিজে তো চা খাওনা! ঘরে চায়ের সরঞ্জাম রেখেচ কার জন্য?

সারদা নিরীহ মুখে বলিল—এই ধরুন, তারকবাবু টাবু—

রাখাল বলিল—ও—বুঝেচি। হাতের অর্দ্ধ সমাপ্ত শিঙাড়াটি শেষ করিয়া খাবার সমেত প্লেটখানি রাখাল নামাইয়া রাখিল।

সারদা ব্যস্ত হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া অকৃত্রিম ব্যগ্রতায় বলিয়া উঠিল—ওকি? রসগোল্লা মোটে ছুঁলেনইনা যে। না না, তা' হবেনা দেবতা! তুলে নিন্ রেকাবি। সবগুলি না খেলে আমি মাথা খুঁড়ে মরবো কিন্তু বলে রাখচি।

অকস্মাৎ সারদার এই আন্তরিক চাঞ্চল্যে রাখাল হতভম্ব হইয়া বিমূঢ়ের মত পরিত্যক্ত প্লেট তুলিয়া লইয়া বলিল—কিন্তু আমার যে সত্যিই খেতে রুচি নেই সারদা! সমস্ত খাবারগুলি না খেলে কি যথার্থই তোমার কষ্ট হবে?

সারদা আরক্ত মুখে কহিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হবে। আপনি খান্ বলচি। রসগোল্লা আপনি কত ভালবাসেন আমি জানিনে বুঝি? সকালে গরম শিঙাড়া চায়ের সঙ্গে রোজইত আনিয়ে খান্। বলুন, খান্‌না?

রাখাল বিস্মিত কৌতুকে বলিল—কিন্তু তুমি এসব গুপ্ত-সংবাদ জানলে কেমন করে?

সারদা শান্তভাবে কহিল—আমি জানি। তারপরে হাসিতে হাসিতে বলিল—আচ্ছা, সত্যি করে বলুন তো, এক পেয়ালা চায়ে আপনার কোনওদিন তেষ্টা মেটে? দু' পেয়ালা চা না হলে মন খুঁৎ-খুঁৎ করে না কি?

রাখাল রসগোল্লাভরা গালে ভারী গলায় বলিল—হুঁ, বুঝেছি। কিন্তু আমি যে বাসায় চা খাই ঠিক এই রকম বড় পেয়ালায়, তারক কি সে খবরটাও তোমাকে দিয়ে গেছে?

সারদা জবাব দিলনা। রাখালের চা ও খাবার খাওয়া হইয়া গেলে মুখ ধোওয়ার জল ও সুপারী এলাচ আনিয়া দিল।

হাত-মুখ মুছিবার জন্য একখানি পরিচ্ছন্ন গামছা হাতে দিয়া সারদা বলিল—উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় যা' বলতে চাইছিলেন, এইবার উঠোনে নেমে, তা' বলবেন চলুন।

রাখাল লজ্জিত হইয়া বলিল—সারদা, তুমি দেখছি আজকাল আমাকে প্রতি কথায় উপহাস করো।

জিভ্ কাটিয়া সারদা বলিল—বাপ্‌রে! কি বলেন দেব্‌তা? এত বড় দুঃসাহস আমার নেই। ব্রহ্মতেজে ভস্ম হয়ে যাবোনা?

রাখাল গম্ভীর মুখে বলিল—আমি জানতে এসেছিলাম তুমি নতুন-মাকে একা হরিণপুরে পাঠিয়ে কী গুরুতর প্রয়োজনে কলকাতায় রইলে? তোমাকে সত্যি করে এর জবাব দিতে হবে।

সারদা অল্পক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল—আগে আপনি আমার একটি কথার সত্যি ক'রে জবাব দেবেন বলুন?

—দেবো।

—যে-প্রশ্ন আমাকে আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন, নিজে কি তার জবাব সত্যিই জানেন না?

রাখাল মুস্কিলে পড়িল। আমতা আমতা করিয়া বলিল—আমি যা' অনুমান করেছি সেটা ঠিক কিনা জানবার জন্যই তো তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি সারদা!

সারদা বলিল—তা'হলে জেনে রাখুন, মনের কাছ থেকে যে জবাব পেয়েছেন, সেইটেই সত্যি। নিজের অন্তর কখনও মানুষকে ঠকায়না।

রাখাল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সারদা উচ্ছিষ্ট পেয়ালা-পিরিচ ও

রেকাবি উঠাইয়া বাহিরে লইবার উদ্যোগ করিতেছে, সেইদিকে তাকাইয়া রাখাল কহিল—তবুও নিজের মুখে বুঝি স্পষ্ট বলতে পারলেনা, কেন যাওনি!

সারদা হাসিয়া হাতের উচ্ছিষ্ট পেয়ালা প্লেটগুলি ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিল—এরই জন্য যাইনি। এইবার স্পষ্ট জবাব পেলেন ত? বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

রাখাল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ভাবিতে লাগিল কিছুদিন পূর্ব্বে সে বলিয়াছিল—দুনিয়ায় সারদাদের সে অনেক দেখিয়াছে। কিন্তু সত্যই কি তাই? এই সারদার সমতুল্য কি আর একটি মেয়েরও জীবনে দেখা পাইয়াছে? জীবনদানের মূল্যে এমন করিয়া নিঃশব্দ জীবন উৎসর্গ আর কে করিতে পারে?

ধোওয়া বাসনগুলি আনিয়া, তাকের উপরে সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে সারদা বলিল—প্রথম যেদিন আমার ঘরে পায়ের ধূলো দিয়েছিলেন দেব্‌তা, আপনাকে চা তৈরী করে খাওয়াতে চেয়েছিলাম। আপনি বলেছিলেন—অসময়ে চা খাওয়া আপনার সহ্য হয়না। জলখাবার আনিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, আমার আগ্রহ দেখে আপনার দয়া হয়েছিল। বলেছিলেন, আবার যেদিন সময় পাবো, আমি নিজে চেয়ে তোমার চা তোমার জলখাবার খেয়ে যাবো। সেই থেকে আমি চায়ের সরঞ্জাম ঘরে জোগাড় করে রেখে দিয়েছি। জানতাম—একদিন না একদিন আপনি এই ঘরে বসে আমার হাতের চা-জলখাবার গ্রহণ করবেনই। কিন্তু বলেছিলেন নিজে চেয়ে নিয়ে খাব। আমার ভাগ্যে সেটা আর হোলনা।

রাখাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। মনে পড়িল সে আজ বাসা হইতে বাহির হইয়াছিল চা-জলখাবার চাহিয়া খাইবে বলিয়াই।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিয়া গেল। রাখালের হঠাৎ মনে পড়িল

বাজার করিয়া শীঘ্র বাসায় ফেরা প্রয়োজন। সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আজ আমি যাই সারদা! সাড়ে বারটায় আমাকে ট্রেণ ধরতে হবে।

সারদা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় যাবেন?

—কাকাবাবুর বড় অসুখ। রেণু যাওয়ার জন্য তার করেছে।

সারদা চিন্তিত মুখে বলিল—নতুন-মাকে খবর দিয়েছেন?

—না। নতুন-মা তো হরিণপুরে। তুমি তাঁর চিঠিপত্র পাও নাকি?

হাঁ। তিনি প্রতি চিঠিতেই কাকাবাবু ও রেণুর সংবাদ জানতে চান্। আপনার কুশলও প্রতি পত্রেই জিজ্ঞাসা করেন।

রাখাল বলিল—তা'লে খবরটা তুমিই তাঁকে লিখে দিও। আমায় তিনি চিঠিপত্র দেননি।

সারদা বলিল—তা' দেব। কিন্তু একটু অপেক্ষা করুন দেবতা। আমার ফিরতে বেশী দেরী হবেনা

সারদা টীনের তোরঙ্গটি খুলিয়া কতকগুলি কাপড় বাহির করিয়া লইয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। রাখালকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সারদা মিলের ফর্সা শাড়ী ও মোটা সেমিজে পরিচ্ছন্ন বেশে একটি ক্ষুদ্র পুঁটুলি হাতে ঘরে ঢুকিল।

বিস্মিত রাখাল সারদার মুখের পানে চাহিতে সারদা কহিল—আমাকেও যে আপনার সঙ্গে যেতে হবে দেব্‌তা।

রাখাল অতিরিক্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—তুমি কোথায় যাবে আমার সঙ্গে?

—কাকাবাবুর অসুখ। রেণু ছেলেমানুষ একলা। আমি গেলে অনেক দরকারে লাগতে পারব।

রাখাল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল—কিন্তু—

বাধা দিয়া সারদা বলিল—অমত করবেননা দেব্‌তা, আপনার দুটি পায়ে পড়ি। কাকাবাবু আমায় চেনেন, রেণুও আমায় জানে। আমি গেলে ওঁরা অসন্তুষ্ট হবেন না, দেখবেন! সারদার কণ্ঠস্বরে নিবিড় মিনতি ফুটিয়া উঠিল।

রাখাল দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। ভাবিয়া দেখিল সারদাকে সঙ্গে লইয়া গেলে লাভ ব্যতীত ক্ষতি হইবেনা। বলিল—আচ্ছা, চলো তা'হলে। কিন্তু, তোমার খাওয়া তো হয়নি। আমি বাজার করে ফিরে আসছি। তুমি এগারটার মধ্যে স্নানাহার করে তৈরি হয়ে নাও।

সারদা কহিল—আপনার খাওয়ার কি হবে?

—আমি ষ্টেশনে রেস্তোরায় খেয়ে নেব ঠিক করেচি।

—আমার রান্না চড়ে গেছে। আপনি সাড়ে দশটার মধ্যে খাবার তৈরী পাবেন। এখানেই আজ দু'টি খেয়ে নিন্‌না দেব্‌তা!

—না, না, আমার খাওয়ার জন্য তোমাকে হাঙ্গামা করতে হবেনা। আমি দোকানে খাবার খেয়ে নিতে পারব।

—আপনাকে ভাত খেতে হবেনা। গরম লুচি ভেজে দেব। লুচি খেতে আপনার আপত্তি কি?

—আপত্তি কিছু নেই। এই তো সেদিন রাত্রে নিমন্ত্রণ খেলাম তোমার কাছে। এখনও পেটের ভিতর চা-জলখাবার হজম হয়নি।

—তা'হলে খানকতক লুচিই ভেজে দিই?

—খাই যদি, ভাতই খাব, লুচি নয়। জাতের বালাই আমার নেই। আমি এখনো তারকবাবু হ'য়ে উঠতে পারিনি।

সারদা হাসিয়া বলিল—তারকবাবুর উপর এত বিরূপ কেন দেব্‌তা।

রাখাল বলিল—নিশ্চয়ই তুমি জানো, তারক যার-তার হাতের অন্ন গ্রহণ করেনা !

সারদা হাসিতে লাগিল, জবাব দিলনা।

রাখাল বলিল—চললুম তা'হলে। জিনিষপত্র কিনে একেবারে বাসা থেকে স্নান সেরে বাক্স বিছানা নিয়ে ফিরব এখানে। তুমি প্রস্তুত থেক।

রাখাল বাহির হইয়া গেল। ফিরিয়া আসিল প্রায় পৌনে এগারটায়। একটি ফলের টুক্‌রিতে কমলালেবু, বেদানা, আঙুর প্রভৃতি ফল, তালমিশ্রী, বার্লি, পার্ল সাগু, একটীন উৎকৃষ্ট মাখন, একটীন রোগীর পথ্য হাল্‌কা বিস্কুট ইত্যাদি কিনিয়া আনিয়াছে। এ'ছাড়া, বেড্‌প্যান্‌, হট্‌ওয়াটার ব্যাগ, আইস্‌ ব্যাগ, অয়েল ক্লথ প্রভৃতি রোগীর প্রয়োজনীয় কতকগুলি দ্রব্যসামগ্রীও কিনিয়াছে। আর আছে তার নিজের বিছানা ও বাক্স।

রাখাল ফিরিয়া আসিয়াই ভাত চাহিল। সারদা ঘরের মেঝেয় আসন পাতিয়া ঠাঁই করিয়া রাখিয়াছিল। রাখালকে হাত পা ধুইবার জল ও গামছা আগাইয়া দিয়া ভাত বাড়িয়া আনিল।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল—তুমি তৈরি তো সারদা ?

সারদা জবাব দিল—আমি তো অনেকক্ষণ তৈরি।

রাখাল আসনে বসিয়া নিঃশব্দে আহারে মন দিল। আহারের আয়োজন অতি সামান্যই। কিন্তু, তাহার অন্তরালে যে আন্তরিকতা ও সযত্ন আগ্রহ বর্ত্তমান, তাহার পরিচয় রাখালের অন্তরের অজ্ঞাত রহিলনা। তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করিয়া উঠিলে সারদা আঁচাইবার জল হাতে ঢালিয়া দিল। রাখাল জীবনে কোনও দিন এরূপ সেবা গ্রহণে অভ্যস্ত নহে। সুতরাং তাহার যথেষ্ট বাধো বাধো ঠেকিতেছিল। কিন্তু সারদার এই ঐকান্তিক সাগ্রহ যত্নে বাধা দিতে প্রবৃত্তি হইল না। আঁচাইবার জল হাতে ঢালিয়া দাঁত খুঁটিবার খড়িকা দিল। তারপরে গামছাখানি

রাখালের হাতে তুলিয়া দিয়া সারদা গুটিকয় টাটকা সাজাপান আনিয়া সামনে ধরিল।

রাখাল কহিল—একেই বলে বিধাতার মাপা। কোথায় ষ্টেশনে কেনা খাবার, আর কোথায় সারদার হাতের রান্না অমৃতোপম অন্নব্যঞ্জন? মায় আঁচাবার জল, দাঁত খোঁটার খড়কে, হাত মোছার গামছা, ঘরে সাজা পান। আজ কার মুখ দেখে যে উঠেছিলুম!

সারদা মৃদু হাসিল, কিছু বলিলনা। রাখালের উচ্ছিষ্ট থালা বাটী বাহিরে লইয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—আপনি একটু বসুন। আমি দশ মিনিটের মধ্যেই আসচি।

রাখাল একটি সিগারেট ধরাইয়া লইয়া শূন্য তক্তাপোষের এককোণে বসিয়া পরিতৃপ্তি পূর্ব্বক টানিতে প্রবৃত্ত হইল। চাহিয়া দেখিল, সারদা একখানি মলিন ক্ষুদ্র সতরঞ্চি মোড়া বিছানার ছোট বাণ্ডিল্ তক্তাপোষে রাখিয়া গিয়াছে। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল কাপড়-চোপড়ের পুঁটুলি বা বাক্স নাই।

সারদা ফিরিয়া আসিল সত্য সত্যই দশমিনিটের মধ্যে। রাখাল জিজ্ঞাসা করিল—তোমার খাওয়া হয়েচে সারদা?

সারদা বলিল—খেতেই তো গিয়েছিলাম।

—সে কি? এরই মধ্যে খাওয়া হয়ে গেল? নিশ্চয়ই তুমি ভাল করে খাওনি।

সারদা হাসিয়া কহিল—আজ আমি সবচেয়ে ভাল করে খেয়েচি। দেব্‌তার প্রসাদ কি হেনস্তা করে খেতে আছে? এখন নিন্, উঠুন। সব প্রস্তুত। আপনার তো দেখচি লগেজ্ অনেকগুলি। একটি সুট্‌কেস্, একটি এটাচি কেস্, একটি বিছানা, একটি ফলের ঝুড়ি, একটা প্যাকিং বাক্স, মায় একটি জীবন্ত লগেজ্ পর্য্যন্ত।

রাখাল সারদার পরিহাসের জবাব না দিয়া বলিল—তোমার তো বেডিং প্রস্তুত দেখচি। কাপড়-চোপড়ের বাক্স কই?

সারদা বলিল—খান তিনেক শাড়ী আর গোটা দুই সেমিজ ঐ বিছানার সঙ্গেই বেঁধে নিয়েচি।

রাখাল বিস্মিত হইয়া কহিল—ওতে কুলুবে কেন?

সারদা মৃদু হাসিয়া বলিল—যথেষ্ট। ময়লা হলে সাবান দিয়ে সাফ্ করে নেব। যা নিত্য এখানে করি।

রাখাল একটুখানি গুম হইয়া রহিল। বারংবার মনে হইতে লাগিল বলে,—কাপড়ের তোমার এত অভাব, এটা কি আমাকে জানালে তোমার অপমান হ'ত সারদা?—কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিলনা। রাগের ঝোঁকে টাকা ফেরৎ লইবার কথা মনে পড়ায় নিজেকে অপরাধী মনে হইতে লাগিল। রাখাল উদাস কণ্ঠে কহিল, তা'হলে এবার ট্যাক্সি নিয়ে আসি।

সারদা সচকিতে বলিয়া উঠিল—ওমা,—বলতে একেবারেই ভুলে গেছি দেব্‌তা—আপনি বাজার করতে বেরিয়ে যাবার একটু পরেই বিমলবাবু এসেছিলেন। তিনি বলে গেছেন একটা জরুরী কাজে যাচ্ছেন, এখনই ফিরে আসবেন। আপনার সঙ্গে তাঁর দরকার আছে। তিনি তাঁর মোটরে আমাদের ষ্টেশনে পৌঁছে দেবেন বলে গেছেন।

রাখালের মুখ-ভাবের কোমলতা অন্তর্হিত হইল। শুষ্ক স্বরে কহিল—আজকে আর তাঁর সঙ্গে দেখা করবার সময় নেই সারদা। ফিরে এলে দেখা হবে দেরী করা চলেনা, আমি ট্যাক্সি আন্‌তে চল্‌লুম। রাখালের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সদর দরজার সম্মুখে মোটরের হর্ণ্ শোনা গেল এবং উঠান হইতে বিমলবাবুর আওয়াজ পাওয়া গেল—সারদা মা—

সারদা বাহির হইয়া বলিল—আসুন।

বিমলবাবু ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—এই যে রাজু এসে গেছ। ভাগ্যে আজ এদিকে একটা দরকারে এসেছিলাম! মনে হল, পাশেই যখন এসে পড়েচি, সারদা-মাকে একবার দেখে যাই। এসে শুনলাম, ব্রজবাবুর অসুখের তার পেয়ে তোমরা আজই রওনা হচ্চ। চলো তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসি। বড় গাড়ীটাতেই আজ বেরিয়েচি, মালপত্র নেওয়ার অসুবিধা হবেনা।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাখাল আপত্তি করিতে পারিলনা। জিনিসপত্র গাড়ীতে উঠানো হইলে বিমলবাবু রাখালের হাত ধরিয়া বলিলেন—রাজু, আমার একটি অনুরোধ রেখো। ব্রজবাবুর অসুখে যদি কোনওরকম সাহায্যের প্রয়োজন বোঝো, আমাকে তার করতে ভুলোনা। রোগে অর্থবল ও লোকবল দুয়েরই দরকার। তুমি জানালে তৎক্ষণাৎ বড় ডাক্তার নিয়ে রওনা হতে পারব। আমি ব্রজবাবু ও রেণুর অকৃত্রিম হিতার্থী, বিশ্বাস করতে দ্বিধা কোরনা।

বিমলবাবুর কণ্ঠের গাঢ়তায় রাখাল বোধ হয় একটু অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই ঈষৎ আশ্চর্য্য ভাবেই তাঁহার মুখের পানে তাকাইল।

ম্লান হাসিয়া বিমলবাবু বলিলেন—আমি জানি রাজু তোমার চেয়ে বড় বন্ধু আজ তাঁদের আর কেউ নেই। তবুও—আমার দ্বারা যদি তাঁদের কোনও দিক থেকে কোনও উপকার বিন্দুমাত্রও সম্ভব মনে করো, খবর দিতে ভুলোনা। এইটুকু তোমায় জানিয়ে রাখলাম।

রাখাল কি-যেন বলিতে যাইতেছিল, বিমলবাবু বলিলেন—রেণু আর ব্রজবাবু আজ কত বেশি অসহায় আমি তা' জানি রাজু!

রাখালের দুই চোখ সজল হইয়া উঠিল। বলিল—আপনার প্রতি অবিচার করেচি, আমাকে ক্ষমা করবেন। কাকাবাবুর অসুখে যদি কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হয়, আপনাকে সংবাদ দেব।

১৯

তারকের সুনিপুণ সেবায় যত্নে ও সুন্দর ব্যবহারে সবিতার পরিক্লান্ত মন অনেকখানি স্নিগ্ধ হইয়াছিল। উচ্ছ্বসিত বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত অন্তর লইয়া সবিতা তারকের প্রতি ব্যবহার, প্রতি কর্ম্ম, প্রতি কথাবার্ত্তার মধ্যে আশ্চর্য্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইতেছিলেন। তারকও সবিতাকে নিজের মায়ের মতই শুধু নয়, দেবতাকে ভক্ত যেমন নিরঙ্কুশ ত্রুটীহীনতায় সেবা করে তেমনই ভাবে সেবা-যত্ন ও সমাদরের বিন্দুমাত্র অবহেলা করে নাই।

কথাপ্রসঙ্গে সবিতা একদিন তারককে প্রশ্ন করিলেন—তারক, তুমি আমাকে যে হরিণপুরে নিয়ে এলে বাবা, রাজুকে কি তা' জানাওনি ?

একটু কুণ্ঠিতভাবে তারক উত্তর দিল—না মা।

বিস্মিত হইয়া সবিতা বলিলেন—কিন্তু তাকেই তো তোমার সবার আগে জানানো উচিত ছিল তারক।

তারক কহিল—কেন জানাইনি সেকথা আপনাকে অন্য একদিন বলব মা।

সবিতা অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া বলিলেন—দুই বন্ধুর ভিতরে তোমাদের এমন কি ব্যাপার এরই মধ্যে ঘটে গেল, যা' মাকেও জানাতে কুণ্ঠিত হতে হচ্চে বাবা!

নতমুখে তারক কহিল—রাখাল হয়তো সে-অভিযোগ আপনাকে জানিয়েচে কিংবা না জানিয়ে থাকলে শীঘ্র একদিন জানাবেই। সেজন্য আমিও আপনাকে সমস্ত বলবো ঠিক করেচি মা!

তারকের কুণ্ঠিত মুখের দিকে ক্ষণকাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া সবিতা বলিলেন—রাজুর তুমি ঘনিষ্ঠ বন্ধু শুনেচি। আমি জানতাম তাকে তুমি চেনো। এখন বুঝতে পারছি, তুমি আমার রাজুকে চেনোনি বাবা!

তারক চঞ্চল হইয়া বলিল—কেন মা?

সবিতা বলিলেন—যত বড় অন্যায়ই যে-কেউ তার উপরে করুকনা,—রাজু দুনিয়ায় কারো কাছে কারো নামে কখনো অভিযোগ করেনি, করবেওনা। অভিযোগ করার শিক্ষা জীবনে সে পায়নি তারক, সহ্য করার শিক্ষাই পেয়েছে।

তারক আরও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। বলিল—আমাকে মাপ করুন মা। আমার বলবার দোষে ভুল বুঝবেননা। বলতে চেয়েছিলাম রাখালের কাছে আপনি আমার সম্বন্ধে যে-ঘটনা শুনেছেন কিংবা শুনবেন, সেটা বাহ্যতঃ সত্য হলেও সমস্ত সত্য নয়।

সবিতা হাসিয়া কহিলেন—আমি রাজুর কাছে কিছুই শুনিনি বাবা, কোনওদিন শুনতে পাবওনা, সে সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

তারক অকস্মাৎ ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া বক্তৃতার ভঙ্গীতে হাত মুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিল—কিন্তু এটা আমি কিছুতেই মানতে পারবোনা মা, আপনার কাছেও আমাদের বিচ্ছেদের কারণ গোপন করা তার উচিত হয়েছে! আপনি শুধু তাকে স্নেহরসে ও অন্নরসেই পুষ্ট করে তোলেননি, আপনার কাছেই পেয়েছে সে তার শিক্ষা দীক্ষা যা' কিছু সমস্ত। আজ সে যে পৃথিবীতে এখনও বেঁচে আছে এবং ভদ্রলোকের মতই বেঁচে আছে, এর জন্য বিপুল ঋণ তার কার কাছে? কার আশ্চর্য্য অসাধারণ মন অসাধারণ জীবন রাখালের দৃষ্টি ও মনকে এতখানি প্রসার করে তুলেছে! কার অপার স্নেহ, অন্তরাল হতে বিধাতার করুণার মতই তার জীবনকে

সতর্কভাবে রক্ষা করে আসচে। সেই মায়ের কাছে সত্য গোপন করা আমি ন্যায় বলে মানতে পারবনা মা। আপনি বললেও নয়।

এক নিশ্বাসে এতখানি বক্তৃতা করিয়া তারক দম্ লইতে লাগিল।

সবিতা স্থিরদৃষ্টিতে তারকের পানে তাকাইয়া শুনিতেছিলেন। ধীরকণ্ঠে কহিলেন—তারক, তোমাদের মধ্যে কি হয়েচে বাবা?

—বলি শুনুন তা'হলে মা। রাখাল আমার কাছে আপনার পরিচয় যা' দিয়েছিল, যদি আপনাকে সত্যিই সে নিজের মা বলেই জ্ঞান করতো, তা'হলে সে-পরিচয় দিতে কখনই পারতনা।

সবিতা কোনও কথা কহিলেননা এবং তাঁহার সস্মিত মুখভাবেরও কোনো পরিবর্ত্তন দেখা গেলনা।

তারক পুনরায় সোৎসাহে বলিতে প্রবৃত্ত হইল,—আপনি বলেছিলেন মা, কারু সম্বন্ধে কোনও কথা উপযাচক হয়ে বলা তার প্রকৃতি নয়। কিন্তু আমিই তো তার বিপরীত প্রমাণ পেয়েছি। সে উপযাচক হয়েই আমার কাছে তার নতুন-মার এমন পরিচয় দিয়েছিল, যা' আমার জানবার কোনও প্রয়োজনই ছিলনা। কিন্তু নির্ব্বোধ বোঝেনি, আগুনকে ছাই বলে নির্দ্দেশ করলে প্রথমে হয়তো মানুষ ভুল করতে পারে, কিন্তু সে-ভুল বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়না। অগ্নি নিজের পরিচয় নিজেই প্রকাশ করেন।

সবিতা এবারও জবাব দিলেননা। পূর্ব্ববৎ সপ্রশ্নদৃষ্টি মেলিয়া মৌনই রহিলেন।

তারক বলিতে লাগিল—অবশ্য আমি স্বীকার করি মা, সে যখন অনেককিছু অতিরঞ্জিত কাহিনী শুনিয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছিল—এ' সকল শুনে আমার ঘৃণা হচ্ছে কিনা? আমি জবাব দিয়েছিলাম—ঘৃণা হওয়াটাই তো স্বাভাবিক রাখাল। তখন তো জানতামনা তার উদ্দেশ্যই

ছিল আপনার 'পরে আমার অশ্রদ্ধা জাগিয়ে দেওয়া। তা' নাহলে এ'সব কথা বলার তার কোনও প্রয়োজনই ছিলনা।

সবিতা এইবার কথা কহিলেন। শান্তকণ্ঠে বলিলেন—রাজু মিথ্যা-কথা বলেনা তারক। সে যা' কিছু তোমাকে বলেচে, সমস্তই সত্যি।

তারকের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। আমতা-আমতা করিয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিল—আপনি জানেননা মা, সে যে কি-ভয়ানক কথা—

সবিতা কহিলেন—জানি। তুমি যা'ই কেন শুনে থাকনা তারক, রাজুর মুখের কোনও কথাই মিথ্যা নয়।

তারকের কণ্ঠনালী কে যেন শক্ত মুঠায় চাপিয়া স্বররোধ করিয়া ফেলিল। চেষ্টা সত্ত্বেও আর একটি শব্দও কণ্ঠ হইতে নির্গত হইলনা।

সবিতা ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—তুমি রাজুর প্রতি শুধু ভুলই করোনি তারক, অবিচার করেচ। সে তোমাকে ভুল বোঝাতে চায়নি, বরং তুমিই পাছে কিছু ভুল বোঝো, সেই ভয়ে গোড়াতেই সমস্ত ঘটনা খোলাখুলিভাবে তোমাকে সে জানিয়েচে। যদি মনে করে থাকো তার কথা মিথ্যে, তা'হলে খুবই ভুল করেচো।

তারক শুষ্কস্বরে কহিল—কিন্তু মা, আমি তো কিছুই জানতে চাইনি, সে উপযাচক হয়ে কেন—

সবিতা মলিন হাসিয়া কহিলেন—তুমি উচ্চশিক্ষিত, বুদ্ধিমান। সমস্তদিকে মন মেলে চিন্তা করে ভাল-মন্দ বিচারের শক্তি তোমার থাকাই সম্ভব। সংসারে দৃশ্যতঃ অনেক জিনিসই হয়তো আমরা একরকম দেখতে পাই, কিন্তু সাদৃশ্য থাকলেও তারা সমস্তই বস্তুতঃ এক নয়। তাছাড়া—এটা ত জানো—বাহির দিয়ে ভিতরের বিচার কোনও সময়েই করা চলেনা। এ সকল বিষয় সাধারণ লোকে বোঝেনা এবং বুঝতে চায়ওনা।

কিন্তু তুমি তাদের দলের নও রাজু তা জানত বলেই সে তার নতুন-মায়ের দুর্ভাগ্যের কাহিনী তোমার কাছে খুলে জানিয়েছিল।

তারক অনেকক্ষণ নতমুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পরে মুখ তুলিয়া কহিল—রাখাল আমাকে বলেছিল মা একদিন, সংসারে হাজারের মধ্যে ন'শো নিরেনব্বই জন সাধারণ মেয়ে, ক্কচিৎ কখনও একটি অসাধারণ মেয়ে দেখতে পাওয়া যায়।—নতুন-মা সেই ন'শো নিরানব্বইয়ে পর ক্কচিৎ-মেলা একটি মেয়ে। এঁকে কেউ ইচ্ছা করলেও অবজ্ঞা বা অবহেলা করতে পারেনা। সে সত্যি কথাই বলেছিল।

সবিতা কথা কহিলেননা। অন্যমনস্কে অন্যদিকে চাহিয়া রহিলেন। তারক একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া কণ্ঠস্বরে অনেকখানি আবেগ আনিয়া বলিতে লাগিল—শিশুবয়সে মাকে হারিয়েচি জ্ঞান হবার আগেই, চিনতাম কেবলমাত্র বাবাকে। বাবাই আমাকে নিজহাতে মানুষ করেছিলেন, বড় করেছিলেন। সেই বাবা যখন আত্মসুখলোভে এনে দিলেন মাতৃহারা হতভাগ্য সন্তানকে এক বিমাতা, সেই দিনই দুঃখে অভিমানে ঘৃণায় চলে এসেছিলাম দেশত্যাগী হয়ে। বাপের মুখ আর দেখিনি, দেশেরও নয়। আপনাকে পেয়ে মা, জীবনে নতুন করে পেলাম পিতৃমাতৃ স্নেহের আস্বাদ। আমার কাছে আপনি 'মা' ছাড়া অন্য আর কিছুই নয়। আপনার জীবনে যে-ঝড়, যে-আঘাত, যে-গুরুতর পরীক্ষাই এসে থাক্‌না, আপনার হৃদয়ের অপরিমেয় মাতৃস্নেহকে তা বিন্দুমাত্র শোষণ করতে পারেনি। সন্তানের পক্ষে এইটেই সবচেয়ে বড় পাওয়া।

সবিতা বলিলেন—তোমার বাবা এখনও জীবিত?—তবে যে তুমি একদিন আমাকে বলেছিলে তুমি পিতৃমাতৃহীন?

তারক হাসিয়া কহিল—ঠিকই বলেছি মা।—আমার জন্মদাতা

হয়তো আজও জীবিত থাকতে পারেন, আমার বাবা কিন্তু জীবিত নেই। পিতার মৃত্যু না ঘটলে মাতৃহারা অভাগা সন্তানের জীবনে বিমাতার আবির্ভাব ঘটেনা, এইই আমার বিশ্বাস।

সবিতা বিস্মিতনেত্রে তারকের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

তারক বলিতে লাগিল—জীবনে আমার বৃহৎ আশা ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা অনেক। শুধু খেয়ে-পরে কোনও রকমে জীবনধারণ করে বেঁচে থাকতে চাইনে। আমি চাই প্রাচুর্য্যের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সার্থক-সুন্দর জীবন নিয়ে বাঁচতে। হাজার জনের মাঝখানে আমারই প্রতি সবার দৃষ্টি পড়বে, হাজার নামের মাঝখানে আমার নামটি চিনতে পারবে সকলেই। কর্ম্মজীবনের সার্থকতায়, যশে গৌরবে সম্মানে প্রতিপত্তিতে উন্নত বৃহৎ জীবন নিয়ে বাঁচবো এই আমি চাই। শুধু অর্থ উপার্জ্জনই জীবনের একান্ত কামনা নয়, শুধু স্বচ্ছন্দ-জীবিকানির্ব্বাহই আমার চরম লক্ষ্য নয়।

সবিতা স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন—এ ত খুব ভাল বাবা! পুরুষমানুষের জীবনে এমনিতরই উচ্চ-আকাঙ্ক্ষার প্রয়োজন। লক্ষ্য থাকবে যত উঁচু, যত বিস্তৃত,—জীবনও হবে তত উন্নত তত প্রসারিত।

তারক উৎসাহিত হইয়া কহিল—আপনাকে তো জানিয়েইছি মা, কত দুঃখে-কষ্টে, কত বাধায়, নিজে আত্মনির্ভর হয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাপগুলো উত্তীর্ণ হয়েছি। আমি বড় জেদী মা। যা' করবো বলে সংকল্প করি,—বিশ্রাম থাকেনা, আমার যে-পর্য্যন্ত না তা' সিদ্ধ হয়।

সবিতা স্মিত মুখে তারকের যৌবনোচিত আশা আকাঙ্ক্ষা উৎসাহদীপ্ত মুখখানির পানে তাকাইয়া অন্য মনে কি ভাবিতে লাগিলেন।

তারক বলিতে লাগিল—আমার জীবনের সমস্ত কাহিনী একমাত্র আপনাকেই খুলে বলেছি মা। কি-জানি-কেন এক এক সময়ে মনে হয়,

জীবনে বুঝি কিছুই পাইনি, কিছুই পেলামনা। মনে হয় যদিই কোনওদিন লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করি, তা'তে কি আর লাভ হবে? যশেও যদি দেশদেশান্তর ভরে যায়, তাতেই বা কি? সম্মান—প্রতিপত্তির সবচেয়ে উঁচু চূড়াতে উঠলেও কি আমার আশৈশবের অতৃপ্ত তৃষ্ণা মিটবে? চিরদিন যে-অভিমান যে-দুঃখ নিজের গোপন অন্তরের মধ্যেই একাকী বহন করলাম, বিধাতার কাছে পর্য্যন্ত জানালাম না অভিযোগ, সে-বেদনা কি কোনোদিন দূর হবে আমার এই অর্থ মান যশ বা কর্ম্ম জীবনের চরিতার্থতা দিয়ে? সমস্ত প্রাণ যেন হা হা করে ওঠে, মুশ্ড়ে পড়ে যা' কিছু কর্ম্মের উৎসাহ, আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপনা। মনে হয়েচে, অদৃষ্টদেবতা যে-মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে শৈশবেই করেছেন মাতৃস্নেহে বঞ্চিত, সে-যে কতো বড়ো দুর্ভাগ্য নিয়ে মানুষেরহাটে এসেচে, সে কথা কাউকে বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা করেনা।

জীবজগতে স্রষ্টার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান মাতৃস্নেহ, সেই-স্নেহেই যে আজীবন বঞ্চিত, তার আর—বেদনার আবেগে তারকের কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া আসিল।

সবিতার চোখের কোণ সজল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কিছুই বলিলেননা, সান্ত্বনাও দিলেননা। মুখে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল গভীর সহানুভূতির ছায়া। যে-নিবিড় বেদনা তিনি নিঃশব্দে অতি সঙ্গোপনে অন্তরের নিভৃতে একাকী বহন করিয়া আসিতেছেন সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া, তাঁহার সেই বেদনাস্থানই তারক করিয়াছে আজ অজ্ঞাতে স্পর্শ। তারকের শেষের কথা কয়টি সবিতার সমগ্র অন্তর আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। নিঃশব্দে নতনয়নে তিনি নিজের অশান্ত হৃদয়াবেগ সংযত করিতে লাগিলেন।

সদর দরজায় পিওন্ হাঁকিল চিঠি—

তারক বাহিরে গিয়া পত্র লইয়া আসিল।

সবিতার নামে চিঠি। সারদা লিখিয়াছে। সংবাদ দিয়াছে বিমলবাবুর সহিত রাজুর দেখা হইয়াছিল রাস্তায়। তাঁহার মুখে বিমলবাবু সংবাদ পাইয়াছেন,—দেশে কন্যা সহ ব্রজবাবু কুশলেই আছেন।

সবিতা পত্র পাঠ করিয়া হাসিয়া বলিলেন—রাজু বোধহয় সারদার সাথে দেখা করতে আসেনা। আসবেই বা কি-করে, সে হয়তো জানেইনা সারদা হরিণপুরে আসেনি। তারক কথা কহিলনা।

সবিতা আবার বলিলেন—দেখি, আমিই না হয় তাকে একখানা চিঠি লিখে দিই। এক কাজ করোনা তারক, তুমি তাকে এখানে আসবার নিমন্ত্রণ করে চিঠি লেখো, আমিও তার সঙ্গে লিখে দেবো এখানে আসতে। এখানে সে এলে তোমাদের দুই বন্ধুর মান-অভিমানের মীমাংসা হয়ে যাবে।

তারক বলিল—বেশতো। আমি লিখে দিচ্চি আজই।

সবিতা স্নেহ স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন,—রাজু আমার বড় অভিমানী ছেলে। কিন্তু তার অন্তরের তুলনা কোথাও দেখলামনা।

কথাটা সবিতা বলিলেন এমনি সহজ ভাবেই, কিন্তু তারকের চিত্তে ইহা অন্য অর্থে আঘাত করিল। তাহার মনে হইতে লাগিল নতুন-মা বোধহয় তাহারই অন্তঃকরণের সহিত তুলনা করিয়া রাজুর সম্বন্ধে এই কথা বলিলেন। তাহার মুখ হইয়া উঠিল অন্ধকার, বাক্য হইয়া গেল নিস্তব্ধ।

সবিতা তাহা লক্ষ্য না করিয়াই বিগলিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—রাজুর কথা যখন ভাবি তারক, তখন মনে হয়, আমার রাজু বেশি স্নেহের ধন না রেণু? রাজু আর রেণু ওদের দুজনের মধ্যে কে-বেশি আর কে কম আমি ঠিক করে উঠতে পারিনে।

তারক বলিয়া উঠিল—নিজের অন্তর তা' হলে এখনও আপনি চেনেননি মা। রেণুর সঙ্গে রাজুর কোনো তুলনাই হতে পারেনা।

সবিতা বলিলেন—কেন বলোতো?

—রাজুকে আপনি যতই আপন সন্তানের তুল্য ভাবুননা কেন, তবু সেটা আপন সন্তানের 'তুল্য'ই থেকে যাবে। তুল্য বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ আপন সন্তান হয়ে উঠবেনা। উঠতে পারেওনা।

সবিতা বলিলেন—সকল ক্ষেত্রে সব ব্যাপার একরকম হয়না তারক।

—তা' জানি মা। তবু বলি শুনুন। আপনি নিজেই বিচার করে দেখুন, আপনার অন্তরের স্নেহাধিকারে রেণু আর রাজুর সমান দাবী যতই থাকনা, পার্থক্য যে কত বেশি, তা' দেখিয়ে দিচ্চি। ধরুন, আপনার এই হরিণপুরে আসা। রওনা হবার আগের রাত্রে শুনলাম, রাখাল আপনাকে নিষেধ করেছিল হরিণপুরে আসতে। আপনি নাকি বলেছিলেন,—ছেলে বড় হলে তার সম্মতি নেওয়া দরকার। তাই শুনে সে অসম্মতিই জানিয়েছিল, আপনি তা' ঠেলে চলে এলেন আমার এখানে। কিন্তু মা, রেণু যদি আপনার এখানে আসায় এতটুকু অনিচ্ছার আভাস মাত্র জানাত, আপনি হরিণপুরে আসা তখনিই বন্ধ করে দিতেন নিশ্চয়।

সবিতা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—আমি জানতাম তারক, রাজু কেবলমাত্র অভিমান বশে রাগ করেই আমাকে আসতে নিষেধ করেছিল। ওটা তার তর্ক বা জেদ্ মাত্র। সত্যি সত্যিই যদি আমাকে এখানে পাঠাবার তার অনিচ্ছা থাকত, তা'হলে আমি কখনই আসতে পারতামনা বাবা।

—কিন্তু ধরুন, রেণু যদি কেবলমাত্র জেদ কিংবা তর্ক করেই আপনাকে কোনওখানে যেতে নিষেধ করতো, আপনি তার সেই তর্ক ও জিদেরও খাতির না রেখে পারতেন কি মা?

সবিতা মৌন হইয়া রহিলেন। বহুক্ষণবাদে ধীরে ধীরে বলিলেন—তুমি ঠিকই বলেচ তারক। মানুষ নিজের অন্তরকেই বোধহয় সবচেয়ে কম চেনে। তবে একটা কথা। রাজু আমার কাছে রেণুর বাড়া না

হতে পারে, আমি কিন্তু রাজুর কাছে মায়ের বাড়া। আমার দিক্ দিয়ে না হোক্, রাজুর নিজের দিক দিয়ে কিন্তু ও আমার রেণুরও বাড়া। এখানে আমার ভুল হয়নি।

তারক চুপ করিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে প্রসঙ্গান্তর উত্থাপন করিয়া কহিল—বিমলবাবুর চিঠি তো কই এলোনা মা আজও।

সবিতা বলিলেন—তুমি কি তাঁকে সম্প্রতি চিঠি লিখেচ?

—লিখেচি বৈকি! আপনাকেও তিনি চিঠি দেন্‌নি বোধহয় আট দশ দিন হবে। তাই নয় কি?

—হ্যাঁ। কিন্তু আমি তাঁর আগের চিঠির জবাব এখনও পর্য্যন্ত দিইনি। সেই জন্যই বোধহয় আমাকে চিঠি লেখেননি। কারণ, তিনি যে কুশলে আছেন, সারদার পত্রে তো তা' জানতেই পাচ্চি।

তারক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল—ঐ একটি মানুষ দেখলাম মা। যাঁর পায়ের কাছে আপনিই মাথা নিচু হয়ে আসে।

সবিতা জবাব দিলেননা।

তারক আপনা আপনিই বলিতে লাগিল—কি মহৎ মন, উদার চরিত্র সুন্দর মানুষ। প্রকৃত কর্ম্মবীর। জীবনে এমন সার্থককাম পুরুষ অল্পই চোখে পড়ে।

সবিতা মৃদু হাসিয়া বলিলেন—ও-কথা কি-হিসাবে বলচো তারক? একমাত্র আর্থিক উন্নতি ভিন্ন সংসারে—উনি আর কোন্ চরিতার্থতা লাভ করেছেন? কি-ই বা বড়ো আনন্দ সঞ্চয় করতে পেরেছেন সারা জীবনে?

তারক উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে বলিয়া ফেলিল—যে-পুরুষ নিজেরই সামর্থ্যে অমন বিপুল অর্থ অনায়াসে উপার্জ্জন করতে পারেন, এমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্যবসায় গড়ে তুলতে পারেন, তাঁর জীবনে অন্য ছোটখাটো সার্থকতা কিছু ঘটুক বা না-ঘটুক তা' নিয়ে আক্ষেপ নেই মা। পুরুষমানুষের

কর্ম্মময় জীবনের এই রকম বিরাট সার্থকতার চেয়ে আর অন্য কি কাম্য থাকতে পারে বলুন ?

সবিতা হাসিলেন, জবাব দিলেননা। তারকের মুখে পুরুষমানুষের জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত তিনি অনেক বড় বড় কথা ও বৃহত্তর কল্পনাই শুনিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু তাহার নিজের ব্যক্তিগত জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা সার্থকতার লক্ষ্য কোন্ পথে, তাহা সে কোনওদিন স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই বা করে নাই। সবিতা তারকের জীবনের প্রধান লক্ষ্য এবং আশা আকাঙ্ক্ষার স্বরূপের ঈষৎ আভাস এইবার যেন দেখিতে পাইলেন। তাঁহার চিন্তাধারা কেমন এক অনির্দ্দিষ্ট শূন্যতার মধ্যে হারাইয়া গেল।

শিবুর মা আসিয়া ডাকিল—মা, বেলা হয়ে যাচ্ছে, রান্না চড়াবেন চলুন।

তারক বলিল—অনেকদিনই তো মায়ের হাতের অমৃত প্রসাদ পেলাম। এইবার রাঁধুনীটাকে হাঁড়ি ধর্‌তে অনুমতি দিন্। এই দারুণ গরমে আগুন-তাতে আপনার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে—

সবিতা হাসিয়া বলিলেন—আগুন-তাতে রান্না করলে বাঙালী মেয়েদের স্বাস্থ্য ভাঙেনা তারক, উন্নতি হয়।

—সে সাধারণ বাঙালী মেয়েদের হতে পারে মা, আপনি তাদের দলে ন'ন্ আমি জানি।

—তুমি কিচ্ছু জানোনা বাছা।

—না মা, আমি শুনবোনা। কলকাতার বাসায় আপনার রাঁধুনী বামুন ছিল দেখেচি। এখানে কেন আপনি রাঁধুনীর হাতে খাবেননা বলুনতো ? রাঁধুনীর হাতে খেতে প্রবৃত্তি হয়না এটা আপনার বাজে-ওজর। আসল কথা, নিজে পরিশ্রম করতে চান্।

—তাইই যদি হয় তারক, তাতে আপত্তি কেন বাবা ?

অকৃত্রিম আন্তরিকতায় প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া তারক কহিল—না তা' হয়না। আমার রাজরাজেশ্বরী মাকে আমি প্রতিদিন রাঁধতে বাটনা বাটতে কাপড় কাচতে দিতে পারবোনা। এ সত্যিই আপনার কাজ নয় যে মা!

সবিতার চক্ষুর্দ্বয় সজল হইয়া উঠিল। একান্ত অন্যমনস্কচিত্তে কি-যেন ভাবিতে লাগিলেন। কিছুই বলিলেননা।

তারক বলিল—আজ থেকে ঝি আর রাঁধুনী আপনার কাজ করবে, আমি বলে দিচ্চি ওদের। আর আপনার এ-সব অত্যাচার চলবেনা কিন্তু।

সবিতা সকরুণ হাসিয়া কহিলেন—তারক, আমার 'পরেই অত্যাচার হবে বাবা, যদি আমাকে এইটুকু কাজকর্ম্মও করতে না দাও। আমি তোমাকে স্পষ্ট বলচি, রাঁধুনীর রান্না আর আমার গলা দিয়ে নামবেনা। দাসী চাকরের সেবা গায়ে আমার বিছুটীর চাবুক মারবে। এ' জেনেও যদি তুমি আমার নিজের কাজের জন্য চাকর চাকরাণী বাহাল করতে চাও, আমি নিরুপায়!

তারক বিস্ময়াভিভূত হইয়া কহিল—আপনি কি চিরদিনই এমনি ভাবে নিজের সমস্ত কাজ নিজেই করবেন মা?

সবিতা কহিলেন—চিরদিন করবো কিনা জানিনে বাবা। তবে আজকে আমি পারছিনে সইতে দাস দাসীর সেবা, এইটুকু মাত্র বলতে পারি। ঈশ্বর যদি কখনও মুখ তুলে চান্, তোমারই কাছে আবার এক সময় এসে খাটে পালঙ্কে বসে থেকে চাকর দাসীর সেবা নেব বাবা!

তারক সবিতার কথার রহস্যভেদ করিতে পারিলনা। দুঃখিত চিত্তে নির্ব্বাক হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে কহিল—মা, মানুষকে মানুষ 'ছোট' ভাবে কি করে, তাই ভাবি। আমি কিন্তু মানুষের পরিচয় একমাত্র মানুষ ছাড়া জাত গোত্র কুলশীল দিয়ে আলাদা করে' ভাবতে

পারিনে। সেই জন্য আমার কাছে মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব শাক্ত সমস্তই সমান।

সবিতার বিষাদগম্ভীর মুখে আনন্দের আভা ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—আমি তা' জানি তারক। তোমার অন্তঃকরণ কতো যে উঁচু ও উদার, তোমার সাথে পরিচিত হবার পূর্ব্বেই তা জেনেছি। তোমাকে আমি স্নেহ করি, বিশ্বাস করি বাবা।

তারক বিস্ময় ও কৌতূহলমিশ্র কণ্ঠে কহিল—আমাকে দেখার আগে থেকেই আমার পরিচয় জেনে ছিলেন মা? কই, এত দিন তো বলেননি!

সবিতা সস্নেহে মৃদু হাসিলেন।

তারক কহিল—কিন্তু, যার কাছেই আমার কথা শুনে থাকুননা কেন, আমিযে বিশ্বাসের উপযুক্ত, তা' কি করে জানলেন বলুন তো?

মমতাকোমলকণ্ঠে সবিতা কহিলেন—কি-করে যে জানলাম তা' নাই বা শুনলে বাবা! তবে, জেনেছি বলেই তোমার স্নেহের আহ্বান রাখতে রাজুরও মনে ব্যথা দিয়ে এখানে এসেচি, এতে কোনও ভুল নেই।

তারক অভিভূত স্বরে কহিল—আমাকে এত স্নেহ এত বিশ্বাস করেন মা?

সবিতা গভীরকণ্ঠে বলিলেন—শুধু বিশ্বাস নয় বাবা, তারও চেয়ে বড় কথা, তোমার উপরে নির্ভর করার সাহস আমি পেয়েচি। তুমি তো জানো তারক, আমার ছেলে নেই। রাজু আমার ছেলের অভাব পূর্ণ করলেও এখনও কিছু অপূর্ণ আছে। তোমাকেই সে শূন্যতা পূর্ণ করতে হবে বাবা।

তারক বিস্ময় বিমূঢ় চিত্তে অভিভূতের মত চাহিয়া রহিল।

সারদাকে লইয়া রাখাল যখন ব্রজবাবুর শয্যাপার্শ্বে গিয়া পৌঁছিল, রোগের প্রবল প্রকোপ তখন কতকটা সামলাইয়া উঠিলেও তিনি সম্পূর্ণ নিরাময় হন্ নাই। এই অসুস্থতায় ব্রজবাবু দেহের সহিত মনেও নিরতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাখালকে দেখিয়া তাঁহার নিমীলিতনেত্র বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। স্বভাবতঃ কোমলচিত্ত রাখাল তাহার পিতৃতুল্য প্রিয় কাকাবাবুর অসহায় অবস্থা দেখিয়া চোখের জল সংবরণ করিতে পারিলনা।

ব্রজবাবু মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—রাজু, তোমাকে আমি ডেকেচি।

বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠ পরিস্কার করিয়া লইয়া কহিলেন—তোমার বোনটিকে দেখবার কেউ নেই বাবা। ওর জন্যেই তোমাকে ডাকা।

রাখাল কথা কহিলনা। ব্রজবাবু অতিশয় ক্ষীণস্বরে বলিতে লাগিলেন—রাজু, এখানে এরা আমাকে 'একঘরে' করে রেখেচে। আমার গোবিন্দজী তাঁর নিজের ঘরে ঢুকতে পাননি, তাঁর নিজের বেদীতে উঠতে পাননি। রেণু আমার গোবিন্দজীর ভোগ রাঁধে বলে সকলেরই আপত্তি।—আমি অবর্ত্তমানে এখানে কেউ আমার রেণুর ভার নেবেনা। ওকে তুমি নিয়ে গিয়ে ওর বিমাতার কাছেই পৌঁছে দিও। হেমন্ত রাগ করবে জানি। কিন্তু আশ্রয় দেবে নিশ্চয়। এছাড়া আর তো কোনও উপায় খুঁজে পাচ্চিনি বাবা।

রাখাল চুপ করিয়াই রহিল। পিতৃহীনা, কপর্দ্দকশূন্যা অনূঢ়া রেণুকে

তাহারে বিমাতা ও বিমাতার বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন ভ্রাতা নিজেদের সংসারে গ্রহণ করিবেন কিনা সে-সম্বন্ধে সে যথেষ্ট সন্দিহান ছিল। তথাপি মুখে কিছুই বলিলনা।

ব্রজবাবু বলিতে লাগিলেন—ওর বিয়েটা দিয়ে যেতে পারলে নিশ্চিন্ত মনে গোবিন্দর পায়ে ঠাঁই নিতে পারতাম। অন্তিম সময়ে একান্তচিত্তে গোবিন্দকে স্মরণ করতেও বাধা পাচ্চি রাজু। রেণুর জন্য দুশ্চিন্তা আমাকে শান্তিতে মরতে দিচ্চেনা।

রাখাল কহিল—এখন ওসব কেন ভাবচেন কাকাবাবু? আপনার এমন কিছুই হয়নি, যার জন্যে রেণুকে এখনি হেমন্তমামার কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে! আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন, আমি নিজে এবার রেণুর বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লাগছি।

ব্রজবাবু করুণ হাসিয়া কহিলেন—কিন্তু রেণু যে বিয়ে করবেনা বলে রাজু!

রাখাল বলিল—ছেলেমানুষ একটা কথা বলেচে বলেই কি সেইটেই চিরদিন মেনে চলতে হবে? তখন আপনার অতবড় সর্ব্বনাশের মধ্যে দুঃখ-কষ্টের ধাক্কায় সে ওকথা বলেছিল। কিন্তু, আজ আপনার এই অবস্থা দেখে তার বুঝতে কি দেরি হবে যে তার জীবনে অন্য আশ্রয় গ্রহণের একান্ত প্রয়োজন হয়েছে।

ব্রজবাবু অত্যন্ত মলিন হাসিয়া কহিলেন—রাজু, রেণু তোমার নতুন-মার মেয়ে। সংসারে একমাত্র আমি আর ভগবান ছাড়া আর কেউ জানেনা ওর মায়ের জেদ্ কেমন ছিল। তাকে নিজের সমস্ত জীবনটাই তছ্‌নছ্ করে বলি দিতে হয়েচে শুধু জেদেরই পায়ে। জেদ্ যদি তার চড়তো, তা' ভাঙার শক্তি অন্যলোকের তো ছিলই না, তার নিজেরও ছিলনা। রেণু সেই মায়ের মেয়ে।

রাখাল কহিল—কিন্তু, আমার মনে হয় কাকাবাবু, রেণু বোধহয় নতুন-মার মত অতো বেশি জেদী নয়।

—তুমি ওদের চেনোনা রাজু। মেয়ে তার মায়ের প্রকৃতি অবিকল পেয়েচে। যে-মাকে জ্ঞান হবার আগেই হারিয়েচে, তার স্বভাব প্রকৃতি অন্তঃকরণ কি করে যে ওর হোল, আমি ভেবে পাইনে। নতুন-বৌয়ের মত তেজস্বিনী, সৎ প্রকৃতির ও সৎ চরিত্রের মেয়ে সংসারে অতি অল্পই হয়। এটা আমি যত ভালকরে জানি, এত আর কেউ জানেনা। সেই নতুন-বৌ——ব্রজবাবুর কণ্ঠ বাষ্পাবরুদ্ধ হইয়া গেল। কণ্ঠ ঝাড়িয়া লইয়া বলিলেন—আমার ভাগ্য ছাড়া এ আর অন্য কিছুই নয় রাজু। তাকে আমি কিছুমাত্র দোষ দিইনে।

ব্রজবাবু এই সকল আলোচনায় উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছেন দেখিয়া রাখাল পাখা লইয়া বাতাস দিতে দিতে কহিল—ও-সব কথা এখন থাকুক কাকাবাবু। আপনি আগে সেরে উঠুন, তারপর হবে।

ব্রজবাবু জীবনে কোনওদিন সবিতার কথা লইয়া কাহারও সহিত আলোচনা করেন নাই। আজ তাঁহার সন্তানতুল্য রাজুর সহিত সেই বিষয় লইয়া তাঁহাকে আলোচনা করিতে দেখিয়া রাখাল অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া গেল। রোগে মানুষকে এত দুর্ব্বল করিয়া ফেলে যে তখন তাহার চিন্তায় পর্য্যন্ত সংযম থাকেনা। বোধহয় ব্রজবাবুরও এখন আর আপন মনের গোপন গভীর চিন্তাগুলি একাকী বহন করিবার সামর্থ্য ছিলনা।

সারদা ঘরে আসিয়া ব্রজবাবুকে প্রণাম করিল। সচকিতে রাখালের পানে তাকাইয়া ব্রজবাবু কহিলেন—তোমার নতুন-মাও এসেছেন নাকি রাজু?

রাখাল বলিল—না। তিনি তো কলকাতায় নেই। বর্দ্ধমানে তারকের কাছে গেছেন। সারদা আপনার অসুখের খবর শুনে আসবার

জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বললে কাকাবাবু আমাকে জানেন, আমার সেবা গ্রহণ করতে তিনি আপত্তি করবেননা।

ব্রজবাবু ক্লান্তিভরে বালিশে মাথা এলাইয়া বলিলেন—কারুরই সেবা নেবার দরকার হবেনা রাজু, আমার রেণুমা যতক্ষণ আছে। তবে সারদা-মা এসেছেন, ভালই করেছেন, আমার রেণুকে একটু উনি দেখাশুনা করতে পারবেন। ওকে যত্ন করবার কেউ নেই। সংসারের কাজ, ঠাকুরসেবা তার উপরে রোগীর সেবার চাপে দিনে রাত্রে একদণ্ড ওর ছুটি নেই।

রাখাল বলিল—নতুন-মাকে আপনার অসুখের খবর দেব কি কাকাবাবু?

ব্রজবাবু ত্রস্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন—না, না,—তোমরা কি পাগল হয়েছো? অমন কাজও কোরনা। আমার অসুখ যদি তিনি শোনেন, তারপরে তাঁকে আর কোন কিছুতেই কোথাও আটকে রাখা যাবেনা। সেই দণ্ডেই এখানে চলে আসবেন।

রাখাল কথা কহিলনা।

মাথায় রক্তের চাপ অত্যধিক বৃদ্ধির ফলে ব্রজবাবুর বাম অঙ্গে পক্ষাঘাতের লক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রাণহানির আশঙ্কা বর্ত্তমান। গ্রামের ডাক্তার বলিতেছেন, এ রকম সঙ্কটাপন্ন রোগী নিজের হাতে রাখিতে তিনি ভরসা করেননা। উপযুক্ত ঔষধ পথ্য ইন্‌জেক্‌শন প্রভৃতি গ্রামে পাওয়া যায়না। এমনকি রক্তের চাপ পরিমাপের উৎকৃষ্ট যন্ত্রেরও এখানে অভাব। কলিকাতায় লইয়া গিয়া চিকিৎসা করাইলে উপকার হইতে পারে। কিন্তু এখন এই অবস্থায় রোগীকে নাড়াচাড়া করা সম্ভবপর নয়। হার্ট অত্যন্ত দুর্ব্বল, নাড়ীর গতি অতি দ্রুত। সুতরাং, কলিকাতা হইতে বিচক্ষণ কোনো চিকিৎসক লইয়া আসা সম্ভব হইলে সত্বর তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

রাখাল বিপদে পড়িল। কলিকাতার বড় বড় ডাক্তার অনেকেরই নাম তাহার জানা আছে, কিন্তু সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় কাহারও সাথে নাই। তা' ছাড়া এই রকম রোগীর জন্য কাহাকে আনা সমীচিন হইবে সেও এক সমস্যা। উপরন্তু অর্থেরও একান্ত অভাব। তাহার নিজের যাহা কিছু যৎসামান্য পুঁজি ছিল রেণুর অসুখের সময় ব্যয় হইয়া গিয়াছে। ব্রজবাবুর চিকিৎসার জন্য এখন যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। অথচ তাহাদের কিছুমাত্র সঙ্গতি নাই। এ অবস্থায় নতুন-মাকে সংবাদ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর কোথায়? এ সংবাদ পাইলে নতুন-মা না আসিয়া থাকিতে পারিবেননা নিশ্চিত। কিন্তু দেশের এই বাস্তুভিটায় আর তাঁহার পদার্পণ করা কোনও দিক দিয়াই বাঞ্ছনীয় নয়। ইহার পরিণাম রোগীর পক্ষেও অশুভকর হইতে পারে। রাখাল দুর্ভাবনার আর কূলকিনারা পাইলনা। অথচ শীঘ্রই একটা কিছু ব্যবস্থা করিয়া ফেলা বিশেষ প্রয়োজন।··· এমন সময়ে আসিল রাখালের কাছে বিমলবাবুর পত্র।

ব্রজবাবুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া শেষে লিখিয়াছেন—আমার একান্ত অনুরোধ, ব্রজবাবুর জন্য উপযুক্ত চিকিৎসক, নার্স, ঔষধ পথ্য ও অর্থ যাহাকিছু প্রয়োজন, অতি অবশ্য আমাকে তার যোগে জানাইবে। আমি তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা করিতে পারিব।

রাখাল পত্রখানি হাতে লইয়া চিন্তিত মুখে বসিয়াছিল। সারদা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ও কার চিঠি দেব্‌তা?

—বিমলবাবুর।

সারদা বলিল—কলকাতা থেকে ডাক্তার আনবার জন্য আপনি এত ভাবচেন দেব্‌তা,—অথচ বিমলবাবুকে একটু লিখে দিলেই তিনি এখুনি ভাল ডাক্তার পাঠাতে পারতেন।

রাখাল বলিল—হুঁ।

সারদা বলিল—আমি বুঝেচি আপনি সংশয়ে পড়েচেন। তাঁর সাহায্য নিতে আপনার বাধচে।

রাখাল কথা কহিলনা।

সারদাও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, আবার ধীরে ধীরে কহিল—কাকাবাবুর অবস্থা যা' দাঁড়িয়েচে কখন কি ঘটে বলা কঠিন। যা করবেন শিগ্‌গিরই স্থির করে ফেলুন। নাহয় অন্য কিছু প্রয়োজন জানিয়ে নতুন-মাকেই লিখুন টাকার জন্য।

রাখাল তথাপি চুপ করিয়াই রহিল।

সারদা কহিল—যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা মনে করিয়ে দিই।

রাখাল সপ্রশ্ন-চোখে তাকাইল।

—তুচ্ছ মান-অপমান, উচিত-অনুচিতের ওজন হিসাব করে চলার চেয়ে এখন কাকাবাবুর প্রাণরক্ষার চেষ্টাটাই কি সবচেয়ে বেশি দরকারী নয়? আপনার নিজের কর্ত্তব্যের দিক থেকে একটু ভেবে দেখবার চেষ্টা করুননা!

—কি করতে বলছ তুমি?

—এ অবস্থায় বিমলবাবুর কিংবা নতুনমার সাহায্য নেওয়া উচিত আমাদের। নতুন-মার সাহায্য নিতে রেণু কুণ্ঠাবোধ করলে সেটা তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আপনার তো সে বাধা নেই।

—তুমি ঠিকই বলেচ সারদা। কাকাবাবুর এই জীবন-সঙ্কট অবস্থায় উচিত অনুচিতের প্রশ্ন অন্ততঃ আমার দিক্ দিয়ে ওঠা কখনই উচিত নয়। তা'হলে নতুন-মা আর বিমলবাবু দুজনকেই এখানকার সমস্ত অবস্থা জানিয়ে দু'খানা চিঠি লিখে দিই।

—কিন্তু, মাকে জানাতে যে কাকাবাবু সেদিন বিশেষ করে আপনাকে নিষেধ করে দিয়েচেন।

—তাও ত' বটে। তা'হলে শুধু বিমলবাবুকেই—আচ্ছা—বিমলবাবুত' কাকাবাবুর পরিচিত? কাকাবাবুকে জানিয়েই ব্যবস্থা করা যাক্‌না—

—এটা মন্দ যুক্তি নয়। তবে রোগীর এ অবস্থায় তাঁকে এসব প্রস্তাবে বিচলিত করা হবেনা তো?

রাখাল অত্যন্ত কাতর ভাবে বলিল, তবে কি করবো সারদা? ওঁদের কিছু না জানিয়েই কি বিমলবাবুকে খবর দেবো?

একটু চিন্তা করিয়া সারদা বলিল, তাই করুন দেবতা।

গোবিন্দজীর ভোগ রাঁধিতেছিল রেণু।

সারদা দূরে বসিয়া তরকারি কুটিতে কুটিতে গল্প করিতেছিল। রেণু কাজ করিতে করিতে 'হাঁ' 'না' 'তারপর' এইরূপ সংক্ষিপ্ত দু' একটি কথা কহিতেছিল।

সর্ব্বদা এইরূপই ঘটে। রেণু থাকে প্রায় নির্ব্বাক শ্রোতা, সারদা গ্রহণ করে বক্তার আসন। কত যে গল্প করে ঠিকঠিকানা নাই। হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারেই সারদা সবচেয়ে বেশি গল্প করে তার দেব্‌তার। নতুন-মায়ের গল্পও অনেক বলে, ভাড়াটিয়াদের গল্প তো আছেই। বলেনা কিছু রমণীবাবু সম্বন্ধে এবং নিজের অতীত সম্বন্ধে। রেণু কখনও কোন প্রশ্ন করেনা, বিন্দুমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করেনা কোনো বিষয়েই। টানা-টানা শান্ত চোখ দুটি মেলিয়া নীরবে গল্প শুনিয়া যায়। নিপুণ হাত দু'খানি ব্যাপৃত থাকে একটা-না-একটা প্রয়োজনীয় কাজে। বেশি কথা কোনোদিনই তার মুখে শোনা যায়না।

সারদা তরকারি কুটিতে কুটিতে বলিতেছিল, বিমলবাবুকে দেব্‌তা আজ টেলিগ্রাম করতে গিয়েছেন, কলকাতা থেকে ভাল ডাক্তার নিয়ে এখানে আসবার জন্য। বোধকরি কালকের মধ্যেই তিনি ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে এসে পড়বেন।

রেণুর দৃষ্টিতে বিস্ময় প্রকাশিত হইলেও মুখে কোনো প্রশ্ন নিঃসৃত হইলনা।

সারদা বলিতে লাগিল, বিমলবাবু এসে পড়লে অনেকটা ভরসা পাওয়া যাবে। উপযুক্ত চিকিৎসা ওষুধ, পথ্য সমস্তই ব্যবস্থা হবে। কাকাবাবু এইবারে শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন।

রেণু এইবার জিজ্ঞাসুনয়নে সারদার পানে তাকাইল।

সারদা তখন আপন মনে বকিয়া চলিয়াছে,—অমন মানুষ কিন্তু সংসারে দুটি দেখলাননা রেণু। যেমনি সদাশয়, তেমনি অমায়িক। শুনেচি তিনি কোটীপতি, লক্ষ লক্ষ টাকা খাটছে তাঁর দেশ বিদেশের ব্যবসায়ে, কিন্তু এমন নিরহঙ্কার সহজ-বিনয়ী মানুষ কোথাও দেখিনি এর আগে। যথার্থ যাকে শিবতুল্য বলে। এমন না হলে বিধাতা এত ঐশ্বর্য্য দেবেনই বা কেন? কথায় বলে—মনের গুণে ধন। বিমলবাবুর ধনও যেমন, মনও তেমনি।

নির্ব্বাক রেণু তখন গোবিন্দজীর ভোগ রন্ধন শেষ করিয়া পিতার পথ্য প্রস্তুত করিতেছে। মৌন থাকিলেও সে যে মনোযোগ সহকারেই সারদার মন্তব্যগুলি শুনিতেছিল তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

সারদার বাক্যস্রোতে যেন উচ্ছ্বাস আসিয়াছে। সে বলিতে লাগিল বিমলবাবু সেদিন আমাদের সকলকে রক্ষা করেছিলেন পথে দাঁড়ানর লজ্জা থেকে। সে-দুর্দ্দিনের কথা মনে পড়লে আজও আমার চোখে অন্ধকার

ঠেকে। যিনি বাড়ীশুদ্ধ লোকের আশ্রয়ই বলো, বলভরসাই বলো, যা কিছু সব, সেই মা আমাদের যখন নিরাশ্রয় হতে বসলেন, তখন আমাদের যে ভয় ভাবনা ও উৎকণ্ঠা ঘনিয়ে এসেছিল সে শুধু জানেন ঈশ্বর নিজে। বিশেষ করে আমার তো পায়ের নিচে থেকে পৃথিবী সরে যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল। মা ছাড়া তখন আমার ইহজগতে অন্য আশ্রয় বা অবলম্বন কিছুই ছিলনা।

রেণু তেমনই বিস্মিত নয়নে সারদার পানে তাকাইয়া প্রশ্ন করিল কেন ?

সারদা বলিল, তোমাকে তো সবই বলেচি ভাই। তুমি কি সে-সব কথা ভুলে গেছো ? আমার চরম দুর্দ্দিনে মা আমাকে তাঁর স্নেহের আশ্রয় দিয়েছিলেন বলেইনা আমি আজ দাঁড়িয়ে আছি।

রেণু আত্মবিস্মৃত ভাবে বলিল,—তারপর ?

—তার পরের কাহিনীও তো তুমি শুনেচ ভাই আমার মুখে। আমার পুনর্জন্ম ঘটালেন মা আর এই দেবতা। মাঝে মাঝে এখন ভাবি রেণু, ভাগ্যে সেদিন মরে যাইনি !—

রেণু হাসিয়া কহিল, কেন সারদাদিদি, সেদিন মরে গেলেই বা আজ তোমার কিসের ক্ষতি হত ভাই ?

—অনেক ক্ষতি হত। সে যে কত বড় ক্ষতি, তুমি ছেলেমানুষ বুঝতে পারবেনা বোন্ !

রেণু চুপ করিয়া আপনার কাজ করিতে লাগিল। সারদার তরকারি কোটা শেষ হইলে, বাকি আনাজগুলি ঝুড়িতে গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে বলিল,—সংসারে যথার্থ খাঁটি জিনিষ কিছু পেতে হলে বড় করে তার দাম দিতে হয়। দুর্লভের মূল্য অনেক। আমাদের জীবনেও এ নীতি মেনে চলতে হয়। নকল ও ভেজালের সমস্যা মানুষের মধ্যে এত বেশি বেড়ে

উঠেচে যে, এখন কোন্‌টা খাঁটি কোন্‌টা মেকি চেনা কঠিন। জীবনে যত বড়ো সঞ্চয় যে পেয়েছে বোন্, তাকে ততো বেশি মূল্যও দিতে হয়েচে গভীর দুঃখের মধ্য দিয়ে। অন্ততঃ এটা ঠিক বুঝেচি যে, দুঃখের কষ্টিপাথরে না পড়লে জীবনের যাচাই হয়না।

রেণু কোন দিনই কিছু বিশেষ করিয়া জানিবার জন্য সারদাকে প্রশ্ন করিতনা। আজ কিন্তু সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল,—সারদাদিদি, তোমার নিজের জীবনে তো অনেক দুঃখই পেয়েচো ভাই, তাতে খাঁটি সামগ্রী কি কিছু সঞ্চয় করতে পেরেছো?

সারদা চমকিয়া উঠিল। রেণু যে এরূপ প্রশ্ন করিতে পারে সে সম্ভাবনা তাহার একবারও মনে হয় নাই। একটু বিব্রত হইয়াই বলিল,—কি করে বলবো দিদি?

কেন? যেমন করে এই সমস্ত কথা বলচ।

সারদা সহসা অনাবশ্যক গম্ভীর হইয়া বলিল, সঞ্চয় কিছু করতে পেরেচি কিনা জানিনে, তবে সম্বল যে যথেষ্ট পেয়েচি আর সে যে ষোলো আনাই খাঁটি তাতে আমার সংশয় নেই।

সরলমতি রেণু মমতায় বিগলিত হইয়া কহিল, সারদাদিদি, যে-স্বামী তোমাকে একলা অসহায় ফেলে রেখে পালিয়ে রইলেন, তাঁকে এখনও এত ভক্তি কর তুমি?

সারদা জবাব দিলনা। মুখে তার বেদনার চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। আনাজের ঝুড়ি ও বঁটি লইয়া অন্য ঘরে রাখিতে উঠিয়া গেল।

রাখাল আসিয়া ডাকিল, রেণু—

—রাজুদা?

কাকাবাবুর রান্নাটা হয়েচে কি বোন্?

হয়েচে। এইবার গিয়ে বাবাকে চান্ করিয়ে দেবো।

কাকাবাবু ঘুমুচ্চেন। তোর যদি রান্না সারা হয়ে থাকে তো একটু ওঘরে আয়না, গোটাকত কথা আছে।

এই যে, আমাদের ভাতটা চড়িয়ে দিয়ে যাচ্চি ভাই, চলো।

অল্পক্ষণ পরে রেণু যখন হাত-পা ধুইয়া রাখালের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, রাখাল ঘরের মেঝেয় বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল। মুখ তুলিয়া রেণুকে বলিল, আয়, বোস্।

রেণু বসিল। বলিল, ডাক্তারবাবু আজ তোমার কাছে কি বলে গেছেন রাজুদা?

ভালই বলে গেছেন।

তবে কেন তুমি কলকাতায় টেলিগ্রাম করে এলে, বড় ডাক্তার নিয়ে আসার জন্য?

তুই পাগল। গোড়া থেকেই তো শুনচিস্ এখানকার ডাক্তারবাবু বলচেন, একজন ভাল ডাক্তার আনিয়ে দেখানো দরকার। ঐ রোগের চিকিৎসা গাঁয়ের ডাক্তারের কর্ম্ম নয়। হ'ত ম্যালেরিয়া, পিলে, কি পালাজ্বর, ওরা চতুর্ভুজ হয়ে চার হাতে করত চিকিৎসা। কাউকে ডাকতে দিতনা। কিন্তু ও কথা থাক্। তোকে ডাকলাম একটা দরকারি পরামর্শের জন্য।

রেণু নীরবে রাখালের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়া রহিল।

বার দুই গলাটা ঝাড়িয়া লইয়া খবরের কাগজখানি ভাঁজ করিতে করিতে রাখাল বলিল, বলছিলুম কি, কাকাবাবু একটু সামলে উঠলেই তো এখান থেকে ডেরাডাণ্ডা তুলতে হবে। আপাততঃ কলকাতায় গিয়ে কাকাবাবু সম্পূর্ণ সেরে না ওঠা পর্য্যন্ত আগের মত একটা ছোট বাসা ভাড়া করে না হয় থাকা যাবে। কিন্তু তার পরে—

রাখাল বলিতে বলিতে চুপ করিল। তাহার কণ্ঠস্বর দ্বিধাজড়িত।

রেণু তেমনই জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

চিন্তিতমুখে রাখাল কহিল, তারপরে যে কি ব্যবস্থা হতে পারে সেই কথাই ভাবচি। এখানে তো আর ফিরে আসা চলবেনা!

রেণু শান্তগলায় বলিল, কেন?

রাখাল বিস্মিত হইয়া কহিল, তাও কি বুঝতে পারিস্‌নি রেণু, এতদিন এখানে বাস করে? দেখছিস্ তো জ্ঞাতিদের আচার ব্যাভার! কাকা-বাবুর এতবড় অসুখ, একটা উঁকি মেরে খোঁজ নেয়না কেউ।

রেণু অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু তুমি তো জানো রাজুদা, কলকাতায় বারোমাস থাকা আমাদের অবস্থায় কুলুবেনা। এখানে বাসাভাড়া লাগেনা, ঝিয়ের মাইনে মাত্র এক টাকা। আনাজ তরকারী কিনে খেতে হয়না। খরচ কত অল্প।

রাখাল বলিল, কিন্তু কাকাবাবুর যা' শরীরের অবস্থা, ওঁর উপর তো নির্ভর করা চলেনা বোন্! একটু ভেবে দেখ্ ওঁর অবর্ত্তমানে তোর আশ্রয় কোথায়? এখানে জ্ঞাতিরা তো তোদের সম্পর্কই ত্যাগ করেছেন। সৎমা আগেই পৃথক্ হয়ে নিজের পিতৃকুলে সরে পড়েছেন। কলকাতায় ফিরে যে-কদিনই থাকা হোক্, তার মধ্যে তোর একটা বিয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেলে কাকাবাবু তখন আমার কাছে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারবেন। তাঁর যা' সামান্য আয় আছে, আমার সঙ্গে একত্রে থাকলে স্বচ্ছন্দে স্বচ্ছল ভাবেই চলে যাবে। কারুর সাহায্য নিতে হবেনা আমি থাকতে।

রেণু চুপ করিয়া শুনিতেছিল। তাহার মৌনতায় উৎসাহিত হইয়া রাখাল বলিতে লাগিল, আমি অনেক ভেবেচিন্তে দেখেচি বোন, এ' ছাড়া অন্য সুব্যবস্থা আর কিছু হতে পারেনা। মেয়ের ভবিষ্যতের দুর্ভাবনাই কাকাবাবুকে সবচেয়ে বেশি বিব্রত করে তুলেছিল। তোমাকে সৎপাত্রে

সম্প্রদান করতে পারলে তাঁর মনের গুরুতর দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। তখন তিনি সহজেই সুস্থ হয়ে উঠবেন আশা হয়।

রেণু মৃদুকণ্ঠে বলিল, বাবাকে "ফেলে আমি কোথাও যেতে পারবোনা রাজুদা!

—কিন্তু না গিয়েও যে উপায় নেই দিদি। তুমি যদি ছেলে হতে, ফেলে যাওয়ার কথাই উঠতনা। কিন্তু মেয়েদের যে আশ্রয় ছাড়া উপায় নেই।

—অল্পবয়সী বিধবা মেয়েরা তো সারাজীবন বাপের বাড়ী থাকে দেখেচি।

রাখাল শুষ্ক হাসিয়া জবাব দিল, থাকে সত্যি, কিন্তু তাদের যদি পিতৃকুলে দাঁড়াবার মত আশ্রয় না থাকে কোনও সময়ে, তখন তারা শ্বশুরকুলেই গিয়ে আশ্রয় নেয় এও দেখেচো নিশ্চয়। স্বামী না থাকলেও তাদের শ্বশুরকুল তো থাকে!

রেণু নতমুখে কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, রাজুদা, আমি বাবাকে নিজের মুখে জানিয়েচি, বিয়েতে আমার একটুও রুচি নেই। আমি বিয়ে করতে পারবনা।

রাজু হাসিয়া উঠিল। বলিল, তোকে বুদ্ধিমতী ঠাওরাতাম, এখন দেখছি তুই একেবারে পাগল রেণু। আরে, সেদিন তুই ওকথা না বললে কাকাবাবু কি বেঁচে থাকতে পারতেন? হঠাৎ কারবার ফেল্ হয়ে সর্ব্বস্ব গেল। বসত্ বাড়ীখানি শুদ্ধ নিলামে ওঠায় একেবারে পথে দাঁড়ালেন। সেই দুঃসময়ে তোর বিয়ে বন্ধ হওয়ার ছুতো নিয়ে ঝগড়া করে হেমন্তমামা তাঁর বোন আর ভাগ্নীর পাওনা কড়ায় গণ্ডায় আঠারো আনা বুঝে নিয়ে সরে দাঁড়ালেন। পাছে কাকাবাবুর দেনার দায়ে তাঁদেরও পথে দাঁড়াতে হয়! সংসার এমনিই স্বার্থপর বোন!

রাখাল একবার থামিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। তারপরে আবার বলিতে লাগিল, স্বামীর অত বড়ো দুঃসময়ে স্ত্রী নিজের ভাইয়ের সঙ্গে একজোট্ হয়ে আপনার আর্থিক ভালমন্দের দিক্‌টাই কেবলমাত্র বিবেচনা করলে, স্বামীর পানে তাকালেওনা। তুই যদি সেদিন তাঁকে অমন করে ভরসা দিয়ে না বলতিস রেণু, 'তোমাকে একা ফেলে রেখে আমি কখনো কোথাও যাবনা বাবা—' তা'হলে কাকাবাবু সংসারে দাঁড়াতেন কাকে অবলম্বন করে?

রেণু অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে বলিল, কিন্তু রাজুদা, আমি তো বাবাকে সান্ত্বনা বা সাহস দিতে ওকথা বলিনি। আমি যে সত্যি কথাই বলেচি।

রেণুর কথা বলার ভঙ্গীতে রাখাল মনে মনে প্রমাদ গণিলেও মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল,—সত্যি কথা নয় তো কি তুই মিথ্যে কথা বলেছিস্ বলছি আমি? কিন্তু কি-জানিস্ বোন্, সংসারে বেশির ভাগ সত্যই সাময়িক সত্য। চিরকালের সত্য বলে যদি কিছু থাকে তা' সংসারের বাইরের বস্তু। তুমি সেদিনকার সেই মুখের কথাটিকে রক্ষা করবার জন্য আজ যদি বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠো, জেনো, তার ফলে হয়তো তোমাদের জীবনে অকল্যাণই দেখা দেবে! যা' কল্যাণ বহন করে আনে, তাকেই বলে সত্য। অশুভকর যা, তা' সত্য নয়। সেদিন তোমার মুখের যে-কথাটি কাকাবাবুকে সবচেয়ে সান্ত্বনা ও শান্তি দিয়েছিল,—আজ সেই কথাটিকেই রক্ষা করবার জন্য তুমি যদি জিদ্ ধরে বোসো, তা'হলে জেনো সেই অবাঞ্ছিত ব্যাপারই কাকাবাবুর সবচেয়ে দুঃখ দুর্ভাবনার হেতু হবে। এমনকি হয়তো সেটা তাঁর মৃত্যুর কারণ পর্য্যন্ত হতে পারে। একটা কথা ভুলোনা রেণু, যে-উগ্রবিষ ধাত্ ছাড়া রোগীকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনে জীবনদান করে, সেই বিষ পান করেই আবার সুস্থ মানুষ আত্মহত্যা করে। স্থান কাল ও অবস্থা

অনুসারে একই ব্যবস্থা কোনও সময়ে যেমন মঙ্গলকর, আবার অন্য এক সময়ে তেমনি অমঙ্গলকরও। বড় হয়েচ, সব দিক্ সুস্পষ্ট করে ভেবে দেখ। বিশেষ প্রয়োজনে একবার একটা কথা বলেচো বলেই সেই মুখেরকথাটাকেই জীবনের সকল মঙ্গলামঙ্গল প্রয়োজন অপ্রয়োজনের চেয়ে বড় করে তুলতে গিয়ে অকল্যাণ ডেকে এনোনা।

রেণু নতচক্ষে চুপ করিয়া রহিল।

২১

কলিকাতার দুইজন খ্যাতনামা বিচক্ষণ চিকিৎসক ব্রজবাবুকে বিশেষ ভাবে পরীক্ষান্তে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বিমলবাবু আরও কয়েকদিন তাঁহার নিকটে আছেন। ব্লাড্‌প্রেশার্‌ আর একটু কমিলেই ডাক্তারের নির্দ্দেশমত ব্রজবাবুকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হইবে।

মেডিক্যাল্‌ কলেজের কাছাকাছি কোনও জায়গায় পর্য্যাপ্ত আলো-বাতাস যুক্ত একখানি ছোট বাড়ী ভাড়া করিবার জন্য বিমলবাবু কলিকাতায় পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মচারীরা সমস্তই ঠিক করিয়া রাখিবে।

কলিকাতার চিকিৎসকেরা আসিয়া রোগীর ব্যবস্থা করিয়া যাইবার পর হইতে ব্রজবাবু অনেকটা সুস্থ বোধ করিতেছেন। সকলেরই মন বেশ উৎফুল্ল।

ব্রজবাবু বৈকালে উত্তরদিকের বারান্দায় একখানি ডেক্‌চেয়ারে শুইয়াছিলেন। পাশের চৌকিতে বিমলবাবু খবরের কাগজ হাতে বসিয়া। উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল জগৎব্যাপী ট্রেড্‌-ডিপ্রেশন্‌ বা ব্যবসায়ের দুরবস্থা লইয়া।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে ব্রজবাবু বলিলেন,—আপনি যখন প্রথম আমার কাছে এসে আমার ব্যবসায় কিনে নেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন, আমার মনে হয়েছিল, সাধারণ বড়লোকদের মতই ব্যবসায় সম্বন্ধে আপনার শুধু সৌখিন আগ্রহ উৎসাহই আছে, সূক্ষ্ম ভবিষ্যৎদৃষ্টি ও ভালমন্দ জ্ঞান—অর্থাৎ যাকে ব্যবসায়বুদ্ধি বলে, তা' আপনার নেই। তারপরে যখন

আপনার অন্যান্য সব প্রচুর লাভজনক বড় বড় ব্যবসায়ের বিবরণ শুনলাম, তখন আশ্চর্য্য না হয়ে পারিনি। আশ্চর্য্য হয়েছিলাম এইজন্য যে, এতবড় ব্যবসায়ী লোক হয়েও আপনি কী দেখে আমার ভরাডোবা ব্যবসা অত চড়াদামে কিনতে চাইছিলেন!

বিমলবাবু হাসিলেন।

ব্রজবাবু পুনরায় বলিলেন, আচ্ছা বিমলবাবু, সত্যি করে বলুন তো, আপনি কি বুঝতে পারেননি ও-ব্যবসা সে অবস্থায় কিনে নেওয়া দূরে থাক্, যেচে সেধে হাতে তুলে দিলেও কেউ নিতে চাইতনা ওর দেনার পরিমাণ দেখে! সে অবস্থায় ওর ভার নেওয়া মানে ইচ্ছে করে টাকাগুলো গঙ্গাগর্ভে ফেলে দেওয়া।

বিমলবাবু তেমনই মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, এবারও কোনো জবাব দিলেননা।

ব্রজবাবু বলিলেন, আশ্চর্য্য মানুষ আপনি।

এবার বিমলবাবু কথা কহিলেন। বলিলেন, আমার চেয়েও অনেক বেশি আশ্চর্য্য মানুষ আপনি।

—কিসে বলুনতো?

—আপনি জেনেশুনেও অবিশ্বাসী ও প্রতারক আত্মীয়দের হাতে আপনার নিজহাতে গড়া বৃহৎ ব্যবসা তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

ম্লান হাসিয়া ব্রজবাবু বলিলেন, সংসারে মানুষকে বিশ্বাস করা কি এতই অপরাধ বিমলবাবু? বিশ্বাস আমি কোনও কারণেই হারাতে চাইনে।

—বার বার ক্ষতি স্বীকার ও দুঃখভোগ করেও কি বিশ্বাস বজায় রাখা সম্ভব?

—তা' জানিনে, কিন্তু রাখা ভাল। অবিশ্বাসীর কোথাও আশ্রয় নেই, কোনও সান্ত্বনা নেই।

—আপনার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় এইই কি সত্য জেনেচেন ?

—হাঁ। আমি বিশ্বাস করে ঠকিনি। বাইরে থেকে মানুষ আমাকে বার বার নির্ব্বোধ বলেচে, কিন্তু আমি জানি আমি ভুল করিনি, তারাই ভুল করেচে।

বিমলবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ব্রজবাবুর মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

দূরদিগন্তে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া ব্রজবাবু বলিতে লাগিলেন, আমার সমস্ত কাহিনী একদিন বলবো আপনাকে। আপনি অন্যের মুখে কতদূর কি শুনেছেন তা' জানিনে, তবে আমার মুখে সেদিন যেটুকু শুনেছিলেন তা' কিন্তু সমস্ত নয়। নিজের কথা বলবার আগে আপনাকে আমার কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে।

—বলুন, কি জানতে চান্?

—আপনার যা' আর্থিক অবস্থা, তাতে আপনাকে লক্ষ্মীর বরপুত্র বলা যেতে পারে। আপনি সবল, সুশ্রী, স্বাস্থ্যবান পুরুষ, ভাগ্যদেবী সকলদিক দিয়েই আপনার প্রতি প্রসন্না,—অথচ এত বয়স পর্য্যন্ত সংসারে প্রবেশ করেননি এর যথার্থ কারণটা জানতে পারি কি? অবশ্য যদি বলতে আপনার বাধা না থাকে।

—বলতে কিছুমাত্র বাধা নেই। কারণটা নেহাৎ সোজা। প্রথমতঃ সময় ও সুযোগের অভাব, দ্বিতীয়তঃ, বিবাহে অনিচ্ছা।

প্রথমটা হয়তো একদিন সত্য ছিল, কিন্তু আজ তো আর তা' নয়। তখন ব্যবসায়ের উন্নতির চেষ্টায় দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, সংসার পাতার ভাবনা ভাববার অবকাশ ছিলনা। কিন্তু তার পরে—

—বললুম তো এইমাত্র, রুচি হয়নি।

—রুচি অরুচির কথা উঠলে আর কোনো প্রশ্নই চলেনা বিমলবাবু। তবু

আমার আর একটি জিজ্ঞাসার জবাব দিন্। এখন কি সংসারী হবার কোনও বাধা আছে আপনার ?

ব্রজবাবুর প্রশ্নে বিমলবাবু বিস্ময় বোধ করিতেছিলেন যতখানি, তারও বেশি করিতেছিলেন কৌতুকবোধ। চাপা হাসিতে তাঁহার চোখ মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। বলিলেন, বাধা কোনওদিনই ছিলনা ব্রজবাবু, আজও নেই। হয়তো বা আমার বিবাহের পথ এত বেশি অবাধ বলেই স্বয়ং প্রজাপতি পথ আগলে বসে রইলেন। নববধূর আর শুভাগমন হোলোনা।

ব্রজবাবু বলিলেন, আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলামনা।

—দেখুন, আমাদের দেশে একটা মেয়েলী প্রবাদ হয়তো শুনেছেন,

অতিবড় ঘরণী না পায় ঘর।
অতিবড় সুন্দরী না পায় বর॥

আমারও হয়েচে তাই। বিবাহের পাত্র হিসাবে নাকি আমি সকল-দিক দিয়েই উপযুক্ত, একথা অনেকেই বলেছেন, অন্ততঃ ঘটক সম্প্রদায় তো বলেনই। তবুও যার সারা যৌবনে বিয়ের ফুল ফুটলোনা, সেস্থলে প্রজাপতির বাধা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে বলুন ?

—কিন্তু এতদিন ফোটেনি বলেই যে কোনও দিনই ফুটবেনা এও তো নয়।

—সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে দাদা। অকালে কি আর ফুল ফোটে ? জোর করলে তার বিকৃতি ঘটানো হয় মাত্র। বিবাহ ব্যাপারটা অনেকটা মর্সুমী ফুলের মতো। ঠিক নিজের ঋতুতে আপনি ফোটে। মরশুম্ চলে গেলে আর ফোটেনা, তখন সে দুর্লভ।

ব্রজবাবু একটু চিন্তা করিয়া হাসি মুখে বলিলেন, ভাল মালী চেষ্টা করলে অসময়েও ফুল ফোটাতে পারে। কিন্তু সে কথা থাক্,

বিবাহটা যে ঠিক মরশুমী ফুল, আমি মানতে পারলামনা। বিয়ের ফুল ফোটা বলে একটা কথা এদেশে আছে, কিন্তু কোনো দেশেই ওটা যে ফুলের চাষের নিয়ম মেনে চলে এমন প্রমাণ বোধহয় নেই।

বিমলবাবু বলিলেন, না না, তা' নয়। আমি বলতে চাইছি, জীবনে বিবাহের একটা নির্দ্দিষ্ট শুভ লগ্ন আছে। সে লগ্নটি উত্তীর্ণ হয়ে গেলে আর বিবাহ হয়না। যাঁরা তারপরেও বিবাহ করেন, সে ঠিক বিবাহ নয়।

—সেটা তা'হলে কি?

—সেটা শুধু স্ত্রী-পুরুষের একত্র বসবাস মাত্র। কোনও ক্ষেত্রে বংশ রক্ষার প্রয়োজনে, কোনও ক্ষেত্রে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের কিংবা সুখ সুবিধা ও আরামের প্রয়োজনে,—কোনও ক্ষেত্রে কেবলমাত্র হৃদয়মনের বিলাসিতা চরিতার্থের জন্য।

বিস্মিত কৌতূহলে ব্রজবাবু প্রশ্ন করিলেন ঐ সকল বাদ দিয়ে বিবাহকে আর অন্য কি বস্তু বলতে চান আপনি?

—সেটা ঠিক বুঝিয়ে বলা একটু কঠিন। সংসারে দেখা যায় সমাজ অনুমোদিত পুরুষ ও নারীর মিলনকে বিবাহ বলা হয়। কিন্তু আমি তা' মনে করিনা। মানুষের জীবনে এমন একটা বসন্তঋতু আসে, এমন একটা আনন্দকাল আসে, যে-পরমক্ষণে নর-নারীর ঈপ্সিত মিলন, দেহে মনে অপূর্ব্ব রসে ও রঙে রঙীন হয়ে ওঠে। দুটি প্রাণের, দুটি দেহমনের সেই যে রস-মধুর বর্ণরাগ—তাকেই বলি বিবাহ। সূর্য্যাস্তের পর মুহূর্ত্তেই, যখন সন্ধ্যা নয় অথচ দিন অবসান হয়েছে, সেই সুন্দর সন্ধিলগ্ন, সেটুকুর আয়ু অতি অল্পমাত্র স্থায়ী। তাকে আমরা গোধূলিক্ষণ বলি। সেই রমণীয় সময়টুকুর মধ্যে পশ্চিমের আকাশে জেগে ওঠে—অপরূপ আলোর লীলা আর অফুরন্ত রঙের বৈচিত্র্য যা' সমস্ত দিবা-রাত্রির দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আর কোনক্রমে কোনো মুহূর্ত্তেই

ধরা যায়না। সে ঐ বিশেষ ক্ষণটুকুরই সামগ্রী। মানুষের জীবনে বিবাহও ঠিক তাই।

ব্রজবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, বুঝেচি। কিন্তু আপনি যা' বললেন বিমলবাবু, তা' হয়তো আপনাদের কল্পনার কাব্যের পাতায় লেখে, বাস্তব জীবনের হিসাবের খাতায় লেখেনা।

—সেই জন্যই তো আমাদের বিবাহিত জীবনের পাতায় এত গরমিল্ জমে ওঠে, হিসাব মেলেনা কিছুতে—

অর্থাৎ আপনি বলছেন, বিবাহ ব্যাপারটা কাব্যের খাতার ছন্দের অন্তর্গত, হিসাব খাতার অঙ্কের অন্তর্গত নয়?

সে কথার জবাব এড়াইয়া গিয়া বিমলবাবু বলিলেন, আপনিই বলুননা দাদা! বিবাহের অভিজ্ঞতা আমার নিজের জীবনে একবারও ঘটেনি, কিন্তু আপনার ঘটেছে একাধিকবার। আপনি ও-বিষয়ে আমার চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ।

—আমার কথা যদি মানেন তো বলি।

—বলুন।

—বিয়ের ফুল ফোটার দিন আজও আপনার অটুট আছে।

—তার মানে? আপনি কি বলতে চান্ এই বয়সে—

বিমলবাবুর বাক্য সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ব্রজবাবু হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, আপনি সত্যিই হাসালেন কিন্তু বিমলবাবু।

—কেন বলুন তো?

আপনার বিয়ের আর বয়স নেই, এরকম একটা অসম্ভব ধারণা কি করে হল? তা'হলে আমরা তো—

—কিন্তু আপনার বেশি-বয়সে বিবাহের অভিজ্ঞতা যে একবারও সুখের হয়নি এওতো সত্য?

—আপনি ভাগ্য মানেন কি ?

—কতকটা মানি বৈকি। তবে অন্ধ অদৃষ্টবাদী নই।

—'জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ' এই তিনটে ব্যাপার যে সম্পূর্ণ ভাগ্যের'পরে নির্ভর করে এটা স্বীকার করেন কি ?

—না। এযুগে বিজ্ঞানের সাহায্যে জন্ম ও মৃত্যুকে সম্পূর্ণ না হলেও, কতকটা ইচ্ছানিয়ন্ত্রিত করতে পেরেচে মানুষ। যদিও জন্ম-মৃত্যু ব্যাপারটা একেবারেই প্রকৃতির নিয়ম; জীবমাত্রেই প্রকৃতির নিয়মের অধীন। সুতরাং ও দু'টো বাদ দিয়ে বিবাহটাই ধরুন। ওটা সামাজিক সুবিধার জন্য মানুষের গড়া নিয়ম। কাজেই, ও ব্যাপারটায় অদৃষ্টের বিশেষ হাত নেই। মানুষের ইচ্ছাই এক্ষেত্রে প্রধান।

এ সকল যুক্তিতর্ক ব্রজবাবুর হয়তো ভাল লাগিতেছিলনা। সুতরাং তিনি এ আলোচনায় আর যোগ না দিয়া নীরবে চক্ষু মুদিয়া ডেক্‌চেয়ারে পড়িয়া রহিলেন।

বিমলবাবুও হস্তস্থিত সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করিলেন।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া উঠিতেছিল, সংবাদপত্রের অক্ষরগুলি ক্রমশঃই অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। বিমলবাবু দুই একবার মুখ তুলিয়া তাকাইলেন আলো জ্বালা হইয়াছে কিনা।

অর্দ্ধশায়িত ব্রজবাবু মুদ্রিত নয়নে কি ভাবিতেছিলেন কে জানে। হঠাৎ সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া ডান হাত বাড়াইয়া বিমলবাবুর একখানি হাত চাপিয়া ধরিলেন। ব্যগ্রকণ্ঠে কহিলেন, বিমলবাবু, তা'হলে আপনি সত্যই বিশ্বাস করেন বিবাহ নিয়তির অধীন নয়, মানুষেরই ইচ্ছার অনুগত ?

বিমলবাবু অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, হাঁ, আমার নিজের বিশ্বাস তাই বটে। কিন্তু আপনি হঠাৎ এ নিয়ে এত চঞ্চল হয়ে উঠলেন কেন ব্রজবাবু ?

—বলছি। কিন্তু তার আগে আপনি কথা দিন আমার অনুরোধ রক্ষা করবেন। না—না, অনুরোধ নয়, প্রার্থনা, এ আমার ভিক্ষা।—ব্রজবাবু ব্যাকুল হইয়া বিমলবাবুর দুটি হাত চাপিয়া ধরিলেন।

অতি মাত্রায় বিপন্ন হইয়া বিমলবাবু বলিলেন, আপনি একি বলছেন? আমি আপনার ছোট ভাইয়ের মত। যে-আদেশ যখনি করবেন, পালন করব। এমন অনুচিত কথা উচ্চারণ করে আমাকে অপরাধী করবেননা।

—না না, কথাটা শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন এ আমার অনুরোধ নয়, একান্ত প্রার্থনাই। বলুন, আমার মিনতি রাখবেন?—

—সাধ্যের মধ্যে হলে নিশ্চয়ই রাখব।—বিমলবাবু কথাটা বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়াই বলিলেন।

অশ্রুপূর্ণলোচনে ব্রজবাবু বলিলেন, গোবিন্দ আপনার মঙ্গল করবেন। আমার জন্ম-দুঃখিনী মেয়েটার ভার আপনি নিন্ বিমলবাবু। ওকে আপনার হাতে তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই।

বিমলবাবু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই, ব্রজবিহারীবাবু তাঁহাকে বিবাহের পাত্ররূপে নিজ কন্যার জন্য নির্ব্বাচন করিতে পারেন। ক্ষণকাল নির্ব্বাক থাকিয়া বলিলেন, আপনি আগে একটু সুস্থ হয়ে উঠুন ব্রজবাবু! ও'সব আলোচনা পরে হবে।

ব্রজবাবু সকাতরে বলিতে লাগিলেন, আপনি উদার প্রকৃতি, মন আপনারি উন্নত। অন্য কারু কাছেই আমি ভরসা করে এ প্রস্তাব করতে পারতামনা। আমার জীবনের দুঃখ-দুর্দ্দশার কাহিনী আপনি সমস্তই জানেন। দেবতার নির্ম্মাল্যের মতই মেয়ে আমার নিষ্পাপ। তার গুণের সীমা নেই, রূপও নিতান্ত অবজ্ঞার নয়। অথচ এমন মেয়েরও ভাগ্যে বিধাতা এত দুঃখ লিখেছিলেন। আপনি হয়তো জানেননা, রেণুর

বিবাহ হওয়াই এখন দুর্ঘট। আমার না আছে আজ অর্থবল, না আছে লোকবল, না আছে কুলের গৌরব। ওর বিবাহের আশা ভরসাই আর নেই।

অতিশয় আশায় আগ্রহান্বিত হইয়া ব্রজবিহারীবাবু এতক্ষণ কথা কহিতেছিলেন, কিন্তু বিমলবাবু নতমুখে নিরুত্তর বসিয়া আছেন দেখিয়া অকস্মাৎ তিনি ভগ্নোৎসাহে চক্ষু মুদিয়া আরাম কেদারায় এলাইয়া পড়িলেন। অল্পক্ষণ পরে যুক্তকর ললাটে ঠেকাইয়া নিরুপায়ের মত বলিলেন, গোবিন্দ, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক্।

সারদা বারান্দায় লণ্ঠন লইয়া আসিল।

বিমলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, রাজু কি বাড়ী আছে?

সারদা বলিল, না, একটু আগে ডাক্তারখানায় গিয়েছেন। এখুনি ফিরবেন। ব্রজবাবুর দিকে চাহিয়া বলিল কাকাবাবু, আপনার কমলা লেবুর রস আনবো কি?

ব্রজবাবু ইসারায় হাত নাড়িয়া মানা করিলেন।

বিমলবাবু বলিলেন,—না কেন দাদা, আপনার কমলার রস খাওয়ার সময় হয়েছে যে, নিয়ে আসবে বৈকি। আনো সারদা-মা। ব্রজবাবু আর নিষেধ করিলেননা। মুদিত চক্ষে নির্জীব ভাবে পড়িয়া রহিলেন। লণ্ঠনের মৃদু আলোকে বিমলবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলেন, অসুস্থ ব্রজবাবুর রক্তহীন মুখ মণ্ডল পাংশু বিবর্ণ। মুদ্রিত চক্ষুর দুই কোণে দুই বিন্দু অতি ক্ষুদ্র অশ্রুকণা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রাণাধিকা কন্যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কতখানি গভীর হতাশার গোপন বেদনায় ঐ পরম সহিষ্ণু মানুষটির নেত্রকোণে আজ অশ্রুকণা নিঃসৃত হইয়াছে বিমলবাবুর বুঝিতে বাকি রহিলনা। নিরুপায়-বেদনায় তাঁহার

সমস্ত অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিল। নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। সান্ত্বনা দিবার উপায় বা ভাষা কিছুই খুঁজিয়া পাইলেননা।

গোবিন্দজীর আরতির কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। রেণু নিজে উপস্থিত থাকিয়া পূজারী ব্রাহ্মণের সাহায্যে আরতি করাইতেছে। ব্রজবাবু আরাম কেদারায় সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন। যতক্ষণ ঘণ্টা কাঁসর নিস্তব্ধ না হইল, ললাটে যুক্ত কর ঠেকাইয়া নতশিরে প্রণামরত রহিলেন। ধূপ, ধূনা, চন্দনকাঠচূর্ণ ও গুগ্‌গুলের ধূমসৌরভে শীতল সন্ধ্যার মৃদুবায়ু সুরভিত হইয়া উঠিয়াছিল। কাঁসর ঘণ্টা নিঃশব্দ হইলে তাহার পরও ব্রজবাবু অনেকক্ষণ একই ভাবে উদ্দিষ্ট ইষ্টদেবতাকে মনে মনে বন্দনা করিয়া পরে চেয়ারের উপর আবার লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন।

রেণু আসিয়া তাঁহাকে গোবিন্দের চরণামৃত ও কমলার রস পান করাইল। একটু পরে রাখাল আসিয়া বিমলবাবুর সাহায্যে ব্রজবাবুকে ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। দুইজন মানুষের কাঁধে দুই হাতে অপটু শরীরের ভার রাখিয়া অতি কষ্টে ব্রজবাবু অল্প হাঁটিতে পারেন। এখনও সমস্ত অঙ্গে স্বাভাবিক জোর ফিরিয়া পান নাই।

আহারাদির পর রাত্রে বিমলবাবু কোনও এক সময়ে ব্রজবাবুর শয্যা-পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। ব্রজবাবুর রোগশীর্ণ শিথিল হাতখানি নিজ মুঠায় তুলিয়া লইয়া বিমলবাবু চুপিচুপি কহিলেন, আপনি সন্ধ্যা বেলায় যে প্রস্তাব আমাকে জানিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে একটু ভেবে দেখতে চাই। আপনাকে কাল আমি জানাবো।

ব্রজবাবু মাথা হেলাইয়া ইসারায় সায় দিলেন।

বিমলবাবু উঠিয়া গেলে ছায়াচ্ছন্ন নির্জ্জন কক্ষে শয্যাশায়ী ব্রজবাবু অস্ফুটস্বরে বারংবার তাঁহার ইষ্টদেবতা গোবিন্দের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতে বিমলবাবু যখন ব্রজবাবুর নিকটে আসিয়া বসিলেন ব্রজবাবু লক্ষ্য করিলেন একটি পরিতৃপ্ত আনন্দের স্নিগ্ধ-দীপ্তি বিমলবাবুর মুখমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত। সেই উজ্জ্বল মুখের পানে তাকাইয়া ব্রজবাবু মনে-মনে হয়তো অনেকটাই আশান্বিত হইয়া উঠিলেন কিন্তু ভরসা করিয়া প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিলেননা।

কহিলেন, খবরের কাগজ এসেছে। রাজু পড়ে শোনাতে চাইছিল, নিষেধ করলাম। কী হবে পৃথিবীশুদ্ধ লোকের দৈনিক বিবরণ শুনে। তার চেয়ে কোনো সদ্‌গ্রন্থ শ্রবণে মনেরও শান্তি পরকালেও কল্যাণ।

বিমলবাবু হাসিলেন। বলিলেন, কোন্ বই শুনতে ইচ্ছা হচ্চে বলুন, পড়ে শোনাই।

—চৈতন্যচরিতামৃত পড়বেন?

বিমলবাবু বলিলেন—বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে ঐ একখানা আশ্চর্য্য পুঁথি।

—পড়েছেন আপনি? ব্রজবাবুর কণ্ঠে বিস্ময় ও আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

—অল্পসল্প নেড়েছি মাত্র। পড়া হয়েছে ঠিক বলা চলেনা।

—সে তো নয়ই। চৈতন্যচরিতামৃত যে-মানুষ পাঠ করতে পেরেছে অর্থাৎ ওর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে সে তো গোবিন্দ-পাদপদ্মে পৌঁছে গিয়েছে।

বিমলবাবু বলিলেন, 'চৈতন্য-চরিতামৃত' এখানে আছে কি?

—হাঁ আছে। রেণুকে আমি ভাগবত আর চরিতামৃত সঙ্গে আনতে বলেছিলাম। রেণু নিজেও ঐ পুঁথিখানি পড়তে খুব ভালবাসে কিনা!

—তাই নাকি? মেয়েকেও তা'হলে আপনি ভাগবৎ প্রেমামৃতের আস্বাদন দান করছেন বলুন?—

জিভ্ কাটিয়া যুক্তকর ললাটে ঠেকাইয়া উদ্দেশে দেবতাকে প্রণাম করিয়া ব্রজবাবু বলিলেন, ছি ছি এমন কথা মুখে আনতে নেই। ওতে আমার অপরাধ হবে। গোবিন্দ-প্রেমের আস্বাদ সে কি মানুষ মানুষকে দিতে পারে বিমলবাবু? জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা, মেধা সবই সেখানে তুচ্ছ অর্থহীন। কেবল তিনি নিজে যাকে কৃপা করেন সেই ভাগ্যবানই সংসারে তাঁর প্রেমের দুর্লভ আস্বাদন লাভে ধন্য হয়।

বিমলবাবু নীরব রহিলেন।

ব্রজবাবু বলিতে লাগিলেন—এই যে কাল সন্ধ্যার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষায় আপনার কাছে এক প্রার্থনা জানিয়েছিলাম, আজ সকালে আর তো তার জন্য এতটুকুও আগ্রহ অনুভব করচিনে। এ কি গোবিন্দেরই করুণা নয়? নিরুদ্বেগ সরল হাসিতে ব্রজবাবুর মুখখানি কোমল হইয়া উঠিল।

বিমলবাবু বলিলেন, আমি কাল রাত্রে চিন্তা করে ও-বিষয়ে আমার কর্তব্য স্থির করে ফেলেচি।

ব্রজবাবুর রোগ-পাণ্ডুর মুখমণ্ডলে পরিতৃপ্তির আনন্দ-রেখা ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন, আমি জানি, তোমাকে উপলক্ষ্য করে গোবিন্দ আমায় ভারমুক্ত করবেন।

বিমলবাবু বলিলেন, কি করে টের পেলেন বলুন তো?—কথা কয়টি স্নিগ্ধ কৌতুকে সমুজ্জ্বল।

ব্রজবাবু মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, গোবিন্দই যে তাঁর অধম সেবকের সকল ভাবনা নিরাকরণ করেন। তোমাকে পাঠিয়েচেন তিনি আমার কাছে সেইজন্যই। ব্রজবাবুর মুখে অপরিসীম বিশ্বাস ও ভক্তির পবিত্র আভা।

বিমলবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

সংসারের বহুবিধ দুঃখে নিপীড়িত এই রোগাতুর বৃদ্ধের সরল চিত্তের পরিতৃপ্তির প্রফুল্লতাটুকু নষ্ট করিয়া দিতে তাঁহার মন সরিতেছিলনা, অথচ কথাটা এখানে না বলিলেও নয়। বৃদ্ধের ভ্রান্ত ধারণা সত্বর দূর করিতে না পারিলে জটিলতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

বিমলবাবু বলিলেন, আমি কাল বিশেষ ভাবে চিন্তা করে দেখেছি— আপনার প্রস্তাব সম্বন্ধে। সকলদিক বিবেচনা করে রেণুকে গ্রহণ করাই স্থির করেচি। কিন্তু, এ সম্বন্ধে একটু কথা আছে। আপনি প্রতিশ্রুতি দিন, আমি যা' চাইব, আপনি দেবেন।

ব্রজবাবু বিমূঢ় নেত্রে বিমলবাবুর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া অস্ফুট কণ্ঠে কহিলেন, বলুন—

বিমলবাবু বলিলেন, আপনি আমাকে আপনার কন্যা দান করতে চেয়েছেন। আমি তাকে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে গ্রহণই করতে চাই। যাগযজ্ঞ মন্ত্রোচ্চারণ করে ধর্ম্মতঃ সমাজতঃ ও আইনতঃ পত্নীরূপে গ্রহণ করলে সে আমার গোত্র ও উপাধি নিয়ে আমাদেরই বংশের অন্তর্ভুক্ত হত। আমার সম্পত্তিতে তার অধিকার বর্ত্তাত, আমার মরণে তাকে অশৌচ স্পর্শ করত। আমি যাগযজ্ঞ মন্ত্রোচ্চারণ করেই ধর্ম্মতঃ সমাজতঃ ও আইনতঃ তাকে আমার দত্তক-কন্যারূপে গ্রহণ করতে চাই। তাতেও সে আমার বংশে ও গোত্রে অধিকার পাবে। আমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়ে আমার মরণে অশৌচ পালন করবে।

ব্রজবাবু নির্ব্বোধ চাহনিতে বিমলবাবুর দিকে তাকাইয়া রহিলেন, কথা কহিতে পারিলেননা।

বিমলবাবু বলিতে লাগিলেন, রেণু আপনার কতো স্নেহের সামগ্রী আমি জানি। আমারও সে কম স্নেহের নয়। ওকে সন্তানরূপেই গ্রহণ করতে আমি প্রস্তুত হয়েচি।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বিমলবাবু বলিলেন,—বিবাহযোগ্য সৎপাত্র কেউ আমার বংশে থাকলে, তাকে আমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে রেণুকে আমি পুত্রবধূরূপে নিয়ে যেতাম। কিন্তু সেরকম আপনজন কেউ নেই আমার। দূরসম্পর্কে যারা আছে, তারা আমার রেণুমা'র উপযুক্ত পাত্র নয়। কাজে কাজেই আমি স্থির করেছি সোজাসুজি ওকে আমার দত্তক-কন্যারূপে গ্রহণ করবো। রেণুমাকে উপযুক্ত সৎপাত্রে দান করার ভার এবং ওর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবনার দায়িত্ব সমস্ত আমি তুলে নিলাম,—আপনার আর নয়।

ব্রজবাবু দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। জবাব দিলেননা। তাঁহার মুখমণ্ডলে ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোনও রেখাই ফুটিয়া উঠিলনা। যেমন নির্ব্বাক ছিলেন তেমনই রহিলেন।

দুপুরবেলায় রাখাল বিমলবাবুকে একটু অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া অতিশয় গম্ভীর মুখে বলিল, আপনার সঙ্গে একটু পরামর্শ আছে।

বিমলবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইলে রাখাল বুকপকেট হইতে ডাকঘরের মোহরাঙ্কিত একখানি পোষ্ট্ কার্ড্ বাহির করিয়া বলিল—পড়ে দেখুন।

বিমলবাবু কার্ডখানি হাতে লইয়া একবার চোখ বুলাইয়া নাম সহি লক্ষ্য করিলেন—'মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীহেমন্তকুমার মৈত্র।' বলিলেন, ইনি কে রাজু? চিনতে পারলামনা তো।

—কাকাবাবুর এ-পক্ষের শ্যালক। আমাদের শকুনী-মামা। নাম শোনেননি কি?

—ওঃ, ইনিই ব্রজবাবুর কারবারের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন না?

—হাঁ। শুধু কারবারের কেন, বিষয়-আশয়ের, ঘর-সংসারের,

স্ত্রী-কন্যার সব ভারই তিনি স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়ে কাকাবাবুকে নির্ঝঞ্ঝাটে গোবিন্দজীর পায়ে সমর্পণ করেছিলেন।

নিঃশব্দে নতনয়নে পোষ্টকার্ডখানি পাঠ করিয়া বিমলবাবু চক্ষু তুলিয়া রাখালের মুখের পানে তাকাইলেন।

রাখাল বলিল, বলুন দেখি, এ চিঠি এখন কাকাবাবুর হাতে দেওয়া উচিত কিনা ?

বিমলবাবু নিরুত্তরে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রাখাল পুনশ্চ কহিল, কাকাবাবুর কাছে এ' সংবাদ গোপন রাখাও তো আমাদের পক্ষে অনুচিত হবে।

বিমলবাবু বলিলেন, তা' তো হবেই।

তারপর একমুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া কহিলেন, এ' চিঠি ওঁর হাতে দিয়ে কাজ নেই, পড়ে শোনালেই চলবে। কারণ, চিঠির কতকটা অংশে অনাবশ্যক কটু কথা আছে। ওঁকে সেটা না শোনালেই ভাল হয়।

—নিশ্চয়। কোন্ অংশ বাদ দিয়ে কতটুকু ওঁকে শোনানো যেতে পারে বলুন তো ?

—এই যে লিখেচেন, "যে কলঙ্কিত বংশে রাণী জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার কলুষের লজ্জা তো তাহাকে চিরদিন বহন করিতে হইবেই জানি। আমার আশঙ্কা হয়, আপনাদের অপরাধ ও মহাপাপের শাস্তি শেষ পর্য্যন্ত আমার নিরপরাধা ভাগিনেয়ীকে স্পর্শ না করে। সেই জন্যই তাহাকে যথাসম্ভব সত্বর সৎপাত্রস্থ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। আপনাকে সংবাদ দিবার প্রবৃত্তি ছিলনা, কিন্তু লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ—" ইত্যাদি। এসব অংশ ওঁকে শোনাবার দরকার নেই।

রাখাল কহিল—রাণীর বিবাহ স্থির হয়ে গেল তার পিতার ইচ্ছা-

অনিচ্ছা সম্মতি অসম্মতির অপেক্ষা না করেই। আশ্চর্য্য। সংসারে এমন দেখেছেন কি বিমলবাবু?

বিমলবাবু একটু হাসিলেন মাত্র।

রাখাল আবার পড়িতে লাগিল—"অদ্য নির্ব্বিঘ্নে শুভ গাত্রহরিদ্রা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আগামী কল্য গোধূলি-লগ্নে শুভ বিবাহ।"—ব্যস্ এইটুকু মাত্র লিখেচে। কোথায় বিবাহ হচ্চে, পাত্র কেমন, কোনও সংবাদই দেয়নি। আক্কেল-বিবেচনা দেখলেন?

বিমলবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

রাখাল বলিল, বড় মেয়ে অবিবাহিতা রইল, অথচ ছোটমেয়ের ঘটা করে বিয়ে।

বিমলবাবু শান্তকণ্ঠে কহিলেন, সংসারের এই-ই নিয়ম রাজু। কোনো কিছুই কারুর জন্য অপেক্ষা করে থাকেনা।

—কাকাবাবু ওদের সর্ব্বস্ব দিয়ে আজ কপর্দ্দকশূন্য বলেই এতটা বেশি বাড়াবাড়ি সম্ভব হল, নইলে হতে পারতোনা।

উদাস কণ্ঠে বিমলবাবু বলিলেন—এটাও হয়ত' সংসারেরই সহজ নিয়ম।

পত্রখানা পাওয়া অবধি রাখালের অন্তরের মধ্যে জ্বালা করিতেছিল। তিক্তকণ্ঠে কহিল, সংসারের নিয়ম বলে সবকিছুই সহ্য করা যায়না বিমলবাবু।

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন—কিন্তু সহ্য না করেও তো উপায় নেই রাজু।

২২

শীতের সন্ধ্যা। কলিকাতায় সরু গলির মধ্যে একখানি একতলা বাড়ীর দুয়ার-ভেজানো ঘরে রেণু হ্যারিকেন লণ্ঠনের সামনে বসিয়া পশমের ছোট টুপি বুনিতেছিল। দুয়ারের বাহির হইতে সারদার অনুচ্চকণ্ঠ শোনা গেল—দিদি—

রেণু সাড়া দিল, এসো—

সারদা দরজা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার পিছনে প্রকাণ্ড ধামা লইয়া দাসী।

রেণু তাহাকে দেখিয়া সারদার দিকে চাহিতেই সারদা বলিল, গোবিন্দজীর জন্য মা কিছু ফলমূল তরীতরকারী আর ভাল মাখন পাঠালেন।

রেণুর চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল। অল্পক্ষণ স্তব্ধ রহিয়া ধীরকণ্ঠে কহিল, সারদাদিদি, ও তো আমরা নিতে পারবোনা।

সারদা কুণ্ঠিত কণ্ঠে কৈফিয়তের সুরে কহিল, সেকি দিদি, এ' তো তোমাদের জন্য নয়। এ যে গোবিন্দজীর—

রেণু সারদার কথা শেষ হইতে না দিয়া শান্ত গলায় কহিল, গোবিন্দজীকে উপলক্ষ্য করে মা এসব আমাদেরই পাঠিয়েছেন। এ তুমিও জানো আমিও জানি সারদাদিদি—কিন্তু এ নেওয়ার উপায় নেই। মাকে বোলো—তিনি যেন আমাদের ক্ষমা করেন।

শান্তকণ্ঠের এই সহজ কথা কয়টির পিছনে কতখানি সুনিশ্চিত অটলতা আছে তাহা সারদার বুঝিতে ভুল হইলনা। দাসীকে ইঙ্গিতে

ঘরের বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সারদা রেণুর কাছে আসিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল,—কাকাবাবু ভাল আছেন তো ?

হাতের পশমের কাজটা শেষ করিতে করিতে রেণু জবাব দিল,—হাঁ।

অনেকক্ষণ স্তব্ধতার মধ্য দিয়া উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কহিবার মত কোনও কথা খুঁজিয়া না পাইয়া সারদা মনে মনে সঙ্কোচ ও অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল। তাই উঠি-উঠি ভাবিতেছে এমন সময়ে রেণুই কথা কহিল।

উলের টুপি বুনিতে বুনিতে মৃদুকণ্ঠে কহিল, সারদাদিদি, মাকে বুঝিয়ে বোলো তিনি যেন মনে কষ্ট না পান। আমার জন্য তাঁকে মনের মধ্যে দুঃখ দুর্ভাবনা রাখতে মানা কোরো। যা' হবার নয় তা' যে হয়না তিনি আমার চেয়ে ভালই জানেন। দুঃখমোচনের চেষ্টায় উভয় পক্ষেরই দুঃখের বোঝা ভারি হয়ে উঠবে মাত্র।

সারদা নির্ব্বাক হইয়া রহিল। মনে হইতে লাগিল ঐ কর্ম্মনিবিষ্টা নতনেত্রা মেয়েটি তার অত্যন্ত নিকটে বসিয়া থাকিয়াও অতিশয় সুদূর হইতে শান্ত কথা কয়টি যেন বলিয়া পাঠাইল।

আরও কতক্ষণ সময় কাটিয়া গেলে সারদা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—আমি তা'হলে আজ যাই ভাই।

মাথা হেলাইয়া ইসারায় রেণু সম্মতি জানাইল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সারদা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রেণু একই ভাবে অখণ্ড মনোযোগের সহিত উলের ক্ষুদ্র টুপিটি ক্ষিপ্রহস্তে বুনিতে লাগিল। রাত্রের মধ্যেই এটি শেষ করিয়া ফেলিয়া একজোড়া ছোট মোজা ধরিতে হইবে।

প্রায় সাত আটমাস হইল ব্রজবাবু গ্রামের বাড়ী ছাড়িয়া কলিকাতায়

আসিয়া বাস করিতেছেন। বিমলবাবুর ভাড়া-করা ভাল বাসায় রেণু কিছুতেই যাইতে চাহে নাই। ব্রজবাবু অনেকটা সুস্থ হইয়া ওঠাতে রেণু জেদ করিয়া অল্প ভাড়ায় ছোট একটি একতলা বাসায় আসিয়াছে। পিতার অসুখে অসহায় অবস্থায় বাধ্য হইয়া অপরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে বলিয়া বরাবর অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে সে অসম্মত। এই নীরবপ্রকৃতি সুশীলা মেয়েটির সম্মতি অসম্মতি যে কত সুদৃঢ় ও দুর্লঙ্ঘ্য এই ঘটনার পর তাহা সকলেই বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে।

রেণু অল্প মাহিনায় একটি ঠিকাঝি রাখিয়াছে। সংসারের কাজকর্ম্ম ও দেবসেবার অবকাশে সে নিজে ছোট শিশুদের জন্য জাঙ্গিয়া, পেনি, ফ্রক্, প্রভৃতি সেলাই করে। উলের মোজা, টুপি, সোয়েটার, বোনে। আচার জেলি ও বড়ি তৈয়ারি করিয়া ঠিকাঝির সাহায্যে দোকানে বিক্রয়ের জন্য পাঠাইয়া দেয়।

খোলা ছাদের উপরে করোগেট টিনের ছাদযুক্ত একটি সিঁড়ির ঘর আছে। সেই ঘরখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া ঠাকুরঘর করা হইয়াছে। ব্রজবাবু স্নানাহার ও নিদ্রার সময় ব্যতীত সর্ব্বক্ষণ এই পূজার ঘরেই যাপন করেন। সংসার কি করিয়া চলিতেছে, কোথা হইতে খরচ আসিতেছে সংবাদ জানিতে চান্না। জানিতে ভয় পান। রেণু ছাড়া আর কাহারও সহিত বড় কথাবার্ত্তা বা দেখাসাক্ষাৎও করেন না।

সারদা আশঙ্কা করিয়াছিল দ্রব্যসামগ্রী ফেরৎ আসায় সবিতার অত্যন্ত আঘাত লাগিবে। তাই বাড়ী পৌঁছিয়া দ্রব্যসামগ্রী পূর্ণ ধামাটি নিঃশব্দে একতলায় ভাঁড়ার ঘরে তুলিয়া রাখিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

সবিতা নিজের ঘরে বসিয়া পঞ্জিকার পাতা উল্‌টাইতেছিলেন। সারদাকে দেখিয়া সপ্রশ্ন-চোখে তাকাইলেন।

ঘরের মেঝেতে সবিতার নিকটে বসিয়া পড়িয়া সারদা বলিল, কাকাবাবু ভাল আছেন মা।

—রেণু?

—রেণুও ভাল আছে।

সবিতা আর কোনও প্রশ্ন না করিয়া পঞ্জিকার পাতে পুনরায় মনঃ-সংযোগ করিলেন।

সারদা বিস্মিত হইল। অন্যদিন রেণুর সহিত দেখা করিয়া বাড়ী ফিরিলে দেখিতে পায় সবিতা উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় তাহার পথ চাহিয়া আছেন। তারপরে কতই না সতৃষ্ণ আগ্রহে একটির পর একটি প্রশ্ন করিয়া সমস্ত কথা খুঁটিয়া খুঁটিয়া জানিতে চাহেন। রেণু কি করিতেছিল, কি কি কথা কহিল, তাহার চুল বাঁধা হইয়াছিল কিনা, কাপড় কাচা হইয়াছিল কিনা, রেণু আগের চেয়ে রোগা হইয়া গিয়াছে না তেমনই আছে, ইত্যাদি। ব্রজবাবু অপেক্ষা রেণুর সম্বন্ধেই সবিতা অনেক কিছু বেশি জানিতে চাহেন ইহাও সারদা লক্ষ্য করিয়াছে।

কতক্ষণ চুপচাপ কাটিয়া গেল। সারদা আপনা আপনিই বলিতে লাগিল, ওদের অভাব এমন কিছু বেশি নয় মা, যার জন্য আপনি এত বেশি ভাবচেন। দুটি মাত্র প্রাণী। খরচই বা কি, কাজই বা কি! ইচ্ছে করেই তাই রেণু রাঁধুনী রাখেনি। সংসারে অনটন তো কিছু দেখলাম না।

সবিতা পঞ্জিকার একটি পাতার কোণ মুড়িয়া চিহ্ন রাখিয়া বইখানি বন্ধ করিলেন। সারদার মুখের পানে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাইয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন, তা' যেন ওদের না-ই রইলো! কিন্তু তুমি জিনিষের ধামাটা কোথায় লুকিয়ে রেখে এলে সারদা?

সারদা থতমত খাইয়া গেল। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া দেখিল

সবিতার মুখে বেদনার চিহ্নমাত্র নাই। বরং ঠোঁটের প্রান্তে চাপা হাসির রেখা।

সবিতা বলিলেন, তুমি বুঝি এই ভেবে ভয় পেয়েছ সারদা যে, জিনিষ ফেরৎ এসেছে শুনে তোমাদের মা দুঃখে ক্ষোভে শয্যাশায়ী হয়ে পড়বেন, নয়?

সারদা লজ্জিত হইয়া বলিল, না, তা ঠিক ভাবিনি। তবে—হয়তো মনে খুবই আঘাত পাবেন ভয় হয়েছিল।

সবিতা সস্নেহে সারদার পিঠে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, বোকা মেয়ে, তোমার মতন করে মায়ের হৃদয়টার দিকেই কেবলমাত্র তাকিয়ে মাকে ভালবাসতে সবাই কি শিখেচে? এ নিয়ে রেণুর উপরে তো রাগ করতে পারিনে মা, তার দোষ নেই কিছু।

সে কথা আর আপনাকে বলতে হবেনা। রেণু যে আপনারই মেয়ে আজ যেন তা' সব চেয়ে স্পষ্ট করে দেখে এলাম মা।

সবিতা সেকথা এড়াইয়া গিয়া সহজস্বরে কহিলেন, কি বলে তোমায় ফেরালে সে আজ?

সারদা আনুপূর্ব্বিক বিবরণ জানাইয়া শেষে বলিল, আচ্ছা মা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি ফেরৎ আসবে জেনেই জিনিষ পাঠিয়েছিলেন?

সবিতা মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন, না। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, সারদা, ঠিক করে বলো তো মা, সত্যিই কি ওদের কোনো অভাব অনটন নেই দেখে এলে?

ভিতরের কথা কি করে জানবো মা?

দেখে কী মনে হ'ল?

সারদা নতশিরে নিরুত্তর রহিল।

সবিতা আর প্রশ্ন করিলেন না। তাঁহার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে চিন্তার কালো ছায়া ঘনাইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ বাদে সবিতা প্রশ্ন করিলেন, আজ যখন তুমি গেলে, সে তখন কি করছিল?

উলের টুপি বুনছিল।

সবিতার মুখে বেদনার চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ক্লিষ্ট কণ্ঠে কহিলেন, আমি চেষ্টা করেছিলাম রাজুকে দিয়ে ওর ঐ উলের সামগ্রী কিনবার। সে রাজুকে বেচ্‌তে চায়নি।

কেন মা?

রাজু যে-দামে ওকে বেচে দিতে চেয়েছিল, ও সে-দাম নিতে রাজি হয়নি। বলেছিল এ তোমাদের সাহায্য করার ফন্দি।

সারদা স্তব্ধ হইয়া রহিল। সবিতার শান্ত গম্ভীর মূর্ত্তির পানে তাকাইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল ঐ স্থির প্রশান্তির অন্তরালে কী বিক্ষুব্ধ ঝটিকাই না বহিয়া চলিয়াছে। সংসারে কেহই তাহার সন্ধান জানেনা।

সারদা বলিল, মা, শুনেছিলাম রেণুর জন্য একটি ভাল ডাক্তার পাত্রের সন্ধান এনেছিলেন দেব্‌তা। সে সম্বন্ধের কি—

উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া সবিতা বলিলেন, না সে হ'লনা। মেয়ে বিয়ে করবেনা পণ করেচে।

সারদা আস্তে আস্তে বলিল, এমন বুদ্ধিমতী মেয়ে হয়েও সে—

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সবিতা বলিলেন, সে নাকি বলেচে, হিঁদুর মেয়ের দু'বার গায়ে হলুদ হয়না। বাগ্‌দত্তা মেয়েও বিবাহিতারই সামিল। ওমার বিবাহের ব্যাপার বাগ্‌দানের পর অনেকদূর পর্য্যন্ত এগিয়েছিল। এখন আবার দু'বার করে সে ব্যাপারগুলো হোক্

এটা আমি চাইনে। তোমরা আমার বিয়ের চেষ্টা কোরোনা রাজুদা, ওতে আমার মঙ্গল হবেনা আমি জেনেচি।

সবিতা চুপ করিলে সারদা ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তাই যদি মেয়ের মত্, তা'হলে নাহয় সেই পাত্রেই রেণুর বিয়ের চেষ্টা করুন না, যার সাথে বিয়ে ঠিক হয়ে ওর গায়েহলুদ পর্য্যন্ত শেষ হয়েছিল! ভাগ্যে থাকলে স্বামী হয়তো পাগল না-ও হতে পারে।

সবিতা ম্লান হাসিয়া বলিলেন, সে পাত্রেরই সঙ্গে সাত আটমাস আগে রেণুর বৈমাত্রবোন রাণীর বিয়ে হয়ে গেছে।

শুনিয়া সারদা স্তম্ভিত হইয়া গেল।

একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাসের সহিত সবিতা বলিলেন, আমার ভুলেই এমনটা হ'ল।

সারদা নিষ্পলক নেত্রে সবিতার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

সবিতা মৃদুস্বরে স্বগতভাবেই বলিতে লাগিলেন, এতশীঘ্র গৃহহীন হয়ে হয়তো বা ওদের পথে দাঁড়াতেও হোতোনা, আমি যদি না অমন জেদ্ করে রেণুর বিয়ে বন্ধ করাতাম। অবশ্য পথে ওদের একদিন-না একদিন নামতে হোতোই, আমি সেটা এগিয়ে দিয়েচি মাত্র। অন্ততঃ রেণুর বিমাতা এত সহজেই চট্ করে সম্পত্তির অংশ ভাগ করে নিয়ে পৃথক্ হয়ে যাওয়ার অছিলা পেতেননা।

শিবুর মা আসিয়া ডাকিল, মা, দাদাবাবু ভিতর-বাড়ীতে এসেচেন, তাঁর খাবার দেবেন চলুন। রাত হয়ে যাচ্চে।

সারদা ত্বরিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আপনাকে যেতে হবেনা মা, আমিই তারকবাবুর খাবার দিচ্চি গিয়ে, আপনি বরং একটু বিশ্রাম করুন।

না সারদা, চলো আমিও যাই। সে ব্যস্ত হবে খাওয়ার কাছে আমাকে দেখতে না পেলে।

সারদার সহিত সবিতাও নিচে নামিয়া গেলেন।

হরিণপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া সবিতা বাসা বদলাইয়াছেন। রমণীবাবুর সেই পুরাতন বাড়ীতে প্রবেশ করিতে আর প্রবৃত্তি হয় নাই। নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্যবিধানে সুদীর্ঘ বারোবৎসরের অধিককাল যেখানে প্রতিপলে আত্মহত্যার দুর্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও, আচ্ছন্নতার মধ্যে অর্দ্ধ অচেতনবৎ কাটাইতে হইয়াছে, আজ সেই বাড়ীখানার দিকে তাকাইতেও আতঙ্কে শরীর শিহরিয়া ওঠে। অথচ ঐ বাড়ী হইতেই আশ্রয়চ্যুতির সম্ভাবনায় এই সেদিনও তো তাঁহাকে ভাবনায় দিশাহারা হইতে হইয়াছিল। দীর্ঘকাল নিজের রুচিকে নিষ্ঠুরভাবে নিষ্পেষিত করিয়া, স্বভাবের বিপরীত স্রোতে অগ্রসর হওয়ার ফলে যে অপরিসীম শ্রান্তিতে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, সে ভার ক্রমেই দিনের পর দিন দুঃসহ হইয়া উঠিতেছিল।

বিমলবাবু যে-বাড়ীখানি ব্রজবাবু ও রেণুর জন্য ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, সবিতা সেই বাড়ীটিতেই উঠিয়াছেন। বিমলবাবু কলিকাতায় নাই। ব্যবসায় সংক্রান্ত জরুরী টেলিগ্রাম আসায় সিঙ্গাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। সবিতার দেখাশুনার ভার লইয়া রাখালকে এই নূতন বাসায় থাকিবার জন্য বিমলবাবু অনুরোধ করিয়াছিলেন। নতুন-মার তত্ত্বাবধান ভার লইতে সম্মত হইলেও তাঁহার বাসায় বসবাস করিতে রাখাল অক্ষমতা জানাইয়াছিল। বিমলবাবুর নিকট এ সংবাদ শুনিয়া তারক স্বেচ্ছায় নতুন-মার বাসায় থাকিয়া তাঁহার তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিয়াছে।

সবিতার আনুকূল্যে তারক বর্দ্ধমানের স্কুল-মাষ্টারি ছাড়িয়া দিয়া হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টিস্ সুরু করিয়াছে। একতলায় বহির্বাটীতে তাহার বসিবার ঘর আইনজীবির প্রয়োজনীয় উপযুক্ত আসবাবপত্রে নিখুঁতভাবে

সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বিমলবাবু নিজে ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে হাইকোর্টের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীলের জুনিয়র করিয়া দিয়াছেন। বিমলবাবুরই ছোট মোটরগাড়ী খানিতে সে আদালতে যাতায়াত করে। তারকের আবশ্যকীয় পোষাক পরিচ্ছদ গাউন প্রভৃতি সরঞ্জাম সমস্তই সবিতা কিনিয়া দিয়াছেন।

তারকের আহার শেষ হইলে সবিতা উপরে উঠিয়া আসিয়াছিলেন। অনেকক্ষণবাদে সারদা উপরে আসিয়া বলিল, মা, আজও আপ'ন কিছুই মুখে দেবেন না ?

না সারদা। আমার গলা দিয়ে কিছু গলবেনা। তবে তুমি যদি আমার জন্য না খেয়ে উপোষ করতে চাও, তা'হলে আমাকে খেতেই হবে, কিন্তু আমি জানি তুমি তোমার মায়ের 'পরে এমন জুলুম করবেনা।

সারদা মলিন মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

সবিতা বলিলেন, যাও মা, তুমি খেয়ে এস।

সারদা তবুও নত মুখে দাঁড়াইয়া শাড়ীর আঁচলের একটা কোণ দুইহাতে অনাবশ্যক পাকাইতে লাগিল।

সবিতা বলিলেন, মানুষ একবেলা না খেয়ে মরেনা সারদা। কিন্তু খাওয়া অনেক সময়ে তার পক্ষে মরণাধিক যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। তবুও যদি তুমি আমাকে আজ খাওয়াবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে চাও, চলো না হয় যাচ্চি।

সারদা এবার মুখ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, না, থাক্ মা। আমি একাই যাচ্চি।

শূন্যকক্ষে আলো নিভাইয়া দরজায় খিল্ দিয়া সবিতা অনাবৃত মেঝের 'পরে এলাইয়া শুইয়া পড়িলেন।

দুপুরে আজ রাখাল আসিয়াছিল। সবিতা বিপন্ন স্বামী ও কন্যার সকল সংবাদই জানিতে পারিয়াছেন। সমস্তদিনটা যেন অসাড়তার মধ্য দিয়া ছায়ার মত কাটিয়া গিয়াছে, রাত্রির স্তব্ধ নির্জ্জন অবকাশে বেদনাভারাতুর অন্তরতলে কতকটা যেন সাড় ফিরিয়া আসিতেছে। নিমীলিত নয়নদ্বয়ের অবিরল বিগলিত অশ্রুধারায় কঠিন কক্ষতল এবং অযত্নবদ্ধ কোমল চুলের রাশি ভিজিয়া উঠিতে লাগিল। কোনও শব্দ নাই, চাঞ্চল্য নাই, নিস্পন্দদেহে প্রসারিত বাহুর 'পরে মাথা রাখিয়া, মাটীতে একপার্শ্ব হইয়া পড়িয়া আছেন। উপায়হীন ক্ষতির ক্ষোভে তাঁহার সমস্ত হৃদয় মন আজ কাতর ও বিকল। কোনও সান্ত্বনাই আর খুঁজিয়া পাইতেছেননা! আপন সন্তানের এই দুঃখ ও কৃচ্ছ্রসাধন তাঁহাকে অহরহ যেন অগ্নিকশার আঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেছে। সমস্ত অন্তর ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেলেও বেদনায় আর্ত্তনাদ করিবার উপায় কই? বলির পশুর মতই রক্তাক্ত দেহে ধূলায় পড়িয়া ধড়ফড় করা ছাড়া গতি নাই।

আজ তাঁহার তৃষিত মাতৃহৃদয় দুই বাহু বাড়াইয়া যাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইবার জন্য ব্যাকুল, হৃদয় নিঙড়ানো অফুরন্ত স্নেহরসে যাহাকে অভিসিঞ্চিত করিয়াও তৃপ্তি নাই, সংসারে সে-ই আজ তাঁহার সবার বাড়া পর, সবার বেশি দূরের মানুষ হইয়া গিয়াছে।

পরিপূর্ণ যৌবনের উচ্ছ্বসিত বসন্তদিনে যখন জীবন স্বতঃই আনন্দ পিপাসাতুর, তাঁহাকে সেদিন উহা সম্পূর্ণ একাকী নিঃসঙ্গ বহন করিতে হইয়াছে। না মিলিয়াছে অন্তরের অন্তরঙ্গ সাথী, না পাইয়াছেন যৌবনের প্রাণবন্ত সহচর। সেই একান্ত একাকীত্বের মাঝে হঠাৎ একদিন কোথা হইতে কী যে আকস্মিক বিপ্লব হইয়া গেল তাহা নিজেও স্পষ্ট বুঝিতে পারেন নাই। যখন চৈতন্য হইল, আশে-পাশে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন, সমগ্র

বিশ্বসংসারে তাঁহার কেহ নাই, কিছু নাই। স্বামী, সন্তান, গৃহ পরিজন, সংসার প্রতিষ্ঠা, মানমর্য্যাদা সমস্তই ঐন্দ্রজালিকের ভোজবাজীর ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। ভয়চকিতচিত্তে সহসা অনুভব করিলেন, সংসার ও সমাজের বাহিরে নির্বান্ধব নিরাবলম্ব তিনি একা শূন্যের মধ্যে ঝুলিতেছেন। পা রাখিয়া দাঁড়াইবার মত মাটিটুকুও পায়ের নিচে আশ্রয় আর নাই।

জীবনের এই আকস্মিক সর্ব্বনাশের ক্ষণে যে অতিপঙ্কিল আশ্রয়ভূমির সঙ্কীর্ণতম পরিধির মধ্যে নিজেকে দাঁড় করাইয়াছেন, তাহা সামাজিক জ্ঞানবুদ্ধি বিবেচনার সম্পূর্ণ অগোচরে। কেবলমাত্র জৈব প্রকৃতির স্বাভাবিক আত্মরক্ষা প্রবৃত্তিবশেই, জীবনধারণের অনিবার্য্য প্রয়োজনে। কিন্তু দিন যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই কলুষিত আশ্রয়ের ক্লেদ ও কদর্য্যতায় তাঁহার দেহ মন প্রতিদিন ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছে, জাগ্রত আত্মচেতনা প্রতি মুহূর্ত্তে অনুতাপের মর্ম্মান্তিক আঘাতে আহত ও জর্জরিত হইয়াছে। তবুও এই অসহ ও অবাঞ্ছিত সঙ্কীর্ণ আশ্রয়টুকু ত্যাগ করিয়া আরও অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপ দিতে ভরসা পান নাই। নিজের একান্ত নিরুপায় অবস্থা বুঝিতে পারিয়া অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিয়াছেন। এমনি করিয়াই তাঁহার দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর নিয়ত-অস্বস্তির মধ্যে কাটিয়া গিয়াছে।

জীবনের প্রারম্ভক্ষণে বলিষ্ঠ প্রাণবন্ত পুরুষ কেহ যদি তাঁহার জীবনের পথে আসিয়া দাঁড়াইতেন, আজ তাঁহার উজ্জ্বল নারীজীবনের দীপ্তিতে সংসার ও সমাজ আলোকিত হইয়া উঠিত না কি? প্রসন্ন দেহ মনের, আনন্দিত হৃদয়ের অনুকূল আবেষ্টন প্রভাবে তিনি কি আজ লক্ষ্মীস্বরূপিণী পত্নী, আদর্শ জননী, মমতা মাধুর্য্যময়ী নারী হইয়া উঠিতে পারিতেন না? কিসের জন্য তাঁহার জীবনের উদয়উষা এমন অকাল

কুজ্ঝটিকায় বিলীন হইয়া গেল? মুহূর্তের অবকাশে এত বড় প্রলয় কেমন করিয়া সংঘটিত হইল, যাহা তাঁহার নিজেরই স্বপ্নের অগোচর।

সবিতার এই অবাধ অশ্রুনিষিক্ত চিন্তাধারায় সহসা বাধা পড়িল। দ্বারে ঘন ঘন করাঘাতের সহিত তারকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—নতুন-মা—নতুন-মা—একবার দোরটা খুলুন—

সবিতা উঠিয়া বসিয়া নিজেকে একটু সম্বৃত করিতে না করিতে দ্বারে পুনঃ পুনঃ আঘাত ও উপর্য্যুপরি ব্যগ্র ডাক শোনা যাইতে লাগিল।

সত্বর মুখ চোখ মুছিয়া ক্ষিপ্রহস্তে গায়ে মাথায় বসন সুসংবৃত করিয়া সবিতা দ্বার খুলিলেন। তারকের এই অধীর ব্যস্ততায় তিনি বাড়ীতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে অনুমান করিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। দরজা খুলিয়া বাহির হইবামাত্র তারক বলিল, আপনি নাকি রোজই রাত্রে অনাহারে কাটাচ্চেন শুনলাম! আজও কিছুই মুখে দেন্‌নি। শরীর কি খুবই খারাপ হয়েচে?

তারকের প্রশ্ন শুনিয়া সবিতা বিস্ময় ও বিরক্তিতে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। কোনো উত্তর দিলেননা।

তারক পুনরায় প্রশ্ন করিল।

না, আমি ভালই আছি। সবিতা শান্ত গলায় জবাব দিলেন।

তবে কেন রোজ এমন করে উপোস করে থাকেন? না না, সে আমি শুনবোনা। কিছু-না-কিছু খাওয়া দরকার। কালই আমি ডাক্তার নিয়ে আসব। তারকের কণ্ঠে যথেষ্ট উদ্বিগ্নতা প্রকাশ পাইল।

ও-সব হাঙ্গামা কোরনা তারক। আমি নিষেধ করচি।

তা'হলে বলুন, কেন অকারণ উপোস দিয়ে শরীরের উপর এমন অত্যাচার করচেন?

রাত হয়েচে, শোওগে তারক।

সবিতার কণ্ঠে নিরতিশয় ক্লান্তি ফুটিয়া উঠিল।

তারক ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িল। বলিল, বেশ, আপনার যা' খুসি করুন, আমি সিঙ্গাপুরে সমস্ত ব্যাপার' লিখে জানাই। তিনি এসে শেষে যদি বলেন, 'তারক তোমাকে দেখাশুনার দায়িত্ব দিয়ে রেখে গিয়েছিলাম, আমাকে জানাওনি কেন,' তখন কী জবাব দেব তাঁকে?

সবিতার অন্তর জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু ধীরভাবেই বলিলেন, আমি কেন দু'দিন খাইনি কিংবা তিনদিন ঘুমুইনি এর জন্য কারুর কাছেই তিনি কৈফিয়ৎ চাইবেননা।

তা'হলে এখানে আমার থাকার কি দরকার নতুন-মা?

তারকের স্বরে অভিমান প্রকাশ পাইল।

সবিতা অবসন্ন কণ্ঠে বলিলেন, আজ আমি বড় ক্লান্ত তারক। তর্ক করবার শক্তি নেই। শুতে চললাম।

সবিতা আস্তে আস্তে আবার দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

সারদা সিঁড়ির মুখেই দাঁড়াইয়াছিল। তারক ফিরিবার পথে তাহাকে দেখিতে পাইয়া তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—নতুন-মা যে প্রতিদিন রাতে উপোসী থাকচেন, একথা আমাকে কেন জানান্‌নি? আজ শিবুর মার মুখে জানতে পারলাম!—

আপনি তো তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানতে চাননি!

সারদার কণ্ঠের নির্লিপ্ততায় তারক গর্জ্জিয়া উঠিল।—কী, এতবড় মিথ্যে অপবাদ! আমি নতুন-মার খবর রাখিনা? দেখাশোনার ত্রুটি করি?

—অকারণ চেঁচাবেননা। আমি ও-সব কিছুই বলিনি।

—নিশ্চয়ই বলেচেন। আমি বুঝতে পারছি, আমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলচে। আজ রাত্রেই আমি সব লিখে দিচ্চি বিমলবাবুকে।

—লিখতে আপনি পারেন। কিন্তু নতুন-মা তাতে বিরক্ত হবেন।

—আমার কর্ত্তব্য আমি করবই। সমস্ত দায়িত্ব তিনি আমারই উপরে দিয়ে গিয়েছেন একথা ভুললে তো আমার চলবেনা!

—নতুন-মার রুচি অরুচির উপরে জুলুম করতে তিনি কাউকেই বলে যাননি। বলবেনই বা কেন? সে অধিকারও কারুর নেই।

সবিদ্রূপ কণ্ঠে তারক বলিল, তা'হলে সে অধিকারটা কার আছে শুনি? রাখালবাবুর নয় আশা করি।

সারদার দৃষ্টি কঠোর হইয়া উঠিল। নিজেকে প্রাণপণে দমন করিয়া মৃদুকণ্ঠেই বলিল, নতুন-মার উপর জোর করবার অধিকার যদি আজ কারুর থাকে তো রাখালবাবুরই আছে, আর কারুর নয়।

মৃদুস্বরে কথিত কথাগুলি তীক্ষ্ণাগ্র সূচীর ন্যায় তারককে বিদ্ধ করিল।

গূঢ় ক্রোধ সংযত করিতে না পারিয়া তারক বলিয়া উঠিল, —তা'তো বটে। সেইজন্য তিনি নতুন-মার অসহায় অবস্থায় দেখাশোনা করার ভারটুকু পর্য্যন্ত নিতে পারলেন না! নতুন-মার বাড়ীতে এসে থাকলে পাছে তাঁর সুনামে কালি লাগে!

শান্ত গলায় সারদা কহিল, যারা স্বার্থের প্রয়োজনে সব কিছুই করতে প্রস্তুত, রাখালবাবু তাদের দলের নন। নতুন-মাকে দেখা-শোনার ভার নেওয়ার চেয়ে নতুন-মারই পক্ষ থেকে ঢের বড় কর্ত্তব্যভার তিনি নিয়ে রয়েচেন। আপনি তা' জানেননা, কাজেই বুঝতে পারবেন না।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সারদা সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া চলিয়া গেল।

দুপুর বেলায় সদ্যস্নাতা সবিতা সিক্ত কেশের ঘনপুঞ্জ পিঠের 'পরে ছড়াইয়া রৌদ্রে পিঠ রাখিয়া নিবিষ্টচিত্তে পত্র লিখিতেছিলেন। পরিধেয় শাড়ীর কালো পাড়টি শঙ্খের মত সুন্দর গ্রীবার একপাশ দিয়া লতাইয়া

গিয়া পিঠের 'পরে বাঁকিয়া পড়িয়া আছে। উদাস বিষণ্ণচ্ছায়া শীর্ণ শুভ্র মুখে সকরুণশ্রী বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে।

সারদা সেইখানেই বারান্দার একধারে বসিয়া নিজের জন্য একটি সেমিজ সেলাই করিতেছিল। পথের দিকে চাহিতে দেখিতে পাইল রাখাল আসিতেছে। সেলাইটা হাতে নিয়াই সে নিচে নামিয়া গেল সদরদরজা খুলিয়া দিতে।

কড়া নাড়িয়া ডাকিবার প্রয়োজন হইলনা। খোলা দ্বারে সারদা তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে দেখিয়া রাখাল মনের ভিতরে ঈষৎ খুশি হইয়া উঠিল। সেটা প্রকাশ না করিয়া বলিল, ঠিক-দুপুর বেলায় সদরদরজায় দাঁড়িয়ে কেন সারদা?

একজনের জন্য অপেক্ষা করছি।

কে সে? ফেরিওলা নিশ্চয়ই!

উঁহু, চিনতে পারবেন না।

তুমিই না হয় চিনিয়ে দিলে—

নিজে থেকে চিনে নিতে না চাইলে অন্যে তাকে চিনিয়ে দিতে পারেনা যে দেব্‌তা!

কথাটা হেঁয়ালি ঠেকচে—

খেয়ালী মানুষদের কাছে সব কথাই হেঁয়ালী ঠেকে শুনেছি। সরুন, দরজা বন্ধ করি।

সারদা দরজায় খিল্ দিয়া রাখালের সঙ্গে ভিতরের দালানে আসিল।

রাখাল মৃদু হাসিয়া বলিল, অন্য দিনেও এমনি করে নিস্তব্ধ দুপুরে কারুর জন্য দুয়োরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে থাকো নাকি সারদা?

কণ্ঠে তাহার স্বচ্ছ পরিহাসের লঘু সুর।

সারদা মুহূর্ত্ত মাত্র রাখালের মুখের পানে তাকাইয়া দেখিল

এ বক্রোক্তি কিনা। তারপরে সেও হাসিয়া জবাব দিল, হ্যাঁ, সব দিনই থাকতে হয়। যেদিন প্রথম আপনি আমাকে দেখেছিলেন, সেদিনও তো একজনের পথ' চেয়ে এমনি করে দুয়োর খুলে অপেক্ষা করছিলাম!

—তাই নাকি? কে তিনি বলোতো?

সারদা হাসিয়া বলিল, আমার পরমবন্ধু মরণ-দেবতা। তাঁর আসার দুয়োর তো সেদিন এমনি করে নিজের হাতে খুলে দিয়েছিলাম। কিন্তু সেই খোলা দুয়ার পথে মরণ-দেবতার বদলে এলেন মর্ত্যের দেবতা।

রাখালের কর্ণমূল আরক্তিম হইয়া উঠিল। কথাটা হাল্কা করিবার জন্যই সে বলিল, যাক্, অপদেবতা যে কেউ এসে পড়েনি এই যথেষ্ট। চলো উপরে যাই। নতুন-মা কি এখন বিশ্রাম করচেন?

—না। চিঠি লিখচেন। এই মাত্র তো তাঁর খাওয়া হোলো।

—সেকি! এতো বেলায়?

—প্রতিদিনই তো এমনি হয়। সংসারের সমস্ত কাজকর্ম নিজের হাতে শেষ করে স্নান আহ্নিক সেরে খেতে বসেন যখন, তিনটে বেজে যায়। আজ বরং একটু আগে হয়েচে।

—এর মানে কি? নিজের হাতে ও সকল কাজ করা ত' নতুন-মার অভ্যাস নেই। এমন করলে যে একটা কঠিন অসুখে পড়ে যাবেন! লোকজন, ঝী রাঁধুনী এসব কি আর নেই? একলা মানুষ উনি, এমনই কি ওঁর অভাব—

—অভাবের জন্য নয় দেবতা।

—তবে?

—এ তাঁর কঠিন আত্মনিগ্রহ।

রাখাল নিরুত্তর রহিল।

সারদা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, বসবেন চলুন।

সারদার মুখের পানে তাকাইয়া রাখাল বলিল আমি দুপুরবেলায় আসি, নতুন-মার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাইনে তো সারদা?

—তা' যদি মনে হয় আপনার, এ সময়ে না এলেই পারেন।

রাখাল একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, কিন্তু এই সময় ছাড়া এখানে আসার যে আমার অবসর নেই সারদা!

মুখ টিপিয়া হাসিয়া সারদা জবাব দিল, সে আমি জানি।

রাখাল সন্দিগ্ধস্বরে বলিল, তার মানে? তুমি এর কী জানো?

—জানি বইকি। এই সময়ে এ বাড়ীর নতুন উকীলবাবু কোর্টে থাকেন। অতএব আপনার বন্ধুসঙ্কট—থুড়ি, বন্ধুসম্মিলন ঘটবার সম্ভাবনা নেই।

—হুঁ, খড়ি পেতে গুণ্‌তে শিখেছ দেখছি। এখন চলো, উপরে উঠবে না নিচেই দাঁড় করিয়ে রেখে দেবে?

সারদা বলিল ওধারের ঐ বেঞ্চিটার উপরে একটু বসবেন চলুননা দেব্‌তা। মায়ের চিঠি লেখা শেষ হতে এখনও একটু দেরী হবে। সেই অবকাশে আপনাকে আমি গোটা কয়েক কথা জিজ্ঞেসা করতে চাই।

—চলো, উপরে গিয়েই শুনবো।

—মার সামনে বলতে পারবোনা। আমার বাধবে।

সারদা রাখালকে একতলায় দালানের উত্তর দিকে লইয়া গেল। একপাশে পিঠওয়ালা কাঠের মোটা ভারী একখানি বেঞ্চি পাতা আছে। নিজের আঁচল দিয়া বেঞ্চির উপরের ধূলা ঝাড়িয়া সারদা বলিল, বসুন।

রাখাল বসিয়া পড়িয়া বলিল, অতঃপর? তোমার আসন কৈ?

না। আমি বেশ আছি। আমার কথা অল্পই। বেশিক্ষণ আপনাকে অপেক্ষা করতে হবেনা।

—তথাস্তু। অথ কথারম্ভ হোক।

—আপনি এমন করে ঠাট্টা তামাসা করলে বলবো কি করে?

—আচ্ছা, ঠাট্টা এবং তামাসা দুই-ই প্রত্যাহার করলাম। বলো।

সারদা রাখালের নিকট হইতে একটু দূরে দেওয়ালে ঠেস্‌ দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। হাতের অসমাপ্ত সেলাইয়ের কাজটা নতচোখে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করিতে করিতে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,

—আমি ঠিক জানিনা এসব জিজ্ঞাসা করা আমার উচিত কিনা। তারপর অল্প থামিয়া বলিল, আচ্ছা, রেণুর বোন রাণী বিয়ের পরে কেমন আছে জানেন আপনি?

রাখাল সারদার কাছে এ প্রশ্ন আশা করে নাই। তাই বেশ একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, কেন বলোত? আমি তো বিশেষ কিছুই জানিনে। তবে, সে ভাল ঘরে-বরেই পড়েছে এবং বিয়ের পরে সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে শুনেছিলাম। কিন্তু, তুমি একথা হঠাৎ জিজ্ঞেসা করচো কেন সারদা?

—পরে বলবো। আচ্ছা, রাণীর নাকি সন্তান সম্ভাবনা হয়েচে, ওরা চিঠি লিখে কাকাবাবুকে এই সুসংবাদ জানিয়েচে?

—হয়তো হবে। কিন্তু আমাদের এসব খবরে দরকার কি সারদা? এই সংবাদ জানাবার জন্যই কি তুমি ঘটা করে আমাকে এখানে এনে বসিয়েচো?

—না। সারদার কণ্ঠস্বর একটু ভারি হইয়া উঠিল। বলিল, আপনি কি জানেন রাণীর বিয়ে হয়েচে সেই পাত্রেই, যে-পাত্রের সঙ্গে রেণুর বিয়ে ঠিক হয়ে গায়ে হলুদ পর্য্যন্ত হয়ে গিয়েছিল।

রাখাল অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, তাই নাকি? তা'তো কৈ জানতামনা! রাখালের মুখে চোখে চিন্তার ছায়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

—হ্যাঁ তাই।

অল্পপরে সারদা আবার প্রশ্ন করিল, কাকাবাবু নাকি বৃন্দাবনবাস করবেন মনস্থ করেছেন ?

—হ্যাঁ।

—রেণুও সঙ্গে যাবে ?

—নইলে কোথায় আর থাকবে সে ?

সারদা ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে কতকটা আপন মনেই বলিল, কিন্তু সেখানে এই বয়সে কুমারী মেয়ে—

রাখাল বলিল, সবই তো বুঝচি। কিন্তু এ ছাড়া অন্য পথই বা কোথায়, দেখিয়ে দিতে পারো সারদা ? একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিল, যার যা অদৃষ্টে ঘটবার, তার তাইই ঘটে থাকে। এই-ই দুনিয়ার নিয়ম। এ মেনে নিতে না পারলে খালি জটিলতা আর দুঃখ বেড়ে ওঠে মাত্র।

—তার মানে, আপনি বলতে চাইছেন, রেণুর অদৃষ্টে যা' আছে তা' হবেই। আমাদের দুশ্চিন্তা নিরর্থক ?

—নয়তো কি ? ওর ভাগ্যবিড়ম্বনা ত' শৈশবেই সুরু হয়েছে ওর জীবনে। তুমি আমি কেন, দেশশুদ্ধ লোক এখন ওকে সুখে রাখবার চেষ্টা করলে তা' ব্যর্থ হবে।

এইই কি আপনার অন্তরের যথার্থ বিশ্বাস দেব্‌তা ?

হ্যাঁ। অনেক হোঁচট্ খেয়ে এইই এখন আমি শেষ বুঝেছি।

সারদা স্তব্ধ হইয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না কিন্তু এটা সহ্য করতে পারবেন বলে মনে হয়না।

তার মানে ?

আপনি যাই বলুন দেব্‌তা, সারদাকে ভোলাতে পারবেননা। জোর করে নিষ্ঠুর সাজতে যাওয়া আপনার মত মানুষের সাধ্য নয়। সমস্তই

আপনি জানেন, বোঝেন। আপনার জ্ঞানের কাছে আমার জ্ঞান বুদ্ধি তুচ্ছ। জানি, রেণুর আজকের অবস্থার জন্য তার নিজের মা-ই দায়ী। কিন্তু যা' এই সংসারে বহু মানুষেরই জীবনে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ঘটে যায়,—তার কি কোনও জবাবদিহি আছে? নিজেই সেকি খুঁজে পায় তার কারণ? তার অর্থ?

রাখাল ভাবহীন শূন্য দৃষ্টিতে সারদার পানে তাকাইয়া রহিল।

সারদা ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, তবুও ভেবে দেখুন, সেদিনের মা আর আজকের মা একমানুষ নন। উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। আর যে-কেউ যাই বুঝুকনা কেন দেব্‌তা, মায়ের নতুন-মা পরিচয়টা আপনার চেয়ে ভাল আপনার চেয়ে বেশি আর কে জানে?···

নিরুত্তর রাখালের মুখে চোখে নিগূঢ়বেদনার বিষণ্ণতা নামিয়া আসিয়াছিল। সারদা অত্যন্ত মৃদুগলায় বলিল, মার পানে আর চাওয়া যায়না আজকাল। কি-মানুষ কী হয়ে যাচ্চেন দিনের পর দিন। ভিতরে ভিতরে অহরহ তুঁষের আগুনে পুড়ে পুড়ে দেহ-মন তাঁর খাক হয়ে গেল। খাওয়া ছেড়ে পরা ছেড়ে সংসারের অনাবশ্যক কাজে দাসী-রাঁধুনীর বাড়া খাটুনি খেটে—মেয়ের ভাবনা ভেবে ভেবে দেহপাত করে ফেলচেন। তবুও একবিন্দু শান্তি পাচ্চেননা একদণ্ডও।

রাখাল উদাসনেত্রে উঠানের দিকে তাকাইয়া রহিল; কথা কহিলনা।

সারদা বলিল, মায়ের উপরে আপনি অবিচার করবেননা। আপনিও যদি অভিমানে মাকে ভুল বোঝেন, তা'হলে পৃথিবীতে সত্যের 'পরে যে আর নির্ভর করাই চলবেনা। মানুষ বাঁচবে কিসে?

রাখাল দৃষ্টি নত করিল। কি বলিবে খুঁজিয়া পাইলনা। জবাব দিবার ছিলওনা কিছু।

—দেব্‌তা, আপনি চলুন একটু মার কাছে। আজকের দিনে তাঁর

মনের এই মর্ম্মান্তিক জ্বালা এতটুকু জুড়োতে পারে এমন কেউ নেই আপনি ছাড়া।

—এবার থেকে তোমারই কথামত চলতে চেষ্টা করব সারদা।

গাঢ়কণ্ঠে সারদা বলিল, আপনি শুধু আমার জীবনদাতা দেবতা নন্, আমার গুরুও। অন্ধ ছিলাম, দৃষ্টি দান করেছেন আপনিই। অজ্ঞান ছিলাম জ্ঞান দিয়েছেন আপনি। আপনারই দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতায় আজ আমার দৃষ্টি বদ্‌লেচে। এ'কথা একটুও বাড়ানো নয়, অন্তর্যামী জানেন।

২৩

বিমলবাবু সিঙ্গাপুর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়াছেন।

তারকের পত্রে সবিতার শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধনের সংবাদ পাইয়া তাহাকে লিখিয়াছিলেন, "তোমাদের নতুন-মা নিজে যাহা করিয়া তৃপ্তি পান, তাহাতে আমাদের বাধা দেওয়া সঙ্গত নয়।"

তারক এই পত্র পাইয়া একরূপ বাঁচিয়াই গেল। কারণ, নূতন আইন-প্র্যাকটিস্ লইয়া সে অহরহ ব্যস্ত, অন্যদিকে মনোযোগ দিবার মত অবকাশ এখন তাহার নিতান্ত সঙ্কীর্ণ।

নতুন-মার স্নানাহারের নিত্য অনিয়ম, উপবাস ও পরিশ্রমের কঠোর অত্যাচার, কোনো কিছুর জন্যই সে আর এখন একটিও শব্দ উচ্চারণ করেনা। গম্ভীর মুখে ও যথাসম্ভব নীরবে নিজের স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া বহির্বাটীতে চলিয়া যায়।

সবিতা হাসেন। একদিন কাছে ডাকিয়া বলিলেন, তারক, মায়ের উপর রাগ করেছ বাবা?

মুখ অন্ধকার করিয়া তারক জবাব দিল, সে অধিকার তো আমার নেই নতুন-মা। আমি একজন পথের কাঙাল বইতো নয়।

সবিতা সস্নেহে বলেন, ছি, ওকথা বলতে নেই।

তারক আরও গোটাকয়েক বাঁকা বাঁকা কথা ঠেস্ দিয়া শুনাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু সারদাকে আসিতে দেখিয়া সরিয়া পড়িল। সে ভালই জানে, নতুন-মা কিছু না বলিলেও সারদা ইহা সহ্য করিবেনা। এমন অনেক অপ্রিয় সত্য হয়তো এখনই অসঙ্কোচে সুস্পষ্ট বলিয়া বসিবে,

যাহা সহ্য করা তারকের পক্ষে একান্ত কঠিন, অথচ প্রতিকারেরও উপায় নাই।

বিমলবাবু তাঁহার কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ সবিতাকে পত্র দ্বারা এবং তারযোগেও জানাইয়াছিলেন। সবিতার নিকট সে সংবাদ শুনিয়া তারক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সকালে উঠিয়াই জাহাজ-ঘাটে উপস্থিত হইয়াছিল। গিয়া দেখিল, বিমলবাবুর ছোট ও বড় দুইখানি মোটরগাড়ী লইয়া তাঁহার ম্যানেজার সরকার ও দ্বারবানেরা সেখানে উপস্থিত রহিয়াছে। বিমলবাবু তারককে দেখিতে পাইয়া নিজের গাড়ীর মধ্যে ডাকিয়া লইলেন।

মোটরে বিমলবাবু তারককে সর্ব্ব প্রথম প্রশ্ন করিলেন, রাজু ভাল আছে তো তারক?

বিস্মিত হইয়া তারক জবাব দিল, কেন, তার কী হয়েচে?

—না, এমনিই জিজ্ঞাসা করছি। আমি তাকে লিখেছিলাম কিনা, যদি তার অসুবিধা না হয়, যেন জেটীতেই আমার সঙ্গে এসে দেখা করে।

তারকের মুখের দীপ্তি মুহূর্ত্তে নিভিয়া গেল। শুষ্ক কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কোনও জরুরি প্রয়োজন ছিল বোধহয়।

—হ্যাঁ। আসেনি দেখে মনে হচ্চে হয়তো বা অসুস্থ হয়ে পড়েচে কিংবা কলকাতার বাইরে গেছে। আমার চিঠি পায়নি।

তারক বলিল, না, পরশু সন্ধ্যাতেও তাকে আমাদের বাসায় দেখেচি।

বিমলবাবু বলিলেন, তা'হলে সম্ভবতঃ কোনও কাজে আটক পড়ে আসতে পারেনি। ড্রাইভারকে বলিলেন,—শিউচরণ, পটলডাঙা চলো।

তারক বলিল, একটু আগে আমাকে নামিয়ে দেবেন বিমলবাবু। আমার আজ একটা জরুরী কন্‌সাল্‌টেশন্ আছে এ পাড়ায়।

—তোমার প্র্যাকটিস্ তা'হলে বেশ জমে উঠেছে বলো।

তা' আপনার আশীর্ব্বাদে নেহাৎ মন্দ নয়। প্রায় রোজই এন্‌গেজড্ আছি।

—বেশ বেশ, তুমি জীবনে উন্নতি করতে পারবে।

তারক বিনম্রহাস্যে বিমলবাবুর পা ছুঁইয়া প্রণাম করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া গেল।

পটলডাঙায় আসিয়া দেখা গেল, রাখালের বাসা ডবল তালায় রুদ্ধ। সংবাদ পাইবারও কোনও উপায় সেখানে নাই।

বিমলবাবু সেখান হইতে ফিরিয়া সবিতার বাসায় আসিয়া নামিলেন। তাঁহার কণ্ঠের সাড়া পাইয়া সারদা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া হাসিমুখে প্রণাম করিল। বিমলবাবুর পানে তাকাইয়া বলিল, আপনি ভারি রোগা হয়ে গেছেন। কালোও হয়েচেন খুব। সেদেশের জল-হাওয়া বুঝি ভাল নয়?—

বিমলবাবু সহাস্যে জবাব দিলেন, দুনিয়ায় মায়েদের নজর চিরকাল ধরে এই একই কথা কয়ে আসছে। ছেলে কিছুদিন ঘরের বাইরে ঘুরে ঘরে ফিরলে মায়েরা তার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলবেনই, আহা, বাছা আমার আধখানা হয়ে ফিরেচে। আমি যে এরচেয়ে কম কালো ছিলাম বা বেশি মোটা ছিলাম, তার উপযুক্ত প্রমাণ কৈ সারদা-মা?

সারদা লজ্জিত হইয়া পড়িল। বিমলবাবুর কথা এড়াইয়া বলিল, বসুন; মাকে ডেকে দিচ্চি।

ডাকিতে হইলনা। রান্নাঘর হইতে সবিতা বাহির হইয়া আসিলেন। পরিধানে আধময়লা মোটা মিলের শাড়ী, শুভ্র ললাটের 'পরে ও কানের পাশে কেশগুচ্ছ রুক্ষ রেশমের ন্যায় দুলিতেছে। চেহারা

ওঁ্গ্রের চেয়ে অনেক শীর্ণ। আয়ত নয়নদ্বয়ের নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে চাপা বিষণ্ণতার ছায়া।

সবিতার শরীর এত বেশি খারাপ দেখিবেন বিমলবাবু বোধহয় আশা করেন নাই। তাই চকিত হইয়া বলিলেন, একি, তোমার শরীর এত বেশী খারাপ হয়ে পড়ল কি করে? অসুখ করেনি তো?

ভোরের অন্ধকার আকাশে পাণ্ডুর আলোর মত মৃদু হাসিয়া সবিতা বলিলেন, অসুখ করেনি। কিন্তু তুমি যে আমাকে লিখেছিলে, জাহাজ থেকে নেমে নিজের বাড়ীতেই উঠবে। সেখানে স্নানাহার বিশ্রাম করে বিকেলের দিকে এখানে আসবে। অথচ এ' তো দেখচি একেবারে ধূলোপায়েই উত্তরণ!

সারদা অন্যত্র চলিয়া গেল। গমনশীলা সারদার পানে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কণ্ঠস্বর একটু নিম্নে নামাইয়া বিমলবাবু বলিলেন, ধূলোপায়েই দেবীদর্শন যে শাস্ত্রের বিধি।

—তাই নাকি?

—বিশ্বাস না হয় পঞ্জিকা খুলে দেখতে পারো। কিন্তু সেকথা থাক্। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও?

—কী প্রশ্ন?

—শরীর এত বেশি খারাপ হল কেন?

ঠোঁটের কোণে সবিতার চাপাহাসি ফুটিয়া উঠিল। বিমলবাবুরই ক্ষণপূর্ব্বে সারদাকে বলার অবিকল ভঙ্গীতে কহিলেন, দুনিয়ার দয়াময়দের নজর অসহায় দীন-দুঃখীদের সম্বন্ধে চিরকাল ধরে ঐ একই কথা কয়ে আসচে।

সবিতার মুখে আপনার কথার অনুকৃতি শুনিয়া বিমলবাবু উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। সবিতাও হাসিতে লাগিলেন। অস্পষ্ট বেদনা

ছায়াচ্ছন্ন গৃহের আকাশ বাতাস যেন বহুদিন পরে আজ উন্মুক্ত হাসির স্বচ্ছ-ধারায় মালিন্যহীন হইয়া উঠিল।

বিমলবাবু বলিলেন, তোমার কাছে হার মানচি সবি—রেণুর-মা।

'সবিতা' বলিতে গিয়া বিমলবাবু যে তাড়াতাড়ি সেটা সামলাইয়া 'রেণুর-মা' বলিলেন, সবিতা তাহা লক্ষ্য করিয়া শুধু একটু হাসিলেন। বলিলেন, কোথায় স্নানাহার করবে? এখানে না বাড়ীতে?

—তুমি যেখানে বলো।

—বাড়ীই যাও।

—সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকবার কেউ নেই, তুমি জানোই। আছে শুধু চাকর-বাকর আর কর্ম্মচারীর দল। দূর সম্পর্কের একজন মাসিমা থাকেন বটে তাঁর একটি জড়বুদ্ধি ছেলেকে নিয়ে, কিন্তু তাঁর কাছে আমার আসাটা প্রীতির ব্যাপার কিংবা ভীতির ব্যাপার সঠিক নির্ণয় করা কঠিন।

—তা' হোক, বাড়ী যাও। যাঁরাই থাকুন সেখানে, সকলেই যে তাঁরা তোমার আসার প্রতীক্ষা করচেন এটা সঠিক। তা' প্রীতিতেই হোক্ বা ভীতিতেই হোক্। সরাসরি এখানে এসে ওঠা ভাল দেখাবেনা।

—নিন্দে হবে বুঝি? কা'র হবে? তোমার না আমার?

—কা'র মনে হয়?

—হয় যদি দু'জনেরই নাম জড়িয়ে হবে।

—তা' হলে আর দেরী করচ কেন?

—ভাবচি. মনের অবস্থাবিশেষে নিন্দাও অনেক সময়ে প্রশংসার চেয়ে বেশি প্রলুব্ধ করে।

—দার্শনিকতত্ত্ব থাকুক। বাড়ী যাও এখন।

—যাচ্চি। কিন্তু তুমি দেখচি আমাকে—

বিমলবাবুর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সবিতা বলিলেন,—তাড়াতে পারলেই যেন বাঁচি। কেমন তো? হ্যাঁ, তাইই। এখন তারই সাধনা করচি যে দয়াময়! কণ্ঠস্বর শেষের দিকে ভারী হইয়া উঠিল।

বিমলবাবু বিচলিত হইলেন। অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে এই অসতর্ক মুহূর্ত্তে তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল—সবিতা!

সকরুণহাস্যে বিমলবাবুর পানে তাকাইয়া সবিতা কহিলেন, পরে সব বলবো। এখন আমায় কিছু জিজ্ঞেসা কোরোনা।

—না, আমি সমস্ত না জেনে বাড়ী যাবোনা। তোমাকে বলতে হবে কী হয়েচে?

—বলবো। বিকেলে এসো। রাত্রে বরং এখানেই খেয়ো। আমি এখন নিজের হাতেই রাঁধচি।

বিমলবাবু বলিলেন, তাই হবে। কিন্তু দেখো, তখন যেন আমাকে ফাঁকি দিয়ে অন্য কথায় ভুলিয়োনা।

—ভয় নেই। জীবনে একমাত্র নিজেকে ফাঁকি দেওয়া ছাড়া আর কাউকে দিয়েছি বলে তো মনে পড়েনা। সবিতার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল।

বিমলবাবু লক্ষ্য করিলেন, সবিতা আজ সহজ পরিহাসের উত্তরেও কি যেন গুরুবেদনায় গম্ভীর হইয়া উঠিতেছে। ইহা যে তাহার অন্তর্গূঢ় কোনও একটা বিক্ষোভেরই বহির্লক্ষণ, ইহা বুঝিতে ভুল হইলনা। তাই আর কোনও কথা না কহিয়া বিকালেই আসিবেন বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বিমলবাবু যখন আসিলেন, সবিতা এবেলার রন্ধন শেষ করিয়া সান্ধ্যস্নান সমাপনান্তে পরিচ্ছন্নবাসে তেতালার ছাদে এক-খানি ডেক্‌চেয়ারে বসিয়াছিলেন। সামনে আর একখানি চেয়ার পাতা।

শুভ্র আবরণে ঢাকা একটি ছোট টীপয়ের উপরে স্বচ্ছ কাচের গ্লাসে চাপা দেওয়া পরিষ্কার পানীয় জল, সদ্য ঢাক্‌নি খোলা একটিন বিলাতি সিগারেট, যে-ব্র্যাণ্ডের সিগারেট, বিমলবাবু সর্ব্বদা ব্যবহার করেন। টীপয়ের 'পরে এক বাক্স নূতন দেশলাই ও ছাই ঝাড়িয়া ফেলিবার একটি পিতলের ঝকঝকে ক্ষুদ্র আধার।

বিমলবাবু আসিয়া দাঁড়াইলে, মৃণালদণ্ডের মত দেহলতা নত করিয়া সবিতা বিমলবাবুর দুই পায়ে হাত ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন।

বিমলবাবু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পিছু হঠিয়া গিয়া বলিলেন—ওকি করো, এ আবার কী পাগলামি—

আয়ত চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল করিয়া সবিতা বলিলেন, পাগলামি নয়, তোমার প্রধান প্রশ্নের উত্তর যে আমার এই। প্রভাতে করেচি আমন্ত্রণ, সন্ধ্যায় নিবেদন করলাম প্রণাম। আর আমাকে কিছু জিজ্ঞেসা করবেনা তো দয়াময়?

সবিতার কণ্ঠস্বরে এমনই এক অশ্রুতপূর্ব্ব মাধুর্য্য ক্ষরিত হইল যে, বিমলবাবু অল্পক্ষণ অভিভূতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। মনে হইল এ যেন তাঁহার পূর্ব্বপরিচিতা সে-সবিতা নয়, যে অসহায়াকে তিনি রমণীবাবুর সুসজ্জিত অট্টালিকায় দিনের পর দিন নিগূঢ় বেদনার মৌন ছায়াতলে বিষণ্ণ প্রতিমার মতো বারংবার দেখিয়াছেন। আজও সকালে রান্নাঘরের সম্মুখে যাহার ম্লান ক্লিষ্ট মূর্ত্তি দেখিয়া বুকের মধ্যে বেদনা মোচড় দিয়া উঠিয়াছিল,—এ যেন সে-সবিতাও নয়। সুগৌর শীর্ণ মুখে একটি প্রশান্ত কোমল মেদুরতা। সে মুখে হৃদয়াবেগের আতিশয্যজনিত উচ্ছ্বাস-দীপ্তি নাই, সলজ্জ প্রেমিকার প্রণয়সুলভ সরমরাগের রক্তিমাভা নাই।

সুকুমার ওষ্ঠাধরে প্রীতিস্নিগ্ধ সংযতহাস্যের মাধুর্য্যময় সুষমা। বিষাদ শান্ত নয়ন যুগলে বিচ্ছুরিত হইতেছে সুদূরপ্রসার দৃষ্টি।

াকল অঙ্গভঙ্গিমার রেখায় রেখায় বিকশিত হইয়া উঠিতেছে আজ এমন একটি সুচারু-সুন্দর অথচ সম্ভ্রমসূচক অভিব্যক্তি, যাহাতে স্নেহ ও শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও নির্ভরতার সম্মিলিত ব্যঞ্জনা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। নারীর এ মূর্ত্তি সংসারে একান্তই দুর্লভদর্শন। বিমলবাবুর বহুবিচিত্র জীবনেও এমনটি তিনি আর কোথাও দেখেন নাই।

সবিতার মহিমময়ী মূর্ত্তির পানে চাহিয়া, আজ সর্ব্বপ্রথম বিমলবাবুর মনে হইল, তিনি এ জগতে যে-স্তরের মানুষ, সবিতা তাহার অনেক উর্দ্ধলোকের অধিবাসিনী। মানবজীবনের যে অন্তরতম অনুভূতি, চরম দুর্য্যোগের মধ্যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধ যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, দুঃখের দুর্গমপথে বিক্ষতপদ-যাত্রীর যে ভূয়োদর্শন আজ তাঁহার অন্তর-বাহির ঘিরিয়া এমন একটি মহিমাকে রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছে, যাহাকে শুধু যথেষ্ট ব্যবধান হইতে মাথা নত করিয়া প্রণাম করাই চলে, পাশে যাইয়া দাঁড়ানো চলেনা।

বিমলবাবুর এই অভিভূত ভাব লক্ষ্য করিয়া সবিতা মনে মনে কুণ্ঠিত হইলেও সহজ মুখেই সম্ভাষণ করিলেন, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে, বোসো।

বিমলবাবু নিঃশব্দে নির্দ্দিষ্ট চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন বটে, কিন্তু তখনও সবিতার পানে অপলক নয়নে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার সে চাহনিতে আজ আর বিমুগ্ধের বিহ্বল আকুলতা নাই, আছে অনুরাগীর সশ্রদ্ধ বিস্ময়। এ যেন বাঞ্ছিত দেবমূর্ত্তির প্রতি ভক্তের বন্দনা-সুন্দর সন্দর্শন।

সবিতা সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, একদৃষ্টে চেয়ে দেখচ কি?

—তোমাকেই দেখচি।

—আমাকে কি কখনও দেখনি?

—আজকের তোমাকে সত্যিই কখনো দেখিনি। যাকে দেখেছি সে এ তুমি নও।

—সে কোন্ আমি দয়াময়?

—সে অন্য তুমি। দুঃখের পীড়নে বিচলিতা, অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ ভাবনায় কাতর তুমি। আত্ম-চিন্তায় আত্মহারা অসহায় তুমি।

—আর আজকে আমি?

—এ-তুমি আর এক নতুন মানুষ। আজই প্রথম দেখা পেলাম। এর সাথে সত্যিই আমার পরিচয় ঘটেনি এতদিন। সিঙ্গাপুরে লেখা তোমার চিঠিগুলির মধ্যে এর চরণধ্বনি শুনতে পেয়েচি বটে। আজ এসে দেখলাম অননুপূর্ব্ব আবির্ভাব।

সবিতা হাসিলেন। সে হাসি উদাস। গোধূলির রক্তিম আলোকে দূরাগত বাঁশির পূরবীসুর যেমন মানুষের চিত্তকে ক্ষণেকের জন্যও অকারণ উদাস করিয়া তোলে, সবিতার এই হাসিতে সেই মুহূর্ত্তের উদাস করিয়া তোলার আশ্চর্য্য মায়া নিহিত। বলিলেন, কি জানি, হতেও পারে। এক জন্মেই যে কত জন্মান্তর ঘটে যায় মানুষের, তার কি হিসাব আছে?

বিমলবাবু কথা কহিলেননা। বিস্মিত নয়নে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, সবিতার পরিধানে একখানি খয়েরীপাড় দুধেগরদ শাড়ী। কার্য্যোপলক্ষে একবার কাশী গিয়া বিমলবাবুই এই গরদশাড়ীখানি পূজা-আহ্নিকে ব্যবহারের জন্য সবিতাকে আনিয়া দিয়াছিলেন। শাড়ীখানি পরিবার জন্য অনুরোধ করিলে সবিতা হাসিয়া জবাব দিয়াছিলেন, এখন থাক। সময় হলে পরবো।

আজ সেই শাড়ীখানি পরিয়াই তিনি বিমলবাবুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

বিমলবাবু বলিলেন, জন্মান্তর মানতামনা, কিন্তু তুমি আমায় মানালে। সত্যি বটে ওটা এই জীবনেই ঘটে। তাই এতদিন পরে তোমার তো সময় হয়েচে তোমার এজন্মেই আমার দেওয়া শাড়ী পরবার।

সবিতাকে নিরুত্তর দেখিয়া বিমলবাবু বলিলেন, হয়তো ভুল বলচি। সময় হয়েচে না বলে সময় ফুরিয়েচে বলাই উচিত ছিল আমার, না সবি—রেণুর মা?

বিমলবাবুর প্রশ্নের জবাব এড়াইয়া সবিতা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু তুমি এই বিড়ম্বনা আরও কতোদিন ভোগ করবে বলোতো? ভিতর থেকে যে-ডাকটা আপনা হতে বেরিয়ে আসচে, তাকে বারে বারে গলা টিপে ঠেলে সরিয়ে অন্যের মুখের ডাক আওড়াতে চেষ্টা করছো! কতবারই তো ঠোক্কর খেলে! তবু ছাড়বেনা?

বিমলবাবু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন।

সবিতা বলিতে লাগিলেন, আগে ডেকেচো নতুন-বৌ, সেটা তোমার নিজের মুখের ডাক নয়। ও নামে প্রথম যিনি ডেকেচেন তাঁরই মুখে ওটা মানায়। তোমার মুখে বেসুরো শোনালো। তারপরে ডাকতে চেষ্টা করেচো 'রেণুর মা' সেও তোমার মুখে বার বার বাধা পাচ্ছে, স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠতে পারেনি, পারবেওনা হয়তো কোনওদিন।

—তবে কী বলে তোমায় ডাকব বলে দাও তুমি।

—কেন, 'সবিতা'। যে-ডাক আপনা হতে সহজে মুখে আসচে।

—তাই নাহয় ডাকব। কিন্তু 'রেণুর মা' নামে ডাকতে তুমিই যে আমাকে বলেছিলে একদিন।—আচ্ছা সত্যি করে বলো, না জেনে কোনও দিন অমর্য্যাদা ঘটিয়েছি কি সে-ডাকের?

—ওকথা মনেও এনোনা। তোমাকে ও-নামে ডাকতে বলা আমারই ভুল হয়েছিল। তোমার কাছে তো আমার ও-পরিচয় নয়। কোনও দিনই ও-ডাকটা তাই তোমার কণ্ঠে সজীব হয়ে উঠলনা। দেখো, অনেক দুঃখ পেয়ে, একটা কথা আমি এখন বেশ বুঝেচি, যার যা, তা তা'ই

ভালো। তোমার মুখে সবিতা ডাক যত সহজ-সুন্দর, এমন অন্য কিছুটি নয়।

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, আমার অন্তরের আনন্দ-নির্ঝরে যে নামের বুদ্‌বুদ্‌গুলি আপনা হতেই রামধনুর রং নিয়ে ফুটে উঠে আপনিই ভেঙে ভেঙে বিলীন হয়ে যাচ্চে, সেই নাম দিয়েই এবার থেকে ডাকতে অনুমতি দাও তা'হলে। কিন্তু, বুদ্‌বুদের ভাঙা-গড়ার বিরাম নেই জানো তো?

—জানি।

—তুমি কি তা' সইতে পারবে রেণুর মা? গোক্‌না সে জলবিন্দুর বুদ্‌বুদ মাত্র, তবুও তোমাকে হয়তো তা' বিঁধবে আমার ভয় করে।

সবিতার মুখে ছায়া নামিয়া আসিল। বলিলেন, ঐ তো তোমাদের দোষ। মেয়েদের সম্পর্কে কোনও দিনই সহজ হতে পারোনা তোমরা। হয় অতিভক্তি অতিশ্রদ্ধার গদ্‌গদ্‌ হয়ে বহু সম্ভ্রমে উঁচুতে তুলে ধরতে চাইবে.. নাহয় একেবারে নর-নারীর চিরদিনের আদিম সম্পর্ক পাতিয়ে ঘনিষ্ঠতা করে বসবে। পুরুষ আর নারীর মধ্যে মানুষের সহজসুন্দর সম্বন্ধ কি পাতানো যায়না সত্যিই?

বিমলবাবু শান্ত গলায় বলিলেন, তোমার আমার সম্বন্ধের মধ্যে এ প্রশ্ন ওঠবার সময় যদিও আজও আসেনি সবিতা, তবু তোমাকেই জিজ্ঞাসা করচি, বলতে পারো কি কেন এমন হয়?

একটু চিন্তা করিয়া সবিতা বলিলেন, ঠিক জানিনে। তবে অনুমান হয়, সমাজবিধির বনেদের নিচেয় এর বীজ পোঁতা আছে হয়তো। নইলে সর্ব্বত্র সকলক্ষেত্রেই একই বিষময় ফল ফলে ওঠে কি করে? দেখো, সমাজের বাইরে এসে আজ আমার চোখে সমাজের কল্যাণ ও অকল্যাণের দুটো দিকই সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে। ওর ভিতরে থাকতে এমন করে দোষ ও গুণ দুদিক্ দেখতে পাইনি।

বিমলবাবু নিবিষ্টচিত্তে সবিতার কথা শুনিতেছিলেন, নিজে কথা কহিলেননা। সবিতা বলিতে লাগিলেন, মানুষ নিজের মন নিয়ে কতই না বড়াই করে, কিন্তু কতোটুকুই বা তার পরিচয় সে জানে? জীবনের প্রতি অঙ্কে অঙ্কেই তার রূপ বদলাচ্চে।

—এই তো সেদিন পর্য্যন্তও মনে ভেবেচি, আমার মতো স্বামীকে ভক্তি জগতে বুঝি আর কোনো মেয়েই কখনো করেনি। স্বামীকে আমার মতো এতটা ভালবাসতেও হয়তো অন্য কোনও কেউ পারবেনা। বাইরের পৃথিবী বিপরীত সংবাদ জানলেও, আমার আপন অন্তরের খবর আমি তো ভাল করেই জানি। কিন্তু এতদিন পরে আজ সে-ধারণা বদলে গেছে আমার। আপন অন্তরের যথার্থ অর্থ এতকাল বাদে বুঝতে পারচি।

আশ্চর্য্য হইয়া বিমলবাবু বলিলেন,—কী বুঝেচ সবিতা?

কতকটা আত্মগত ভাবেই সবিতা বলিলেন, ঠিক স্পষ্ট করে সেটা বলা শক্ত। আজ শুধু এইটুকুই আমি বেশ বুঝতে পারচি, অন্তরের শ্রদ্ধা ভক্তি এবং সংস্কারগত ধারণা—আর হৃদয়ের প্রেম একই বস্তু নয়।

—কিন্তু, আমি শুনেছি অনেক সময়ে শ্রদ্ধা ভক্তিই তো হয়ে দাঁড়ায় প্রেমের ভিত্তি।

—হাঁ, তা' হয়। করুণা মমতা বা সমবেদনাও অনেকক্ষেত্রে হয়তো প্রেমকে গড়ে তোলে। কিন্তু আমার বিশ্বাস নারী ও পুরুষের পরস্পরের মধ্যে ভিতর ও বাহিরে স্বাভাবিক মিল না থাকলে প্রেম স্ফূর্ত্ত হলেও সুসার্থক হয়না। তা'ছাড়া আরও একটা কথা। অনেক সময়ে শ্রদ্ধা ভক্তিকে কিংবা স্নেহ মমতাকে মানুষ প্রেম বলে ভুলও করে।

—তুমি কি বলতে চাও স্নেহ বা মমতা হতে যে-প্রেমের উদ্ভব, তা' সত্য কিংবা সার্থক নয়?

—এমন কথা কেন বলবো? নিশ্চয় তা' সত্য এবং সত্য হলেই সার্থক না হয়ে পারেনা। আমি বলছি,—স্নেহ মমতা যথার্থ-ই যদি প্রেমে পরিণত হয়, তবেই সত্য। সাগরে গিয়ে পৌঁছুতে পারলে তখন সকল জলই এক। ঝর্ণারজল নদীরজলও যা, বৃষ্টির জল বন্যার জলও তাই।

বিমলবাবু সবিতার পানে স্থির দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া বলিলেন, আচ্ছা, এ সকল কথা তুমি জানলে কেমন করে?

অল্পক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া সবিতা মুক্ত আকাশে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া কহিল, নিজেরই বিড়ম্বিত জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে জেনেচি দয়াময়।

বিমলবাবু প্রশ্নপূর্ণ নয়নে তাকাইয়া রহিলেন।

সবিতা বলিলেন, বলবো তোমাকে একদিন আমার সমস্ত কথাই।

বিমলবাবু অনুযোগের সুরে বলিলেন, তুমি সমস্ত কথাই অন্য একদিন বলবো বলে সরিয়ে রেখে দাও। কবে তোমার সেই অন্য একদিন আসবে সবিতা? একদিন বলেছিলে তোমাকে আমার স্বামীর সমস্ত কথা শোনাবো। সে শুধু আমিই জানি, আর কেউ নয়।

সবিতা বলিলেন, বলতে ইচ্ছে হয় কিন্তু—বলা হয়ে ওঠেনা। নিজেকে সম্বরণ করা কঠিন হয় পড়ে। কিন্তু—সে সব কথা শুনে লাভই বা কি? স্বেচ্ছায় স্বামীত্যাগ করে যে-মেয়ে অকূলে ভেসেছে,—স্বামীর প্রতি আজও তার মনোভাব কেমনতরো, জানতে বুঝি কৌতূহল হয়?

—ছি—ছি,—পরিহাস করেও এমন কথা আমাকে বলা তোমার উচিত নয়, একি তুমি জানোনা সবিতা?

—জানি। মাপ করো। তোমাকে অকারণ আঘাত করলাম, আমার অপরাধের শেষ নেই। তারপর অন্যমনস্কচিত্তে সবিতা কি যেন ভাবিতে লাগিলেন।

বিমলবাবু নীরবে একদিকে তাকাইয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিয়া গেল।

বিমলবাবু ডাকিলেন, সবিতা—

কি বলচ ?—

সত্যি করে বলো, তুমি কি আমাকে ভয় করো ?

—কী জন্য ভয় ? সবিতার কণ্ঠে বিস্ময় ধ্বনিত হইল।

বিমলবাবু জবাব দিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া সবিতা ম্লান হাসিয়া বলিলেন, তোমাকে ভয়ের তো আমার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। কী ক্ষতি বাকি আছে এখনো, যার জন্য ভয় করবো।

বিমলবাবু বলিলেন, জীবনের উপর এতবড় অভিমান আর যে-কেউ করে করুক, তোমাকে করতে দেবোনা। মানুষের যা কিছু মর্য্যাদা জীবনের একটা কোনও আকস্মিক দুর্ঘটনায় নিঃশেষে ভস্ম হয়ে যায়না। যতক্ষণ বেঁচে থাকে মানুষ, ততক্ষণ তার সবই থাকে। কোনও কিছুই ফুরিয়ে যায়না।

সবিতা মৌন রহিলেন। কতক্ষণ পরে স্থির গলায় বলিলেন, তোমাকে ভয় একটুও করিনে। বরং তোমার সম্বন্ধে নিজের এই একান্ত নির্ভরতাকেই ভয় করেচি এতদিন। এখন সে ভয়ও কেটেচে। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। আমার মনে হয়, সংসারে বুঝি আর কোনো মেয়েই এমন করে কোনও নিঃসম্পর্কীয় পুরুষকে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করতে পারেনি।

অল্প থামিয়া কণ্ঠস্বর একটু নিচু করিয়া সবিতা আবার বলিলেন, আমি জানি তুমি কোনওদিন আমাকে নিচে নামাতে পারবেনা। পুরুষদের কাছে মেয়েদের অপমান ও অবহেলা যা' হ'তে ঘটে, তা' তুমি কখনই ঘটতে দেবেনা। সবার চেয়ে বড় কথা, আমাকে বুঝতে তোমার ভুল হয়নি।

বিমলবাবু মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, মানুষ মানুষই। দেবতা তো নয়। তার সমস্ত ভালো মন্দ, দোষ গুণ, বলিষ্ঠতা দুর্ব্বলতা নিয়েই তার সমগ্র রূপ। সুতরাং তার উপরে কি এতটা বেশি বিশ্বাস রাখা সঙ্গত?

—কী সঙ্গত আর কি অসঙ্গত জানিনে, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে জানতে চাইওনে। যা' নিজের অন্তরের মধ্যে একান্তভাবে অনুভব করেচি তাই বললাম মাত্র।

বিমলবাবু বলিলেন, তোমার সংস্পর্শে এসে কী আমার লাভ হয়েচে জানো সবিতা? আমি সর্ব্বপ্রথম অনুভব করেচি, অকল্যাণের ভিতর দিয়েও পরমকল্যাণ এসে জীবনকে স্পর্শ করে।

সবিতা বলিলেন, মানি এ কথা আমি। অকল্যাণের পথেই আমার দীর্ঘ চলার ক্লান্ত সাঁঝে তোমার সঙ্গে হয়ে ছিল হঠাৎ সাক্ষাৎ। হয়েছিল বিরুদ্ধ আবেষ্টনের মধ্যে অবাঞ্ছিত পরিচয়। ভাগ্যে জোর করে তুমি সেদিন দেখতে এসেছিলে আমাকে।

বিমলবাবু আহত হইয়া অকৃত্রিম দুঃখিত স্বরে বলিলেন, এ ধারণা তোমার সত্য নয় সবিতা। জীবনের অজ্ঞাতপথে মানুষের সাথে মানুষের নিবিড় পরিচয় কবে কোন্‌দিন কোথা দিয়ে কেমন করে ঘটে যায়, কেউই জানেনা। কথাটা আমি আমার নিজের দিক থেকেই বলেছিলাম। এতদিন নিজের অতীতের অপরিচ্ছন্ন অংশটার পানে তাকিয়ে হয়েছে বিতৃষ্ণা, এসেছে ঘৃণা, ক্ষোভ, লজ্জা। কতবার ভেবেচি, জীবনের অশুচি অংশটুকু যদি কোনও উপায়ে ধুয়ে সাদা করে ফেলা যেতো! ছিঁড়ে নিশ্চিহ্ন করা যেতো স্মৃতির খাতা থেকে ঐ গ্লানিময় দিনগুলির পৃষ্ঠা! কিন্তু আজ সর্ব্বপ্রথম মনে হচ্চে, ভগবান মঙ্গলই করেছেন, ঐ দিনগুলির দুরপনেয় কালির দাগ এঁকে দিয়ে এই জীবনে।

সবিতা মুখ উঁচু করিয়া বলিলেন, তার মানে?

—বুঝতে পারলেনা ? আজ আমার লোভের অশুচিস্পর্শ থেকে আমিই তোমাকে রক্ষা করতে পারবো। নিজের জীবনের এই কলঙ্কিত মহিমায় তোমাকে এনে দাঁড় করাতে পারবোনা আমি। এখানে তোমার উপযুক্ত আসন নেই যে।

সবিতা অস্ফুট স্বরে কহিলেন, সোনায় কলঙ্ক লাগেনা দয়াময়। কলঙ্কের কণামাত্র স্পর্শেই চিরমলিন হয়ে যাই আমরাই, নিকৃষ্ট ধাতু।

বিমলবাবু গভীর কণ্ঠে বলিলেন, আমি তা' একটুও মানিনে। দেখো সবিতা, আর যা কাছে এখন যাই হও, আমার জীবনে পরম কল্যাণরূপিণী তুমি। এ কথা মিথ্যা নয়। জীবনে ঘটেছে আমার বহু বিচিত্র নারীর সাক্ষাৎ; কিন্তু তোমার সাথে হলো সন্দর্শন। আমার মধ্যে যে সত্যি মানুষটি এতকাল ঘুমিয়েছিল, তুমিই তার ঘুম ভাঙিয়ে জাগিয়ে তুললে সেদিন, যেদিন তোমার স্বতঃ অভিজাতপ্রকৃতির আপন স্বরূপ, সেই বিষণ্ণ ম্লান অনুতাপদগ্ধ অথচ সহজ মর্য্যাদামহিম রূপের প্রথম দর্শনেই চিনতে পারলাম। রমণীবাবুর প্রমোদ-আমন্ত্রণে দেখতে গিয়েছিলাম এক, দেখলাম তার বিপরীত। তোমার জীবনের ইতিহাস আজ আমার নিজের জীবনের ক্ষোভ ভুলিয়ে দিয়েছে সবিতা। সংসারে আমারই অনুরূপ অনুভূতি ঘটেছে এমন মানুষ এই প্রথম দেখলাম, সে তুমি। যে, নিজের প্রকৃতি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে অবাঞ্ছিত অন্যতর জীবন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় যাপন করতে বাধ্য হয়েছে। নিজের স্বভাবকে চাপা দিয়ে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার দাবী মিটিয়ে, আয়ুকে কোনোরকমে শেষের পানে টেনে নিয়ে চলা বৈ তো নয়। অনুভূতির ক্ষেত্রে, তুমি আর আমি এইখানে একই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি। হয়তো বা এই জন্যই তোমার অন্তরের সাথে আমার অন্তরঙ্গতা যা' সম্ভবপর ছিল না, তা সম্ভব শুধু নয়, সহজও হয়েচে।

সবিতা নত নেত্রে নীরবে শুনিতেছিলেন। এখনও অবনত নয়নে মৌন ... ন।

... লবাবু ধীরকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, আ... আমার কাছে জীবনের অর্থ গেছে বদলে। মনের পুরানো ধারণাগুলির উপর থেকে বহুদিনের সঞ্চিত পুরু ধূলো নিঃশেষে যাচ্ছে মুছে। দীর্ঘকাল উপেক্ষায় পড়ে থাকা —আয়নার উপরের জমাট ময়লা তা... যে স্বচ্ছতা...ক আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সে যেন আজ কোন্ নব গৃহলক্ষ্মীর স...মার্জ্জনায় একেবারে নির্ম্মল হয়ে উঠেছে। সমস্ত পৃথিবী আমার ...কা... আ... নব ঠেকচে আজ। এ যৌবনের উদ্দাম হৃদয়াবেগ নয়, দেহের ...রায় শিরায় তরুণ রক্তের চঞ্চল নৃত্য নয়। এ আমার হিমকঠিন অন্তরলোকে মূৰ্চ্ছিত আত্মার জাগরণ। হৃদয়ের কুয়াসাচ্ছন্ন আকাশে নবচেতনার প্রথম সূর্য্যোদয়।

স্বভাবতঃ স্বল্পভাষী বিমলবাবু যে এমন করিয়া আপন অন্তরের গভীর অনুভূতিগুলিকে ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন, সবিতার কল্পনাও ছিলনা। সংসারে বুঝি সব কিছুই সম্ভব। তাই অত্যন্ত ধীরে—প্রায় অস্পষ্ট স্বগতোক্তির মতই সবিতা বলিতে লাগিলেন,—এ তো তোমার নিজের মনের রচনা করা—আমি। ওর সঙ্গে সত্যিকার আমার মিল কতটুকু, সে সন্ধান তুমি জানোনা, আমিও জানিনে। নাই থাক্ সে জানাজানি, ভগবান করুন, তুমি যে-আমাকে দেখেছ, সে যেন তোমার কাছে মিথ্যা না হয়।

২৪

বিমলবাবু যখন রাখালের খোঁজ করিতেছিলেন, সে তখন কলিকাতার বাহিরে। রেণু ও ব্রজবাবুকে বৃন্দাবনে পৌছাইয়া দিতে গিয়াছে। ফিরিয়া আসিয়া বিমলবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে বিমলবাবু অভিযোগ করিলেন, একটাদিন অপেক্ষা করলেই আমার সঙ্গে ব্রজবাবুর দেখা হতো। তুমি কেন তার ব্যবস্থা করলেনা রাজু? তোমাকে তো আমি চিঠি লিখেছিলাম।

—ওঁরা যে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ এড়াবেন বলেই তাড়াতাড়ি করে চলে গেলেন!

—তার কারণ?

—তা' জানিনা! তবে কাকাবাবুর চেয়ে রেণুই বেশি ব্যস্ত হয়েছিল।

—বুঝেচি!

বিমলবাবু কতক্ষণ মৌন রহিয়া পরে বলিলেন, বৃন্দাবনে কোথায় ওঁদের রেখে এলে?

—গোবিন্দজীর মন্দিরের কাছাকাছি একটা গলিতে। বাড়ীখানা বড়, অনেকঘর ভাড়াটে থাকে। এঁরা নিয়েছেন দুখানি শোবার ঘর, একটু রান্নার জায়গা। ভাড়া সামান্যই।

বিমলবাবু চিন্তিতমুখে বলিলেন, তুমি ছাড়া তো ওঁদের দেখাশোনার কেউই রইলোনা। আমার মনে হয়, অন্ততঃ কিছুদিনও এ সময় বৃন্দাবনে গিয়ে তোমার থাকা দরকার।

—কিন্তু তার ফলে আমার জীবিকা যে এখানে অচল হয়ে দাঁড়াবে!

বিমলবাবু নতমস্তকে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিয়া গেল। রাখাল বলিল,—আপনি অদৃষ্ট মানেন কি না জানিনা, আমি কিন্তু মানি।

রাখালের কথার উত্তর না দিয়া বিমলবাবু বলিলেন, তুমি বোধহয় শুনেছ—তারক হাইকোর্টে বেরুচ্ছে। প্র্যাক্টিস মন্দ হচ্ছেনা। মনে হয় ওর উন্নতি হবেই। ছেলেটির বড়ো হবার আকাঙ্ক্ষা খুব। অনেক আশা করেছিলাম, ওর হাতে রেণুকে দেবো। কিন্তু ব্রজবাবুর সঙ্গে ত এ বিষয়ে আলোচনারই সুযোগ হলনা।

রাখাল বিস্মিত হইয়া বিমলবাবুর পানে তাকাইয়া রহিল।

বিমলবাবু পুনরায় বলিলেন, তোমার নতুন মারও তাই ইচ্ছে ছিল। শুনলে হয়তো ব্রজবাবুও রাজি হতেন।

রাখাল মৃদুকণ্ঠে কহিল, কিন্তু তারক কি রাজি হয়েচে?

—তাকে এখনো বলা হয়নি। তবে তোমার নতুনমা তাকে আভাসে কতকটা জানিয়ে রেখেচেন।

রাখাল আবার বলিল, আপনার কি মনে হয়, সে এ প্রস্তাবে সম্মত হবে?

বিমলবাবু বলিলেন, সম্মত না হবার তো কারণ দেখিনা। রেণু সকল দিক দিয়েই যোগ্যপাত্রী। একমাত্র ত্রুটী, তার বাপ এখন দরিদ্র। কিন্তু মায়ের যা' কিছু আছে, রেণুই পাবে। তারক নিজে তোমার নতুন মাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করে, তাঁরই কাছে সে রয়েছে, সুতরাং কোনও দিক দিয়েই তার অমত্ করার কারণ দেখা যায়না।

রাখাল চুপ করিয়া রহিল। বিমলবাবু বলিলেন, রাজু, তোমাকে একটি কাজ করতে হবে।

রাখাল বলিল,—কি বলুন।

—তারকের কাছে এই বিবাহের প্রস্তাবটা তোমাকেই তুলতে হবে।

রাখাল আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, আপনি কি শোনেননি, রেণু বিবাহ করতে একেবারেই অসম্মত।

—তাকে রাজি করাবার ভার আমার। তুমি তারকের কাছে কথাটা উত্থাপন করে তার মতামতটা আমাকে জানালে, আমি নিজে বৃন্দাবনে গিয়ে রেণুকে সম্মত করিয়ে আসতে পারবো।

রাখাল বলিল, আপনি ভুল করচেন। রেণু বা তারক কেউই এ বিবাহে সম্মত হবে বলে মনে হয়না।

বিমলবাবু বলিলেন—রেণুর কথা থাক। তারক কেন রাজি হবেনা বলোত ?

—সে আমি—কি করে বলবো ? তবে সম্ভবতঃ হবেনা বলেই মনে হয়।

—তুমি একবার প্রস্তাব করেই দেখনা

—আচ্ছা।

বাসায় ফিরিয়া বাহিরের পরিচ্ছদ না ছাড়িয়াই বিছানার উপর লম্বা হইয়া রাখাল শুইয়া পড়িল। চক্ষু বুজিয়া সম্ভব অসম্ভব কত কি ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে খাওয়ার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল খেয়াল রহিলনা।

বুড়ী নানী কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ হইয়া শয্যাগত আছে। কাজ করিতে আসিতে পারেনা। তার দৌহিত্রকে কাজে পাঠায়। নানীর নাতির বয়স বেশী নয়। বছর তেরো চৌদ্দ হইবে। নাম নীলু। খুব হাসিখুশি স্ফূর্ত্তিবাজ ছেলেটি, সর্ব্বদা কণ্ঠে গুন গুন করিয়া গানেরসুর লাগিয়াই আছে। কাজকর্ম্ম বেশ চট্‌পট্ করিতে পারে। তবে, প্রায় প্রতিদিনই রাখালের দুটা একটা চায়ের পেয়ালা পিরিচ, না হয় কাচের প্লেট বা কাচের গ্লাস তার হাতে ভাঙিয়া থাকে। যখনি সে অপ্রতিভ মুখে লম্বা জিভ কাটিয়া রাখালের সম্মুখে

আসিয়া দাঁড়ায়, রাখাল তাহার চেহারা দেখিয়াই বুঝিতে পারে আজ আবার কাচের জিনিস একটা গেল। কাচের ভাঙা টুকরাগুলি সাবধানে ফেলিয়া দিতে বলিয়া রাখাল তাহাকে ভবিষ্যতে কাচের সামগ্রী সতর্কভাবে নাড়াচাড়া করিবার সদুপদেশ দেয়। তৎক্ষণাৎ প্রবলভাবে মাথা হেলাইয়া সম্মতিজ্ঞাপন করিয়া আবার তিন লাফে নীলু ছুটিয়া চলিয়া যায়। রাখাল তাহার নানী বুড়ির নাতিকে আদর করিয়া ডাকে—নীলু খুড়ো।

বেলা চারটার সময় নীলু আসিয়া যখন রাখালকে ডাকিয়া জাগাইল, চোখ রগড়াইয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া তাহার খেয়াল হইল, আজ খাওয়া হয় নাই। বিমলবাবুর সহিত দেখা করিয়া বাড়ী ফিরিয়া কাপড়-জামা না ছাড়িয়া বিছানায় শুইয়াছিল, কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে টের পায় নাই।

ঘড়ির পানে চাহিয়া রাখাল নিজের 'পরে বিরক্ত হইল। আজকাল তাহার যেন কী হইয়াছে। ঘরদুয়ার, কাজকর্ম্ম, বেশভূষা, শরীর-স্বাস্থ্য কোনও দিকে আর মনোযোগ নাই। এমনকি সবদিন খাওয়াদাওয়ারও খেয়াল থাকেনা তার। এ ভাল নয়। গরীব মানুষ সে। এ রকম খামখেয়াল বড়মানুষদেরই সাজে। যাদের প্রতিবারের পেটের অন্ন প্রতিদিনের উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করে, তাদের এ অন্যমনস্কতা শোভা পায়না। বারংবার সুদীর্ঘ কামাই করার দরুণ তাহার টিউশনীগুলি একে একে গিয়াছে। কেবল একটিমাত্র টিউশনী আজও কোনওক্রমে টিঁকিয়া আছে, সে কেবল রাখাল তাহাদের সময়-অসময়ের একমাত্র বিশ্বস্ত কাজের মানুষ বলিয়া। টিউটররূপে তাহার মূল্য না থাকিলেও, বন্ধু হিসাবে, বিশ্বস্ত কাজের লোক হিসাবে মূল্য আছে। নিজের লেখাপড়ার কাজও এইসব ঝঞ্ঝাটে বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। যাত্রার পালা লেখা ও বেনামীতে নাটক রচনায় বহুদিন আর হাত দিতে পারে নাই। ব্যাঙ্কের ও

পোষ্ট্ অফিসের পাশ বহিতে জমার ঘর শূন্য হইয়া আসিয়াছে। খাবারের দোকানে, মুদীর দোকানে এবং গোয়ালার কাছে কিছু কিছু টাকা বাকি পড়িয়াছে। যদিও সে, আজকাল আর নিজের পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিচ্ছদের সৌখীন বিলাসে একেবারেই মনোযোগী নয়,—তবুও দর্জ্জি ও ধোবার বিল্ বোধহয় বেশ কিছু জমিয়াই আছে।

নীলুর ডাকে রাখাল উঠিয়া মুখ ধুইতে ধুইতে বলিল,—নীলুখুড়ো, ষ্টোভ্‌টা ধরিয়ে লক্ষ্মী ছেলের মত চায়ের জলটি চড়িয়ে দাও দিকি।

নীলু ঘরের সম্মুখে দালানে এঁটোবাসন দেখিতে না পাইয়া বিস্মিত হইয়া রাখালের নিকটে আসিয়াছিল। উদ্বিগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, বাবু, আপনার কি অসুখ করেচে?

রাখাল তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল—কে বললে রে?

—কিচ্ছু খান্‌নি যে!

রাখাল হাসিয়া বলিল, না, অসুখ করেনি। এমনিই আজ খাইনি। তুমি এখন একটা কাজ করো তো নীলুখুড়ো! চায়ের জলটা চড়িয়ে দিয়ে ঐ মোড়ের দোকান থেকে গরম শিঙাড়া কিছু নিয়ে এসো। চায়ের সঙ্গে খাওয়া যাবে।

নীলু ষ্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল বসাইয়া খাবার আনিতে চলিয়া গেল, রাখাল চা তৈয়ার করিতে বসিল। একবার মনে হইল, এত হাঙ্গামা না করিয়া সারদার কাছে গিয়া বলিলেই ত' হয়—আজ অসময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ভাত খাইতে ভুল হইয়া গিয়াছে। ব্যস্, তার পরে আর কিছু ভাবিতে হইবেনা।

কল্পনায় সারদার স্তম্ভিত ক্রুদ্ধ মুখের অন্তরালে যে ব্যাকুল স্নেহের সংগুপ্তরূপ রাখালের চোখে ভাসিয়া উঠিল, তাহা স্মরণ করিয়া বুকের ভিতর হইতে একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। না, সারদার

নিকট যাওয়া উচিত নয়। বেচারী নিরুপায় বেদনায় মর্ম্মাহত হইবে মাত্র। রাখাল জানে, সারদার কী বিপুল আকাঙ্ক্ষা, দেবতাকে নিজের হাতে সেবাযত্ন করিবার। উন্মনাচিত্তে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া রাখাল পেয়ালায় চা ঢালিতে প্রবৃত্ত হইল।

সারদা ও সবিতাতে আলাপ চলিতেছিল। সবিতা বলিলেন, তোমাদের সোনাপুরের গল্প বলো সারদা, শুনি।

সারদা হাতে সেলাইয়ের কাজ করিতে করিতে জবাব দিল,—আপনাকে যে একবার দেখেছে মা, তাকে আর চিনিয়ে দিতে হবেনা যে, রেণু আপনারই মেয়ে!—কেবল চেহারাতেই সে আপনার মেয়ে হয়নি, বুদ্ধিতে, মর্য্যাদাশীলতায়, মনের আভিজাত্যে সে আপনারই প্রতিচ্ছবি।

সবিতা বলিলেন, সারদা, এমন ক'রে কথা কইতে শিখলে তুমি কা'র কাছে? এ'তো তোমার নিজের ভাষা নয়!

সারদা লজ্জিত হইয়া মাথা অবনত করিল।

—রেণুর সম্বন্ধে এ সকল কথা তুমি আর কারো সাথে আলোচনা করেচ বুঝি?

সারদা সলজ্জ সঙ্কোচে বলিল, হ্যাঁ। সোনাপুরে দেব্‌তার সঙ্গে রেণুকে নিয়ে আমাদের আলোচনা হতো।

সবিতা হাসিয়া সারদার মাথায় পিঠে সস্নেহে হাত বুলাইয়া বলিলেন, তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে, আমি জানি।

সারদা উৎসাহিত হইয়া বলিল, সত্যি মা, এত বেশি সাদৃশ্য বড় দেখা যায়না! রেণু যেন একেবারে আপনারই ছাঁচে গড়া।

সবিতা ত্রস্তগলায় বলিয়া উঠিলেন,—না না, অমন কথা মুখে এনোনা সারদা, আমার মতন যেন কিছুই না হয় তার।

সারদা একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, আচ্ছা, ওকথা থাকুক এখন। কাকাবাবুর গল্প করি, কেমন?

সবিতা বলিলেন—বলো।

—কাকাবাবু মানুষটি বড় ভাল, কিন্তু মা সংসারে থেকেও তিনি সংসার-উদাসীন। গোবিন্দ—গোবিন্দ করেই পাগল। ইহ-সংসারে গোবিন্দ ছাড়া কিছুরই প্রতি তাঁর আসক্তি আছে বলে মনে হয়না।

সবিতা রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলেন, নিজের মেয়ের প্রতিও না?

সবিতার শঙ্কাকুল মুখের পানে তাকাইয়া সারদা কৈফিয়তের স্বরে বলিল,—তিনি সংসারের সকল ভাবনা ইষ্টদেবের পায়ে সঁপে দিয়েচেন। তাঁর মেয়েও বোধহয় তার বাইরে নয় মা।

সবিতা পাষাণ প্রতিমার ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিলেন।

সারদা সান্ত্বনার স্বরে বলিল, আকুলি ব্যাকুলি করেও তো মানুষ নিজে কিছুই পারেনা। তার চেয়ে ভগবানের উপরে নির্ভর করে থাকাই তো ভালো মা।

সবিতা আর্ত্তকণ্ঠে বলিলেন, সারদা, তুমি বুঝবেনা। তুমি নিজে সন্তানের মা হওনি যে! সন্তান যে কী, তা' পুরুষ মানুষ বোঝেনা, যে-মেয়েরা মা হয়নি, তারাও ঠিক বুঝতে পারেনা। রেণুর সম্বন্ধে আজ আমি কি করে তোমার কাকাবাবুর মত নিশ্চিন্ত থাকবো? চব্বিশ ঘণ্টা ওই গোবিন্দ—গোবিন্দ করে দিনপাত করাতেই ত' সংসারের সর্ব্বনাশ ঘটেচে, ব্যবসার সর্ব্বনাশ ঘটেচে। এখনও কি চৈতন্য হোলোনা? মেয়েটার মুখ চেয়েও ধর্ম্মের ঝোঁক থেকে এখনও একটু নিবৃত্ত হতে পারলেননা?

সারদা ভীতচখে সবিতার আরক্তিম মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। সবিতা উত্তেজিত অথচ অত্যন্ত মৃদুগলায় বলিতে লাগিলেন, এতকাল

ভাবতাম আমার স্বামীর মত স্বামী বুঝি কখনো কারো হয়নি, হবেনা। এখন আমার সে ভুল ভেঙেচে। এখন বুঝেচি, আমার স্বামীর মত আত্মসর্ব্বস্ব মানুষ সংসারে অল্পই। নিজের স্ত্রী নিজের সন্তানের প্রতিও যে-মানুষ অচেনার মত উদাসীন, এমন মানুষের কী প্রয়োজন ছিল বিবাহ করার! বিবাহও করেছেন ওঁর গোবিন্দেরই জন্য। বুঝলে সারদা, তোমরা যাকে ওঁর মহত্ত্ব বলে ভাবো, সেটা ঠিক তার উল্টো।

—কা'র মহত্ত্ব উল্টো, নতুন-মা? রাখাল ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে হাসিমুখে প্রশ্ন করিল।

সবিতা ঘাড় ফিরাইয়া শান্তগলায় বলিলেন, তোমার কাকাবাবুর।

মুহূর্ত্তমধ্যে রাখালের হাস্যপ্রসন্ন মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। সবিতা তাহা লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিলেন, আমার রাজু তার কাকাবাবুর এতটুকু নিন্দে সইতে পারেনা।

রাখাল গম্ভীর মুখেই বলিল, সেটা তো একটুও আশ্চর্য্য নয় মা। সংসারে কাকাবাবুরও যে নিন্দে হতে পারে, এইটেই কি সব চেয়ে আশ্চর্য্য নয়?

সবিতা বলিলেন, রাজু, আমি তোর কাকাবাবুর নিন্দে করিনি। কিন্তু আজ যে—

রাখাল হাতজোড় করিয়া বলিল, আর কিছু বলবেননা মা। আমি আগেকার মানুষ, আজকের খবর জানিনে, জানতে চাইওনে। যেটুকু আগের খবর জানি সেটুকু পাছে ভেঙে যায় সেই ভয়েই এখন সশঙ্ক হয়ে আছি।

সবিতা ক্ষণকাল রাখালের পানে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, —পাগল ছেলে, (এক কালের জানা কখনও চিরকালের হতে পারেনা। জোর করে তা' করতে গেলে, হয় চোখ বুজে অন্ধ হয়ে থাকতে হয়, না হয়

চরম ক্ষতির দুঃখ ভোগ করতে হয়। সংসারের এই নিয়ম।—সবিতার কণ্ঠস্বরে গভীর স্নেহ উৎসারিত হইল।

রাখাল আর কথা কহিল না। সারদা উঠিয়া যাইতেছে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তারক এখন বাড়ী আছে কি জানো সারদা?

সারদা বলিল, আজ তো কাছারী নেই। সম্ভবতঃ নিচের তাঁর আফিস-কামরাতেই আছেন।

রাখাল বলিল, তারকের সাথে একটু দরকারী কথা আছে। আমি চললাম নতুন-মা।

সবিতা বলিলেন,—চা খেয়ে যেও রাজু। সারদা, তুমি যে কচুরী তৈরি করেছো, রাজুকে চায়ের সঙ্গে দিতে ভুলোনা।

সারদা হাসিমুখে বলিল, সে তো উনি খেতে চাইবেননা মা, খেলেও নিন্দেই করবেন।

রাখালের মন আজ ভাল ছিলনা। অন্যসময় হইলে সারদার এই কথা লইয়াই হয়তো তাহাকে ক্ষেপাইবার জন্য অনেক কিছু বলিত। চিত্ত আজ অপ্রসন্ন বলিয়াই বোধহয় বিরসকণ্ঠে বলিল, না, ঘরের তৈরি খাবার খাওয়া আমার অভ্যাস নেই সারদা, ইচ্ছেও নেই। যাঁদের জন্য তৈরি করেছো, তাঁদেরই খাইয়ো।

সারদা বিস্মিত নয়নে রাখালের পানে তাকাইয়া রহিল। তাহার বিবর্ণ মুখের প্রতি দৃষ্টি পড়ামাত্র রাখালের মনের মধ্যে বেদনা ধ্বক্ করিয়া উঠিল, কিন্তু কোনও কথা না কহিয়া ঘর হইতে সে বাহির হইয়া গেল।

সবিতা সারদার পানে তাকাইয়া সস্নেহ সান্ত্বনার সুরে বলিলেন, ওর কথায় মনে দুঃখ পেওনা সারদা। আমার 'পরে রাগ করেই ও তোমাকে কঠিন কথা শুনিয়ে গেল। নানাকারণে রাজুর মনের অবস্থা এখন ভালো নেই মা।

অকারণে আকস্মিক ভর্ৎসিত হইয়া সারদা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। সবিতার সান্ত্বনাবাক্যে রুদ্ধ বেদনা সংযম মানিলনা। হঠাৎ ঝর্ ঝর্ করিয়া দুই চোখ বাহিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

অশ্রুপ্লাবিত সারদা আকুল স্বরে বলিয়া উঠিল,—আমি কী দোষ করেচি মা, দেব্‌তা যখনই যার উপরে রাগ করেন, আমাকেই বিঁধে বিঁধে কঠিন কথা শুনিয়ে চলে যান!

সারদাকে কাছে টানিয়া লইয়া সবিতা বলিলেন, ওযে তোমাকে আপনজন বলেই মনে করে মা। তোমাকে সত্যিকারের স্নেহ করে বলেই না তোমার 'পরেই ওর যত আঘাত! ওর-যে আপন বলতে সংসারে কেউ নেই সারদা।

সারদার উদ্বেলিত অশ্রুধারা তখনও সংযত হয় নাই। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে অভিমানের সুরে বলিল, আমারই যেন সংসারে সব-কেউ আছে মা। আমি তো কই যখন তখন কাউকে এমন করে কথার খোঁচায় বিঁধিনে!—

সবিতা হাসিয়া বলিলেন, সকলের প্রকৃতি তো সমান হয়না মা!

সারদা বলিল, উনি জানেন, আমি সবকিছু সইতে পারি কিন্তু ওঁর ঐ একটা বিদ্রূপ কিছুতেই সহ্য করতে পারিনে! এ জেনে শুনে তবুও উনি আমাকে অমন করে বলেন।

সারদা চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া গেল।

১

রাখাল তারকের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে উপবিষ্ট তারক মোকর্দ্দমার কাগজপত্র দেখিতে অভিনিবিষ্ট। রাখালের জুতার আওয়াজে অল্প মাথা তুলিয়া তাকাইতে গিয়া চকিত হইয়া বিস্মিতকণ্ঠে বলিল, একি! রাখাল যে!

টেবিলের কাছাকাছি একখানি চেয়ারে বসিতে বসিতে রাখাল বলিল, কেন, আসতে নেই নাকি ?

—থাকবেনা কেন, আসোনা বলেই তো আসায় আশ্চর্য্য হচ্চি।

—আসি তো প্রায়ই।

—তা' জানি। কিন্তু সে তো আমার কাছে নয়। অন্দর মহলে।

রাখাল হাসিয়া বলিল, অন্দরেই ডাক পড়ে, তাই সেখানে আসি।

তারক রহস্যতরল কণ্ঠে কহিল, আজ কি সদর থেকে ডাক পেয়েছো নাকি ?

—না, আজ সদরকে আমারই প্রয়োজন।

—নিশ্চয় কোনও মামলার ব্যাপার নয় আশাকরি।

—মামলাই বটে। দুনিয়ায় কোন্ ব্যাপারটা মামলার অন্তর্গত নয় বলতে পারো ?

তারক হাসিতে লাগিল।

রাখাল বলিল, শুনলাম, বেশ ভালো রকম প্র্যাক্‌টিস্ হচ্চে তোমার।

মৃদু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তারক বলিল,—তোমাকে কে বললে ?

—যেই বলুক, কথাটা তো সত্যিই। এবার [illegible] জনেদের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণের ব্যবস্থা করো একদিন।

তারক বলিল, পাগল হয়েচো তুমি। কোথায় প্র্যাক্‌টিস্ ? এখন তো শুধু সিনিয়রের দরজায় ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকা, আর তাঁর যত কিছু খাটুনির বোঝা গাধার মতন বওয়া।"

রাখাল বলিল, তাই নাকি ?—তা'হলে বিমলবাবু ভুল বলেচেন বোধহয়।

তারক চকিত হইয়া বলিল, বিমলবাবু তোমাকে একথা বলেচেন নাকি ?

—হ্যাঁ।

—তাঁর সঙ্গে কবে দেখা হোলো? কি বলেছেন বলত? তারকের কণ্ঠস্বরে আগ্রহ ফুটিয়া উঠিল।

রাখাল হাসিয়া বলিল, সে অনেক কথা। তুমি এখন ব্যস্ত রয়েছো। শোনবার সময় হবে কি?

—হবে—হবে। তুমি বলো।

তারকের চোখে-মুখে ব্যগ্র কৌতূহল লক্ষ্য করিয়া রাখাল মনে মনে হাসিলেও মুখে নির্ব্বিকার ভাব বজায় রাখিয়া বলিল,—চলো সামনের পার্কে বসে কথা কইগে।

তারক বলিল, বেশ, তাই চলো।

ব্রীফের তাড়া ক্ষিপ্র হস্তে গুছাইয়া ফিতা বাঁধিতে বাঁধিতে তারক বলিল, —বোসো, বাড়ীর ভিতর গিয়ে একটু চায়ের ব্যবস্থা করে আসি। চা খেয়ে একেবারেই বেরুনো যাবে।

রাখাল বলিল, আমি যে এইমাত্র বাড়ীর ভিতরে বলে এসেছি, চা খাবোনা।

তারক সংক্ষেপে বলিল, তাহোক্। চায়ের ব্যাপারে 'না' কে 'হাঁ' করলে দোষ নেই।

তারক দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলে রাখাল দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিল।

গায়ে মুগার পাঞ্জাবী পায়ে গ্রিসিয়ান্ শ্লিপার চড়াইয়া তারক ফিরিয়া আসিল। তার পিছু পিছু ঝি ট্রে'তে করিয়া চা এবং দুই প্লেট্ কচুরী লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। রাখাল বিনা বাক্যব্যয়ে চায়ের পেয়ালা ও কচুরীর প্লেট্ তুলিয়া লইয়া সদ্ব্যবহার সুরু করিয়া দিল। অল্প সময়েরই মধ্যে প্লেট্ শূন্য করিয়া বলিল, তারক, তোমাদের চা-দায়িনীকে একবার স্মরণ করতে পারো?

তারক চায়ে চুমুক দিতে দিতে দিতে হাঁকিল,—শিবুর মা,—এদিকে শুনে যাও,—

ঝি আসিলে রাখাল বলিল, বাড়ীর ভিতরে গিয়ে বলো, রাজুবাবু আরও খানকয়েক কচুরী খেতে চাইছেন।

ঝি চলিয়া গেল। তারক খাইতে খাইতে হাসিয়া বলিল, রাজুবাবু খানকয়েক কচুরী খেতে চাইছেন শুনলে এখনি এক ঝুড়ি কচুরী এসে পড়বে কিন্তু বাড়ীর ভিতর থেকে।

রাখাল দ্বিতীয় পেয়ালা চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলিল, আর তারকবাবু খেতে চেয়েছেন শুনলে একগাড়ী কচুরী আসবে বোধ হয়?

—কচুরীর 'ক'ও আসবে না! শুধু সংবাদ আসবে, ফুরিয়ে গেছে। বাজার থেকে গরম কচুরী এখুনি কিনে আনিয়ে দেওয়া হচ্চে। একটু অপেক্ষা করতে হবে।

রাখাল হাসিয়া ভ্রূকুটি করিল। বলিল,—তাই নাকি?

তারক বলিল—একটুও বাড়িয়ে বলিনি।

আধঘোমটা টানা প্রৌঢ়া দাসী শিবুর মা অহেতুক অতি-সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া এক প্লেট্ গরম কচুরী আনিয়া রাখালের সামনে ধরিয়া দিল। তারক হাসিয়া বলিল, দেখলে তো? একেবারে ডজন হিসেবে এসে গেছে।

রাখাল মৃদু হাসিয়া শিবুর মাকে উদ্দেশে করিয়া বলিল, আমি তো রাক্ষস নই বাছা। এতগুলো কচুরী এনেছ কেন?—তা' এনেছো যখন, খাচ্চি সবগুলিই। কিন্তু, কচুরি তুমি বাপু ভালো তৈরি করতে পারোনি, বুঝলে? যা' ঝাল দিয়েছ'—পেটের ভিতর পর্য্যন্ত জ্বালা করছে। একটু ঝালটা কম দিলেই ভালো করতে—

শিবুর মা অবগুণ্ঠনটি আরও খানিক টানিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া অস্ফুট কণ্ঠে কহিল,—কচুরী ত' আমি তৈরি করিনি। দিদিমণি করেছেন।

—ও! তাই কচুরীতে এত ঝাল!

তারককে লইয়া রাখাল যখন পার্কে গিয়া বসিল, অপরাহ্ণ হইয়াছে।

তারক বলিল, বহুদিন বাদে তোমার সঙ্গে পার্কে বেড়াতে আসা হল আজ।

প্রত্যুত্তরে রাখাল একটু শুষ্ক হাসিল। তারক তাহা লক্ষ্য করিয়া মনে মনে ঈষৎ অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিলেও বাহিরে সহজভাব বজায় রাখিয়া বলিল,—হ্যাঁ, কি বলবে বলছিলে? বিমলবাবুর কাছে তুমি কি শুনেছ আমার সম্বন্ধে?—

রাখাল বলিল, শুনেচি, তুমি খুব ভালো কাজকর্ম্ম করছো। তোমার ভবিষ্যৎ অতিশয় উজ্জ্বল। তোমার মত উদ্যোগী ও পরিশ্রমী যুবার জীবনে উন্নতি অনিবার্য্য।

রাখালের কণ্ঠে বিদ্রূপের সুর না থাকিলেও তাহার বলিবার ভঙ্গীতে তারক উহাকে উপহাস বলিয়াই মনে করিল। ভিতরে ভিতরে জ্বলিয়া গেলেও বাহিরে শান্তভাবেই বলিল, তোমাকে ডেকে বিমলবাবুর হঠাৎ এসব কথা বলার মানে কি?

—তা' কী করে জানবো!

তারক গম্ভীর হইয়া পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, তোমার আর কিছু বলবার আছে কি?

রাখাল বলিল, আছে।

—সেটা বলে ফেলো। বিকাল বেলায় নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে পার্কে হাওয়া খাওয়ার উপযুক্ত বড়মানুষ আমি নই। দেখেইচ ত তুমি, কাজ ফেলে রেখে উঠে এসেচি।

তারকের উষ্মায় রাখাল হাসিল। বলিল, ওকালতী পেশা যাদের,

তাদের অতো অধৈর্য্য হতে নেই হে। একটু থামিয়া পুনরায় বলিল,—একটা গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্যই তোমায় এখানে ডেকে আনলাম তারক!

তারক নির্ব্বাক রহিল।

রাখাল গম্ভীর মুখে বলিল, তোমার বিবাহের প্রস্তাব এনেচি।

রাখালের মুখের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া তারক বলিল,—পরিহাস করচো?

—পরিহাস করবার জন্য তোমার কাজের ক্ষতি করে এখানে ডেকে আনিনি। সত্যিই আমি তোমার বিবাহের প্রসঙ্গ তুলতে এসেচি।

—তা'হলে ওটা আর না তুলে এইখানেই সাঙ্গ করে ফেলা ভালো। কারণ, বিবাহ করার মত সঙ্গতি ও সুমতি কোনোটাই আমার হয়নি। দেরী আছে।

রাখাল বলিল, ধরো এ' বিবাহে যদি তোমার সঙ্গতির অভাব পূর্ণ হয়ে যায়!

—তা'হলেও নয়। কারণ, আমি নিজে উপার্জ্জনশীল না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহের দায়িত্ব নিতে নারাজ।

—ধরো এ-বিবাহ দ্বারা যদি তোমার উপার্জ্জনের দিক দিয়েও সত্বর উন্নতি ঘটে? তা'হলে তো আপত্তি নেই?

তারক সন্দিগ্ধ নয়নে রাখালের মুখের পানে চাহিয়া বলিল,—পাত্রীটি কে? কোনও উকীল-ব্যারিষ্টারের মেয়ে বুঝি?

—না। নিতান্ত সঙ্গতিহীন নিরাশ্রয়ের কন্যা।

—তবে যে বললে—এ বিবাহে—

—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছি। দরিদ্রের কন্যা বিবাহ করেও, সম্পত্তিলাভ

একেবারে বিচিত্র নয়। ধরো, তার কোনো ধনী আত্মীয়ের যাবতীয় সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী সে—

—কে সে মেয়েটি ?

—তুমি রাজী কিনা আগে বলো।

—পরিচয় না জেনে বলতে পারবনা।

—কি পরিচয় চাও, জিজ্ঞাসা করো। মেয়ের বংশপরিচয়, রূপ, গুণ, শিক্ষা ?—

তারক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, ভাবীপত্নী সম্বন্ধে সবই জানা দরকার।

রাখাল অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—পাত্রী সুন্দরী বললে অল্প বলা হবে, পরমাসুন্দরী। গুণবতী বুদ্ধিমতী, সুশিক্ষিতা। উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছে। পিতা এককালে ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন বটে, বর্ত্তমানে কপর্দ্দকশূন্য। পিতৃ সম্পত্তি না পেলেও পাত্রী মাতৃধনের অধিকারিণী। সে ধনের পরিমাণও নিতান্ত সামান্য নয়। কুলে মেলে বর্ণে গোত্রে তোমাদেরই পাল্‌টি ঘর। সকল দিক দিয়ে যে কোনও সুপাত্রের যোগ্য পাত্রী।

—পাত্রীর পিতার নাম, ধাম ও উপস্থিত পেশা কি জানতে পারি ?

—তারই উপরে কি তোমার মতামত নির্ভর করছে ?

—না,—হ্যাঁ, তা সম্পূর্ণ না হোক, কতকটা নির্ভর করে বৈকি !—

রাখাল আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, পরে আস্তে আস্তে বলিল, পাত্রীর পিতা তোমার অচেনা নয়। আমি ব্রজবিহারীবাবুর মেয়ের কথা বলছি—

তারক চমকাইয়া উঠিল। বলিল, সে কী ? তুমি কোন্ মেয়েটির কথা বলছো ?

—রেণুর।

—তুমি কি উন্মাদ হয়েছো রাখাল? তারকের কণ্ঠে তীব্র বিস্ময় ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

রাখাল তারকের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—উন্মাদ হলে তো ভালো হোতো। কিন্তু হ'তে পারছি কই?

উত্তেজিত কণ্ঠে তারক বলিল, হ'তে আর বাকীই বা কি?—নইলে নতুন-মার মেয়ে রেণুর সঙ্গে কখনো আমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসতে পারো?—

রাখাল বলিল, তা, এতে তোমার এত বিস্মিত বা উত্তেজিত হওয়ার কী আছে?

—যথেষ্ট আছে! এ' নিশ্চয় তোমার ষড়যন্ত্র!—তুমি নতুন-মাকেও বোধ হয় এই পরামর্শ দিয়েচো।

রাখাল নির্লিপ্তভাবেই বলিল, না। আমার পরামর্শের অপেক্ষা রাখেননি। ওঁরা বহুপূর্ব্ব থেকেই রেণুর জন্য তোমাকে পাত্র নির্ব্বাচন করে রেখেছেন। আমি জানতামনা এ খবর।

তারক দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, হতেই পারে না।—মিথ্যে কথা।

রাখাল স্থির স্বরে বলিল, দেখ তারক, তুমি বেশ জানো, আমি মিছে কথা বলিনে।

তারকের চড়া গলা এবার নিম্নগ্রামে নামিয়া আসিল। বলিল,—তুমিই কেন রেণুকে বিবাহ করো না।

রাখাল উত্তর দিল, আমি যোগ্যপাত্র নই। রেণুর অভিভাবকেরা একথা জানেন।

তারক সবিদ্রূপকণ্ঠে বলিল—আর হতভাগ্য আমিই বুঝি হলাম সবরকমে তাঁদের কন্যার সুযোগ্যপাত্র?

—তুমি পাশকরা বিদ্বান ছেলে। বুদ্ধিমান, স্বাস্থ্যবান, চরিত্রবান।

—হ্যাঁ, অনেকগুলি বাণ তো ছুঁড়ে মারলে, কিন্তু এটা কি বিবেচনায় এলোনা যে, ঐ মেয়েকে আমি আমার পিতৃবংশের কুলবধূরূপে গ্রহণ করতে পারিনে। গরীব হতে পারি, কিন্তু মর্য্যাদাহীন এখনো হইনি।

রাখাল ক্রোধস্তম্ভিত কণ্ঠে হাঁকিল—তারক,—

—সত্য বলতে ভয় করবো কিসের জন্যে? তুমি নিজে কি ঐ মেয়েকে বিয়ে করে আনতে পারো?

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তারকের পানে তাকাইয়া রাখাল বলিল,—সেই মেয়েরই মায়ের আশ্রয়ে থেকে, তাঁরই সাহায্য নিয়ে, নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে বুঝি তোমার বংশমর্য্যাদা ও কৌলিন্যের গৌরব উজ্জ্বল হ'য়ে উঠছে?—তারক, নিজের মনুষ্যত্বকে দলিত করে যদি উন্নতির রাস্তা তৈরি করো, সে উন্নতি তোমাকে অবনতির অতলেই ঠেলে নিয়ে যাবে জেনো।

তারক ক্ষিপ্তের মত লাফাইয়া উঠিল। বলিল,—শাট্ আপ। মুখ সামলে কথা কও রাখাল। তুমি জানো কি এদের প্রত্যেকটি পয়সা আমি হিসেব করে শোধ করে দেবো? এই সর্ত্তেই আমি কর্জ্জরূপে এ সাহায্য গ্রহণ করেচি ওঁদের কাছে।

রাখাল হাসিয়া উঠিল। বলিল, ওঃ, তাই নাকি? তবে আর কি? কর্জ্জ শোধ যখন করে দেবে, তখন ওঁদের সঙ্গে তোমার কৃতজ্ঞতার সম্পর্ক আর কী থাকতে পারে। কি বল? নাহয় কিছু সুদ ধরে দিলেই হবে।

তারক রুক্ষ গলায় বলিল, দেখো রাখাল, এসব বিষয় নিয়ে বিদ্রূপ কোরনা। নিজে যা' পারোনা, অন্যকে তা করবার জন্য বলতে তোমার লজ্জা করেনা?

সে কথার জবাব না দিয়া রাখাল বলিল, তোমার সম্বন্ধে তাহলে দেখছি ভুল করিনি। আমি জানতাম তুমি এই রকমই কিছু বলবে।

তবু, যখন শুনলাম, নতুন-মা নাকি তোমাকে এ সম্বন্ধে আগেই একটু জানিয়ে রেখেছেন, তখন আশা করেছিলাম, হয়তো বা তোমার অমত না-ও হতে পারে!

তারক দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, নতুন-মা কোনও দিন এমন কথা আমাকে বলেননি, বলতে সাহসও করবেননা জেনো। তিনি জানেন, তারক রাখাল নয়। এ-প্রস্তাব রাখালের কাছে করতে পারেন, কিন্তু তারকের কাছে নয়।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তারক দ্রুতপদে হন্ হন্ করিয়া পার্ক হইতে বাহির হইয়া গেল।

২৫

বৎসর ঘুরিয়া নূতন বৎসর আসিয়াছিল ; তাহাও আবার শেষ হইতে চলিল। সংসারের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে অনেক।

বিমলবাবু শেষবার সিঙ্গাপুরে গিয়া প্রায় দেড় বৎসর আর কলিকাতায় ফিরেন নাই। এই বছর-দুইয়ের মধ্যে রাখালকে প্রায় বার সাতেক ছুটিতে হইয়াছে বৃন্দাবনে। ইহাতে তাহার নিজের কাজ-কর্ম্মের ক্ষতি হইয়াছে যথেষ্ট। দিনের দিন সে ঋণজালে জড়াইয়া পড়িতেছে ; অথচ উপায় কিছু নাই।

রেণুদের আর্থিক সাহায্য করিবার জন্য সবিতা নানা উপায়ে বহু চেষ্টাই করিয়াছিলেন, সক্ষম হন নাই। প্রায় সওয়া লক্ষ টাকা মূল্যের যে-সম্পত্তি মাত্র একষট্টি হাজার টাকায় রমণীবাবুর সাহায্যে তিনি নিজের নামে খরিদ করিয়াছিলেন, তাহা রেণুরই উদ্দেশে। ঐ সম্পত্তি খরিদকালে, নয় হাজার টাকা রমণীবাবুর নিকট হইতে সবিতা গ্রহণ করিয়াছিলেন এই সর্ত্তে যে, সম্পত্তিরই আয় হইতে উক্ত টাকা পরিশোধ করা হইবে। উচ্চহারের সুদ সমেত নয় হাজার টাকা রমণীবাবুকে, সম্পত্তির আয় হইতে একযোগে পরিশোধ করাও হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যাহার জন্য এত আয়োজন, সে-ই যখন সম্পত্তি স্পর্শ করিলনা এবং ভবিষ্যতেও কোনদিন যে স্পর্শ করিবে এরূপ আশাও রহিলনা, তখন সবিতা একেবারেই ভাঙিয়া পড়িলেন। তিনি নিজের সমস্ত অলঙ্কার, ব্রজবাবুর শিল্-মোহর করা সেই গহনার বাক্স সমেত ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়াছেন রেণুরই নামে। কিন্তু, আকাশ-কুসুম রচনার মত সমস্তই যে তাঁহার বৃথা হইতে চলিয়াছে !

মনে কল্পনা করিয়াছিলেন, উচ্চশিক্ষিত, চরিত্রবান্, স্বাস্থ্যসবল যুবকের হস্তে কন্যা অর্পণের ব্যবস্থা করিয়া, আপনার সমস্ত অর্থ-সম্পদ্ যৌতুক দান করিবেন। সে অর্থ তো রেণুরই পিতৃধন। তাহারই পিতৃ-প্রদত্ত ও মাতামহপ্রদত্ত যে বহুমূল্য অলঙ্কার রাশি, দীর্ঘকাল ধরিয়া বাক্সেই আবদ্ধ রহিল, কোনওদিন সবিতার অঙ্গে উঠিলনা,—এতদিন আশা ছিল, তাহা বুঝি সার্থক হইবে নবোঢ়া রেণুকে অলঙ্কৃত করিয়া। বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাঁহার প্রাণাধিকা রেণু, পরিপূর্ণ দাম্পত্য সৌভাগ্যে সুখী হইয়া স্বচ্ছলতার মধ্যে পরিতৃপ্ত জীবন যাপন করিবে। দূর হইতে তাহা দেখিয়া তাঁহার অভিশপ্ত মাতৃজীবন চরিতার্থ হইবে। কিন্তু ভাগ্য যার মন্দ, সকল ব্যবস্থাই বুঝি এমনি করিয়াই তার ব্যর্থ হয়!

এতদিনে সবিতা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিয়াছেন, স্বামী ও কন্যার জীবনে তাঁহার তিলমাত্রও স্থান নাই। না অন্তরে, না বাহিরে।

আজ, যৌবনের অস্তাচলে, দেহকামনা-বিরহিত প্রেম আপনি আসিয়া উপনীত হইয়াছে দুয়ারে। সবিতা জানে ইহার মূল্য, জানে ইহা কত দুর্লভ। ইহাকে উপযুক্ত সম্মান ও সমাদরের সহিত গ্রহণ করিবার মনোবৃত্তি বুঝি আজ আর নাই। আজ তাঁহার সমস্ত হৃদয়-মন মাতৃত্বের মমতারসে সিক্ত হইয়া সন্তান পালনের আনন্দ তৃষায় তৃষিত হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু···কোথায় সে স্নেহপাত্র?

অতিরিক্ত মানসিক উদ্বেগ ও বিক্ষোভে সবিতার স্বাস্থ্যে ইদানীং ভাঙন ধরিয়াছিল। তাহার উপর দেহের প্রতি ঔদাসীন্য ও অযত্নেরও অন্ত নাই।

সারদা প্রায়ই অনুযোগ করিত। কিন্তু তাহার নিজের হাতে প্রতিকারের উপায় নাই। তারক কিছু বলেনা। তাহার প্র্যাক্টিস্

উত্তরোত্তর জমিয়া উঠিতেছে, আপন উন্নতির একান্ত চেষ্টা লইয়াই সে অহোরাত্র নিমগ্ন।

বিকালবেলায় সবিতা ভাঁড়ার ঘরে কুট্‌নো কুটিতে বসিয়া একখানি ডাকের চিঠি খুলিয়া নীরবে পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার মুখে বিস্ময় ও বেদনা বিমিশ্র সকরুণ হাসির রেখা। বিমলবাবু সিঙ্গাপুর হইতে লিখিয়াছেন,—

সবিতা, সারদা-মায়ের সংক্ষিপ্ত পত্রে জানিলাম, তোমার স্বাস্থ্য খুবই খারাপ হইয়াছে। অথচ এ সম্বন্ধে তুমি নাকি সম্পূর্ণ উদাসীন। সারদা-মা জানাইয়াছেন, সময় থাকিতে সাবধান না হইলে সত্বর কঠিন ব্যাধিতে তোমার শয্যাশায়িনী হওয়ার সম্ভাবনা।

তুমি তো জানো, ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া, অকর্ম্মণ্য জীবন বহন করার দুঃখ, মৃত্যুরও অধিক। আমার আশঙ্কা হইতেছে, এভাবে চলিলে তুমি হয়তো সেই অতি দুঃখময় জীবন বহন করিতে বাধ্য হইবে।

কাহারও ইচ্ছার উপরে হস্তক্ষেপ করা আমার প্রকৃতি নয়। তোমার ইচ্ছার উপর তাই আমি নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হই। হিতার্থী বন্ধুহিসাবে তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি,—অতিরিক্ত মানসিক সংঘাতে তুমি এতদূর বিচলিত হইয়াছ যে, জীবিত মনুষ্যের পক্ষে স্বাস্থ্য যে কত বেশি প্রয়োজনীয়, তাহাও বিস্মৃত হইয়াছ। অন্তর্গূঢ় মর্ম্মবেদনায় আত্মসংবিৎ হারাইয়া দেহের উপর অযথা অবজ্ঞা করা ঠিক নয়। এ ভুলও ভবিষ্যতে একদিন মানুষ আপনিই বুঝিতে পারে। কিন্তু তখন হয়তো এত বিলম্ব হইয়া যায় যে, প্রতিকারের উপায় থাকেনা। তাই আমার অনুরোধ, শরীরের অযত্ন করিওনা।

সর্ব্বশেষে লিখিয়াছেন,—"তারকের বিবাহের কথা সম্ভবতঃ সে তোমাকে জানাইয়া থাকিবে। এ বিবাহে তোমার মতামত কি

জানিতে ইচ্ছা করি। আমার সম্মতি এবং আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া সে পত্র লিখিয়াছে। পাত্রীটি তারকের সিনিয়র্ উকীল শিবশঙ্কর বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রী। এই বিবাহ তাহার প্র্যাকৃটিসের উন্নতির অনুকূল হইবে সন্দেহ নাই।" ইত্যাদি।

সবিতা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পত্রখানি খামের মধ্যে ভরিয়া রাখিয়া, কুটনা কুটিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অন্তর অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

বৈকালে সারদা মহিলা-শিক্ষা-মণ্ডলীর স্কুল হইতে বাটী ফিরিলে সবিতা বলিলেন, একটা সুখবর শুনেচ সারদা?

আগ্রহে উন্মুখ হইয়া সারদা জিজ্ঞাসা করিল, কী সুখবর মা?

—আমাদের তারকের বিয়ে।

—উৎসুক হইয়া সারদা কহিল, কবে মা? কোথায়? কনেটি কেমন দেখতে?

—তা'তো কিছু জানিনে মা। শুনলাম হাইকোর্টের মস্ত উকীল শিবশঙ্করবাবু,—যাঁর জুনিয়র হয়ে তারক কাজ শিখচে, পাত্রী তাঁরই ভাইঝি।

—সে কি? আপনি এর কিছু জানেন না? তবে জানে কে মা?

সারদার কণ্ঠে বিস্ময় ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

সবিতা হাসিয়া বলিলেন, সময় হলেই সকলে জানতে পারবে সারদা। আমি সিঙ্গাপুর থেকে খবর পেলাম, তারকের বিয়ে।

সারদা মুখ অন্ধকার করিয়া বলিল, উঃ কি অদ্ভুত মানুষ এই তারকবাবু।

সবিতা স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন, ও আমার একটু লাজুক ছেলে। তুমি দোষ নিওনা সারদা। বরং উদ্যোগে লাগো এখন থেকে।

সারদা নিরুত্তরে মুখ হাঁড়ি করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।...

বছর দেড়েক হইল সারদাকে একটি নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্কুলে সবিতা ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছেন। সেখানে সে লেখাপড়া, নানাবিধ অর্থকরী গৃহশিল্প, শিশুপালন ও শুশ্রূষা বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে কাজ শিখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। এক একটি বিষয় শিখিবার নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসর বা কয়েক মাস করিয়া সময় আছে। বর্ত্তমানে লেখাপড়া ও দর্জ্জিকর্ম্ম বিভাগে সারদার দ্বিতীয়বর্ষ চলিতেছে। বেলা নয়টার সময় স্কুলের গাড়ী আসে, ফেরে বেলা পাঁচটায়। অপরাহ্নে সবিতা তাহার খাবার লইয়া বসিয়া থাকেন। সারদা ফিরিলে দ্রুত তাড়া দিয়া তাহাকে কাপড় বদলাইয়া, হাত-মুখ ধোওয়াইয়া, নিজ হাতে খাবার পরিবেশন করিয়া তবে তাঁহার স্বস্তি। তারকের সম্বন্ধেও তাহাই। কোর্ট হইতে ফিরিবার পূর্ব্বে তাহার বিশ্রামের ও জলযোগের ব্যবস্থা নিজহাতে করিতে না পারিলে সবিতা তৃপ্তি পাননা।

তারক প্রতিবাদ করে, অনুযোগ করে, কিন্তু সবিতা কর্ণপাত করেননা। সারদা বলে, মা, আপনার সেবার ভার নিতে আপনার কাছে এলাম, কিন্তু আপনিই যে শেষে আমার সেবা হাতে তুলে নিলেন। আমি সত্যিই এ সইতে পারিনে। আপনার ঘাড়ে পরিশ্রমের ভার চাপিয়ে স্কুলে যেতে আমার বাধে।

সবিতা হাসিয়া বলেন, মা, এই কাজেই আমার বেশি তৃপ্তি। স্কুল তোমার কোনও মতেই ছাড়া হবেনা, আমি বেঁচে থাকতে! জীবনে তোমার অবলম্বন তো চাই। শিক্ষা না পেলে আত্ম-নির্ভরতার শক্তি পাবে কোথা থেকে? একদিন হয়তো তোমাকে একলা বেঁচে থাকতে হবে এই পৃথিবীতে। নিজের পায়ে ভর্ দিয়ে দাঁড়াতে না শিখলে, দুঃখের অবধি থাকেনা মেয়েদের, এতো তোমার অজানা নেই সারদা।

সেইদিন রাত্রে তারক খাইতে বসিলে, সবিতা নিত্যকার মত খাওয়ার তদারক করিতে সামনে বসিয়াছিলেন। সবিতা এক সময় বলিলেন, তারক, তুমি নাকি বিয়ে করছ বাবা ?

তারক চমকিত হইয়া প্রশ্ন করিল,—কার কাছে শুনলেন ?

সবিতা শান্ত হাসিয়া বলিলেন, সিঙ্গাপুরের চিঠি এসেছে আজ।

সারদা মিষ্টান্ন পরিবেশন করিতেছিল। কহিল, আমাদের বাড়ীর বিয়ের খবর আমাদেরই কাছে পৌছায় তারকবাবু, সমুদ্র পারের ডাক মারফৎ।

সারদার বিদ্রূপে হাড়ে হাড়ে চটিয়া উঠিলেও তারক তাহা প্রকাশ করিতে পারিলনা। সবিতার পানে তাকাইয়া কৈফিয়তের সুরে কহিল, আমার সিনিয়র উকীল শিবশঙ্কর বাবু পীড়াপীড়ি করে ধরেছেন তাঁর ভাইঝিকে বিয়ে করার জন্য। আমি এখনও মতামত জানাইনি। এ বিয়ে হবে কি হবেনা তার কিছুই ঠিক নেই। কাউকেই এখনো বলিনি। কেবলমাত্র বিমলবাবুকে লিখেছিলাম, পরামর্শ চেয়ে।

সবিতা বলিলেন, এ সম্বন্ধ তো তোমার পক্ষে ভাল বলেই মনে হচ্ছে বাবা। তুমি আত্মীয় বন্ধুহীন, এ রকম মুরুব্বি শ্বশুর পাওয়া ভাগ্যের কথা। পাত্রী যদি তোমার অপছন্দ না হয়, শুভকর্ম্মে দেরী না করাই ভালো।

তারক সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, কিন্তু এ বিয়েতে নানা বাধা আছে মা। আমি মনে করছি, শিববাবুকে জবাব দেবো, এ বিয়ে সম্ভব হবেনা।

সবিতা বলিলেন, বাধা কিসের? আমাকে জানাতে কি তোমার সঙ্কোচ আছে বাবা ?

তারক ব্যস্ত হইয়া কহিল, না না, আপনার কাছে বলতে আবার বাধা কি ? আপনি আমার মা। আমি জানাব-জানাব ভাবছিলাম, আজই আপনাকে নিজেই এ সকল কথা বলতাম।

সারদার মুখে অবিশ্বাসের হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিল, মা, আমি তা'হলে এখন উপরে চললাম।

সারদা চলিয়া গেল।

তারক কণ্ঠস্বর নিচু করিয়া বলিল, আমার সঙ্গে শিবশঙ্কর বাবু তাঁর ভাইঝির বিবাহ দিতে খুব ইচ্ছুক হয়েচেন। কিন্তু তাঁর কয়েকটি সর্ত্ত আছে। সেই সর্ত্তে আমি এখনও সম্মতি দিতে পারিনি। যদিও শিব শঙ্করবাবুর সাহায্যেই আমি এই অল্প দিনের মধ্যেই 'বারে' এতটা নাম করতে পেরেছি এবং তিনি সহায় থাকলে আমি যে খুব শীঘ্রই উন্নতির মুখে এগিয়ে যেতে পারব, এও ঠিক, কিন্তু—

তারক কথা অসমাপ্ত রাখিয়া চুপ করিল।

সবিতা তারকের পানে জিজ্ঞাসু নয়নে তাকাইয়া রহিলেন।

অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তারক আস্তে আস্তে বলিল,—শিববাবুর প্রধান ও প্রথম সর্ত্ত, বিবাহের পর কিছু দিন, অন্ততঃ বছরখানেক আমাকে তাঁর কাছে গিয়ে থাকতে হবে।

—কেন ?

—তাঁর ভাইঝিটি পিতৃহীনা। শিববাবুর নিজের মেয়ে নেই, কাজেই—

—বুঝেচি, ভাইঝিটিকেই নিজের মেয়ের মত মানুষ করেছেন। কাছ ছাড়া করতে চান না বোধ হয়—

—হ্যাঁ। নিজের মেয়ের অধিক ভালবাসেন তাকে, তাই বলছিলেন—তুমি আমার বাড়ীতে এসে যদি থাক, তোমার কাজকর্ম্মের অনেক সুবিধা হবে। পরে তোমার পৃথক্ সংসার পেতে দেওয়ার দায়িত্ব আমার রইলো।

সবিতা বলিলেন, এতে তোমার অসুবিধার কী আছে ?

তারক আমতা আমতা করিয়া ঢোঁক গিলিয়া বলিল, অসুবিধা ঠিক

আমার নিজের নেই বটে বরং সর্ব্বদা তাঁর কাছে থেকে কাজকর্ম্ম শেখা ও পৃথক্ কেস্ পাওয়ার দিক দিয়ে সুবিধাই হবে বলে মনে হয় ; কিন্তু, আমি যাই কি ক্যর মা ? ধরুন, আপনার দেখাশোনা—

সবিতা হাসিয়া বলিলেন, ওঃ, এইজন্য। আমার সম্বন্ধে তুমি কিছু ভেবোনা তারক। আমি ত আজই সকালে ভাবছিলাম,—কিছুদিন বাইরে কোথাও গেলে হয়। জীবনে এ পর্য্যন্ত তীর্থ ভ্রমণ ঘটেনি। ভাবচি এবার তীর্থে বেরুব।

—একলা যাবেন ?

—আমি যদি যাই, সারদাকেও সঙ্গে নেব, কিংবা ওদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বোর্ডিংএ ওকে রেখে যাবো।

তারক অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, ফিরবেন কতদিনে ?

সবিতা ম্লান হাসিয়া বলিলেন,—হয়তো কলকাতায় আর নাও ফিরতে পারি। যদি ও-অঞ্চলে কোনও দেশ ভালো লাগে, সেইখানেই একখানি ছোট খাটো বাড়ী কিনে বাস করবো ভেবেচি।

তারক চুপ করিয়া রহিল।

সবিতা বলিলেন, ওদের পাকা কথা দিয়ে দিও।

তারকের খাওয়া শেষ হইয়াছিল। আসন হইতে উঠিতে উঠিতে বলিল, ভেবে দেখি।

সেইদিন রাত্রে সবিতা শয়ন করিলে সারদা যখন তাঁহার মশারীর ধার গুলি বিছানার তলায় গুঁজিয়া দিতেছিল, সবিতা বলিলেন, সারদা তোমাদের স্কুলের পরীক্ষা কবে ?

সারদা বলিল, আড়াইমাস পরে।

সবিতা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, আমি কিছুদিন তীর্থভ্রমণে বেরুবো মনে করেছি,—তুমি যাবে আমার সঙ্গে ?

সারদা উৎসাহিত কণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ মা—যাবো। একমাত্র কাশী ছাড়া আমি জীবনে আর কোনও তীর্থে যাইনি। গয়ায় একবার গিয়েছিলাম বটে, সে—খুব ছোট্ট বেলায়, এগারো-বারো বছর বয়সে। স্বামীর পিণ্ড দান করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন বাবা।

কথাটা শুনিয়া সবিতা যথেষ্ট বিস্মিত হইলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না।

সারদা বলিল, কবে আমাদের যাওয়া হবে মা ?

—তারকের বিয়েটা চুকে যাক্। তারপরে কলকাতার বাসা একেবারে তুলে দিয়ে চলে যাব ভাবচি।

সারদা বলিয়া উঠিল, আমাকেও সঙ্গে রাখবেন ত ?

—না, মা, তোমাকে কলকাতায় আবার ফিরতেই হবে।

—কেন মা ? সারদার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

—তুমি যে-প্রয়োজনে শিক্ষা নিচ্ছ সে যে শেষ হয়নি মা। ফিরে এসে বোর্ডিংএ থেকে শিক্ষা সম্পূর্ণ করে তারপরে আমার কাছে গিয়ে থাকবে।

সারদা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া ম্লানকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল, আমার তীর্থভ্রমণে গিয়ে কাজ নেই মা।

সবিতা বলিলেন, কেন ? দেশ দেশান্তরে ঘুরে এলে অনেক কিছুই জানতে পারবে, শিখতে পারবে।

সারদা মাথা নাড়িয়া বলিল,—না মা, যাবোনা। তারা যদি আমায় দেখে ফেলে !

—সবিতা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—সে কি ! সে আবার কারা ?

সারদা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, আমার বাপের বাড়ীর লোকেরা।

সবিতা বুঝিলেন সমস্তই। প্রশ্ন করিলেন না কিছু। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তা' নাই গেলে তীর্থে। এখান থেকেই পড়াশুনা করো।

অকপট ব্যাকুলতায় সারদা বলিয়া উঠিল, আপনার কাছছাড়া হতে আমার একটুও ভরসা হয়না মা! বোর্ডিংএ একলা থাকতে ভয় করবে না তো?

—ভয় কিসের? সেখানে তোমার মতো ক—ত মেয়ে রয়েচে। আমার রাজু কলকাতায় রইলো, তারকও থাকলো, ওদের বলে যাবো তোমার খোঁজ খবর নেবে। যখন যা' দরকার হবে, ওদের জানাতে পারবে।

প্রায়ান্ধকার গৃহে সবিতার শয্যাপার্শ্বে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া সারদা নিঃশব্দে চিন্তা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে অস্ফুট স্বরে ডাকিল—মা,—

—বলো সারদা, আমি জেগেই আছি।

বিছানার ভিতর হইতে সবিতা জবাব দিলেন।

—আমার নিজের কথা সমস্ত আজ বলতে ইচ্ছে হচ্ছে আপনার কাছে।

—আজ অনেক রাত হ'য়ে গেছে মা। তুমি শুয়ে পড়ো গিয়ে।

—যাই।—আমি বিধবা হয়েছিলাম মা এগারোবছর বয়সে। শ্বশুরবাড়ী আর যাইনি। ছোট বেলাতেই মা মারা গিছলেন। বাপ আবার বিয়ে করে—

সবিতা বাধা দিয়া বলিলেন, তোমাকে কিছুই বলতে হবেনা সারদা। আমি সমস্তই জেনেচি।

পরদিন সবিতা বিমলবাবুকে পত্র লিখিতেছিলেন, "বহুদূরে কোথাও চলিয়া যাইবার জন্য আমার মন নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। অনেক চিন্তা

করিয়া শেষ পর্য্যন্ত তীর্থভ্রমণে বাহির হইব স্থির করিয়াছি। এখানে ফিরিবার আর রুচি নাই। অনির্দ্দিষ্ট ঘুরিতে ঘুরিতে যেদেশ ভাল লাগিবে, সেইখানেই বাস করিব মনে করিতেছি। কলিকাতার বাসা আর রাখিবার প্রয়োজন নাই। তারকের ভাবী শ্বশুর তারককে নিজের বাটীতে রাখিতে চাহেন। তাহার আইন-ব্যবসায়ের সকল রকম সাহায্য এবং ভবিষ্যতে সংসার পাতিয়া দিবার দায়িত্ব লইতে তিনি প্রস্তুত। আমি তারককে এ ব্যবস্থায় সম্মত হইতে পরামর্শ দিয়াছি।

সারদার শিক্ষা যতদিন না সমাপ্ত হয়, সে উহাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বোর্ডিং হাউসেই থাকিবে। শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে, সে যদি ইচ্ছা করে, আমার নিকটে গিয়া বাস করিতে পারে।

ব্যবস্থা কিছুই করিতে পারিলামনা আমার রাজুর। জানিতে পারিয়াছি, সে কিছুদিন হইতে ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। অথচ, আমার কিংবা অন্য কাহারও সাহায্য গ্রহণে সে একেবারেই প্রস্তুত নয়। তাহাকে অনুরোধ করিতেও ভরসা পাই না। প্রত্যাখ্যানের দুঃখ আর সর্ব্বত্র বাড়াইয়া লাভ নাই। রাজুকে যে সঙ্গে লইয়া যাইব—তাহারও উপায় নাই, কারণ, তাহাকে প্রায়ই বৃন্দাবনে যাইতে হয়। কখন্ যে বৃন্দাবন হইতে ডাক আসিবে কিছুই ঠিক নাই।

তারকের পক্ষে এসময় কোর্ট কামাই করা যে অসম্ভব, তুমি জানো। সুতরাং পুরাতন দরওয়ান মহাদেব ও শিবুর মা ঝিকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিব স্থির করিয়াছি। কিছুদিন তো ঘুরিয়া বেড়াই, তাহার পর যেখানে হোক্ স্থির হইয়া বসিব।”

কি যেন একটা উপলক্ষে সারদাদের স্কুল সেদিন মধ্যাহ্নেই বন্ধ হইয়া যাওয়ায় সারদা বাড়ী ফিরিয়া আসিল বেলা একটায়। সবিতা তখন

দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছেন। তারক কোর্টে। সারদা একা বাড়ীতে বসিয়া ইতিহাসের পড়া তৈয়ারি করিতে লাগিল।

সদর দরজায় কড়ানাড়ার আওয়াজের সহিত ডাক শোনা গেল—নতুন মা—

বই মুড়িয়া রাখিয়া দ্রুতপদে নামিয়া আসিয়া সারদা দুয়ার খুলিয়া দিল।

রাখাল বলিল,—একি? তোমার স্কুল নেই আজ?

সারদা জবাব দিল,—ছিল। ছুটি হয়ে গেছে।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, কিসের জন্য ছুটি?

সারদা দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল, আপনি আজ এখানে আসবেন বলে।

রাখাল গম্ভীর মুখে বলিল, আচ্ছা, এ সব কথা বলতে, মুখে কি একটুও বাধেনা?

সারদা চপলকণ্ঠে উত্তর দিল—একটুও না।

সারদার পিছে পিছে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে রাখাল বলিল, নতুন-মা কী কর্চ্ছেন? তাঁর সঙ্গে একটু দরকার আছে।

সারদা বলিল, তাহ'লে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

—কেন? তিনি কি বাড়ী নেই!

—না, দক্ষিণেশ্বরে গেছেন। আজ উপোস করে আছেন কিনা!

—কিসের উপোস?

—তা' তো বলেননা কিছু। বলেন ব্রত আছে।

—এত ব্রতই বা আসে কোথা থেকে? পাঁজিগুলো পুড়িয়ে না ফেললে আর রক্ষে নেই দেখছি?

—আমি জানি দেবতা, আজ মায়ের কিসের উপোস।

—কিসের বলো ত?

—আজ তাঁর মেয়ের জন্মতিথি।

—তাই নাকি? তোমাকে নতুন-মা বলেছেন বুঝি?

—পাগল হয়েচেন! সেই মানুষই বটে। অনেকদিন আগে মাকে বলতে শুনেছিলাম মাঘী পঞ্চমী রেণুর জন্মতিথি।

রাখাল হাসিয়া বলিল, সুতরাং এদিনে নতুন-মার উপবাস অনিবার্য্য!

সারদা বলিল, হ্যাঁ। শুধু তাই নয়,—লক্ষ্য করে দেখেচি, এই দিনটিতে মা গরীব দুঃখীদের প্রচুর দান করেন। টাকা পয়সা, নতুন কাপড়, কম্বল, আলোয়ান এসব তো দেনই, তা'ছাড়া পছন্দমই অনেক সুন্দর সুন্দর রঙীন শাড়ী, ডুরে শাড়ী, ব্লাউস্ সেমিজ এই সব কিনে ভিখিরী মেয়েদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। বাড়ী থেকে এ সব কিছু করেননা, অন্য কোথাও গিয়ে দিয়ে আসেন। যেমন কালিঘাট, দক্ষিণেশ্বর কিংবা গঙ্গারঘাট এই রকম কোথাও—

রাখাল কিছু বলিলনা। গম্ভীর মুখে কি যেন চিন্তা করিতে লাগিল।

সারদা বলিল, শুনেচেন কি?—মা যে কল্‌কাতার বাসা উঠিয়ে দিয়ে চিরদিনের জন্য অন্যত্র চলে যাচ্চেন।

রাখাল মুখ তুলিয়া বলিল—কোথায় যাচ্ছেন?

সারদা বলিল, আপাততঃ তীর্থভ্রমণে। তারপর যে-কোনও দেশে হোক্ থাকবেন।

রাখাল প্রশ্ন করিল, কবে যাবেন?

সারদা বলিল, তারকবাবুর বিয়েটা চুকে গেলেই।

রাখাল আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, তারকের বিয়ে নাকি? কোথায়?

সারদা সবিস্তারে তারকের বিবাহ সংবাদ রাখালকে জানাইল।

রাখাল বলিল,—তারক ঘরজামাই থাকতে রাজী হল?

বছর দুই মাত্র!—তারপরে শিববাবু ওঁকে আলাদা একখানি বাড়ী দিয়ে পৃথক সংসার করে দেবেন কথা দিয়েচেন।

রাখাল হাসিয়া বলিল, তা'হলে তারক শুধু এক রাজকন্যাই নয়, অর্দ্ধেক রাজত্ব শুদ্ধ পাচ্ছে বলো?

সারদা পরিহাসের সুরে বলিল—শুনে আপনার নিশ্চয়ই আপ্‌শোস্ হ'চ্ছে—না দেব্‌তা?—

রাখাল সে-পরিহাসের জবাব না দিয়া অন্যমনস্ক চিত্তে কি যেন ভাবিতে লাগিল। সারদা হঠাৎ মিনতির সুরে বলিল, দেব্‌তা, আপনিও কেন বিয়ে করুননা।

রাখাল এবার উচ্চ হাসিয়া বলিল, তারকের সঙ্গে টক্কর দিয়ে বিয়ে করব নাকি?

সারদা বলিল, বাঃ, তা' কেন? চিরকাল কি এমনি একলা মেসে পড়ে থাকবেন? সংসার পাতবার কি সাধ হয়না?

রাখাল বলিল, সাধ থাকলেও সকলেই কি সংসার করতে পারে সারদা?

—কেন পার্ব্বে না? দীন-দুঃখীরাও ত' তাদের নিজের মতন সংসার পেতে নেয়।

—কিন্তু এও তো দেখা যায় সারদা, গরীবদুঃখী হয়তো অভাব অনটনের মধ্যেও সংসার করবার সুযোগ পেলো, কিন্তু মহাধনী প্রাচুর্য্যের মধ্যে থেকেও সে সুযোগ পেলোনা। সকলের ভাগ্যে সব সুখ সাধ পূর্ণ হয়না। ধরোনা, তোমারও তো চেষ্টার ত্রুটি হয়নি কিন্তু তুমিই কি সংসার করতে পাচ্চো?

স্বচ্ছন্দস্বরে সারদা জবাব দিল, আমার কথা ছেড়ে দিন। অতো অল্প বয়সে বিধবা যদি না হতাম, আজ তো আমার মস্ত সংসার হোতো।

তার পরেও তো আবার খোদার উপরে খোদ্‌কারীর দুর্ব্বুদ্ধি নিয়ে নূতন করে সংসার পেতেছিলাম ! সইলনা তা কি করবো ?

রাখাল বলিল, তা'হলেই বোঝো,—ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র !

সারদা রাখালের যুক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া বলিল,—আপনি বিয়ে করার পরে যদি সংসার গড়ে না উঠতো, অথবা সংসার পাতবার মুখে বৌটি যদি মারা যেতো বা অন্য কিছু হোতো—তা'হলে ওকথা মানতাম। আপনি তো আজ পর্য্যন্ত কোনো চেষ্টা করেননি ?—

রাখাল বলিল, চেষ্টা করলেই কি হয় নাকি ? বিয়ে হওয়া-না-হওয়াটাও যে ভাগ্যেরই উপরে নির্ভর করে এটা বুঝি তুমি মানতে চাওনা ? দেখ সারদা, ঐ সব ইতিহাস ভূগোল পড়া, আর গালচে সতরঞ্চীর টানা-পড়েন্ শেখা দিনকতক বন্ধ রেখে তোমার একটু লজিক্ পড়া দরকার।

—কিচ্ছু দরকার নেই। করুন দেখি তর্ক, কেমন না আপনাকে হারিয়ে দিতে পারি, দেখে নিন।

রাখাল হাতজোড় করিয়া বলিল, আমি হার স্বীকার করে নিচ্ছি !—একে স্ত্রীলোক, তায় অল্পবিদ্যা,—এ যে কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার, তা সকলেই জানে। তর্কশাস্ত্র প্রণেতাগণ স্বয়ং এলেও হার মানবেন, আমি তো তুচ্ছ। ওকথা রেখে কাজের কথার জবাব দাও দিকি। নতুন-মা যে কলকাতার বাসা উঠিয়ে দিয়ে তীর্থযাত্রা করছেন, তোমার ব্যবস্থা কি হচ্ছে ?—তুমিও কি নতুন-মার সঙ্গেই যাচ্ছ ?

সারদা হাসিয়া বলিল, ধরুন, যদি তাই যাই,—তাতে খুশী হবেন না অখুশী ?

রাখাল একটু চিন্তা করিয়া বলিল, খুশী না হলেও অখুশী হবারই বা আমার কি অধিকার ?

—অধিকার যদি পান, তা হলে ?

রাখাল হাসিয়া বলিল—ও জিনিষটা অত তুচ্ছ নয়!—অধিকার এমন বস্তু, যা' দানের সাহায্যে এলে, দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। কাজেই মর্য্যাদা হারায়। অধিকার যেখানে আপনি সহজভাবে জন্মায়, সেখানেই তার জোর খাটে!

—সারদা বলিল—তবে আর আমারও অনধিকার চর্চ্চায় কাজ নেই। কিন্তু, মোটের উপরে এটা বেশ বোঝা যাচ্চে যে, আমি মার সঙ্গে বিদেশে গেলে আপনি একটুও খুশী হননা।

—সে শুধু তোমারই ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য সারদা।

রাখালের কণ্ঠের স্বর গাঢ় হইয়া উঠিল! বলিল, এতে আমার নিজের কিছু স্বার্থ আছে মনে কোরোনা।

সারদা উদাস ভাবে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—সংসারে কার যে কোথায় স্বার্থ, কি করে বুঝব বলুন?

রাখাল ব্যাকুল হইয়া বলিল—আমি মিথ্যে বলিনি সারদা—

সারদা এবার হাসিয়া ফেলিল! স্নিগ্ধ মধুর সে হাসি! বলিল, শুনুন, নতুন-মা বলেছেন, যতদিন না পড়াশুনো শেষ হয়, আমাকে স্কুলের বোর্ডিংয়ে রাখবারই ব্যবস্থা করে যাবেন।

রাখাল বলিল,—সেই বেশ সুব্যবস্থা।

সারদার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল! অনুযোগের সুরে বলিল,—কিন্তু আমার যে এ ইস্কুল-ফিস্কুল মোটে ভাল লাগেনা দেব্‌তা।

—কী ভালো লাগে বলো।

সারদা নতমুখে নিরুত্তর রহিল।

রাখাল বলিল, মোটা মোটা বই পড়ে থিওরেটিক্যাল জ্ঞান লাভের চেয়ে প্র্যাক্‌টিক্যাল্ ক্লাসে হাতে কলমে কাজ শেখা তো বেশ ইণ্টারেষ্টিং। ওটা তোমার ভাল লাগা উচিত।

সারদা নতচখেই বলিল,—আমার কিছুই শিখতে ভালো লাগেনা।

রাখাল বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, কী তোমার ভালো লাগে সারদা?

বিষণ্ণ স্বরে সারদা বলিল, সে বলে লাভ নেই। আপনি শুনে হয়তো ঠাট্টা করবেন।

রাখাল বলিল, সারদা, তোমার জীবনের সুখ-দুঃখের কথা নিয়েও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করবো, এতবড় পাষণ্ড আমি নই।

অপ্রতিভ হইয়া সারদা বলিল,—না দেব্‌তা তা' নয়। আমার কী যে ভাল লাগে, আমি নিজেই তা' বুঝতে পারিনা। তবে এইটুকু বলতে পারি, নির্দ্দিষ্ট সময়ে যন্ত্রের মত ইস্কুলে গিয়ে পড়াশোনা, শিল্পকর্ম্ম বা ধাত্রীবিদ্যা শেখার চেয়ে, বাড়ীতে ঘর-সংসারের কাজ করতে আমার অনেক ভালো লাগে। সংসারকে নিখুঁত শৃঙ্খলায় সাজিয়ে গুছিয়ে পরিপাটী রাখতে আমার উৎসাহের অন্ত নেই। এজন্য আমি সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারি। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আমার সবচেয়ে আনন্দের সামগ্রী। দেখেছেন তো, নতুন-মার পুরানো বাড়ীতে থাকতে, ভাড়াটেদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আমার কাছেই থাকত, খেলা করত, ঘুমাত, গল্প শুনত, পড়াশুনা করত।

অল্পক্ষণ থামিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সারদা বলিল,—নিজের হাতে আপন জনেদের সেবা যত্ন করার মধ্যে যে কত তৃপ্তি, কত আনন্দ—তা' মেয়েমানুষ ভিন্ন আর কেউ বুঝবেনা।

রাখাল ব্যথিত হইয়া বলিল, সারদা, তুমি নিজের সংসার বলতে কিছু পাওনি বলেই সংসারের দিকে তোমার এত আকর্ষণ।

সারদা বলিল—হয়তো তাই হবে। সেইজন্যই তো মিনতি করে বলচি দেব্‌তা, আপনি বিয়ে করুন। সংসারী হোন্। আমি আপনার সংসার নিয়ে থাকব। আপনাদের দুজনকে প্রাণ ঢেলে সেবা যত্ন করব। নিজের হাতে এমন সুন্দর করে ঘর-সংসার সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখব, দেখবেন

লোকে সুখ্যাতি করে কিনা। তারপর খোকাখুকুদের মানুষ করার ভার পূরোপূরিই নেব আমার হাতে। এই যে সেলাই বোনা, শিশুপালন এত কষ্ট করে শিখচি, একি সত্যিই হাসপাতালে বা লোকের দোরে দোরে চাকরি করে বেড়াব বলে? তা' মনেও করবেননা।

রাখাল বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া সারদার কথাগুলি শুনিতেছিল।

সারদা বলিতে লাগিল, ইস্কুলের এত কড়া নিয়ম আমার আদপেই বরদাস্ত হয়না। তবুও জোর করে শিখচি কেন জানেন? সংসার করবো বলে। আমি আপনার বিয়ে দেবই। নিজে মেয়ে পছন্দ করব। সংসার পাতবো নিখুঁত করে, মানুষ করবো ছেলেমেয়েদের,—ভগবান না করুন—যদি সংসারে অভাব অনটন ঘটে, তারজন্য কারুর কাছে গিয়ে হাত পাত্‌তে হবেনা, নিজেই সেটুকু পূর্ণ ক'রে নিতে পারবো।

রাখাল বলিল,—তুমি কি এই কল্পনা নিয়েই শিক্ষায় প্রবেশ করেছো সারদা?

রাখালের মুখের পানে তাকাইয়া সারদা বলিল, আপনি থাকতে সত্যিই কি আমি অন্নের জন্য পরের দুয়োরে হাত পেতে চাকরী করতে বেরুবো ভেবেছেন? কেন? কী দুঃখে যাব? বয়ে গেছে আমার—

সারদার কণ্ঠের প্রগাঢ়তায় রাখালের অবিশ্বাস করিবার মত কিছুই রহিলনা।

সারদার মুখের পানে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাইয়া রাখাল ধীরকণ্ঠে বলিল, সারদা, তুমি কি বলতে চাও—সমস্ত জীবনটা তোমার এমনি করে পরের সংসারেই বিলিয়ে দিয়ে যাবে? নিজের সংসার, নিজের স্বামী, নিজের সন্তান না পেলে জীবনে সংসারের সাধ কি সম্পূর্ণ সার্থক হয়?

সারদা মৃদুস্বরে বলিল, এ আমি আপনাকে তর্ক করে বোঝাতে পারবনা দেব্‌তা,—আমি জেনেচি, স্বামী, গৃহস্থালী, সন্তান মেয়েদের জীবনে [illegible] চেয়ে

আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী। যে-মেয়ে সত্যি করে একে ভালোবাসে, সে কখনো এতে এতটুকু কালি লাগতে দিতে পারেনা। কোনও মেয়েই চায়না, তার নিজের সন্তানের কপালে বাপ মায়ের কোনও রকম কলঙ্কের ছাপ থাকুক। যে জন্যই হোক, আর যার দোষেই হোক্, একথা ত' কোনোদিন ভুলতে পারিনে যে, আমার জীবনে অশুচির ছোঁয়া লেগেচে। নিজের স্বামী পুত্রকে খাটো করে নিজে স্ত্রী হবো—মা হবো—এত বড় স্বার্থপর আমি নই। নাই বা পেলাম স্বামী, সন্তান, যাঁকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি, ভক্তি করি, তাঁর সন্তান কি নিজের সন্তানের চেয়ে কম স্নেহের? তাঁর সংসার কি নিজের সংসারের চেয়ে কম আনন্দের?

রাখাল নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল!

অনেকক্ষণ পরে সারদা আস্তে আস্তে বলিল, দেবতা, আমি নির্বোধ নই। আপনি বিয়ে করুন। আপনার বৌকে আমি ভালবাসতে পারব। আমি ঈর্ষাকে ঘৃণা করি। তা'ছাড়া সব চেয়ে বড় কথা কি জানেন?—সে-ই যে আমাকে সব দেবে। আপনার সংসার—আপনার সন্তান—আমার আনন্দের সকল অবলম্বন যে তারই হাত থেকে পাবো!—আমার জীবনের সত্যিকারের সার্থকতা, সে যে তারই দান!

নিরুত্তর রাখাল একই ভাবে চিন্তাচ্ছন্ন হইয়া বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিয়া গেলে রাখাল নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মুখ তুলিয়া অস্ফুট কণ্ঠে বলিল—তোমার অনুরোধ আজ সত্যিই আমার ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে ভাবিয়ে তুললে সারদা!—আমি দেখব চিন্তা করে,—আজ চললাম। নতুন-মা এলে বোলো, আমি এসেছিলাম।

২৬

তারকের বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে চুকিয়া গেল।

বিমলবাবু কলিকাতায় আসিয়াছেন। সবিতা প্রস্তুত হইয়াছেন বিমলবাবুর সহিত তীর্থভ্রমণে বাহির হইবার জন্য। আগামী কল্য তাঁহারা রওনা হইবেন। পুরাতন দরওয়ান মহাদেও ব্যতীত বিমলবাবু দাসী ও রাঁধুনী সঙ্গে লওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

রাখালকে ডাকাইয়া সবিতা তাহার হাতে ব্রজবিহারীবাবুর শিল্‌মোহর-করা গহনা সমেত বাক্সটি তুলিয়া দিয়া বলিলেন,—এ গহনা রেণুর। সে না নিতে চায়, সংসারে মাতৃহীনা মেয়েদের মধ্যে এ তুমি বিলিয়ে দিয়ো রাজু। এ সমস্ত আট্‌কে রেখেছিলাম যার জন্য, সে-ই যখন চরম দারিদ্র্য মাথায় তুলে নিল, আমি আর এ বোঝা ব'য়ে মরি কেন? দেড়লক্ষ টাকা দামের যে সম্পত্তি আমার নামে ছিল—সে কেনা হয়েছিল রেণুরই বাপের উপার্জ্জনের টাকায়। সে সম্পত্তি রেণুর নামে ট্রান্স্‌ফার করে রেজেষ্ট্রী করে দিয়েচি। এই নাও সেই দলিল ও কাগজপত্র। সে না গ্রহণ করে, এ সম্পত্তির যে ব্যবস্থা তুমি নিজে ভাল বুঝবে, তাই কোরো। আর এই হাজার কয়েক টাকার কোম্পানীর কাগজ ও আমার এই হার, বালা, চুড়ি, যা বিয়ের সময় আমার বাপের দেওয়া। এ আমি, তোমার ঘর করতে যে আসবে, অর্থাৎ আমার বৌমাকে—আমার যৌতুক দিয়ে গেলাম। এ তার শ্বাশুড়ীর আশীর্ব্বাদী। ফিরিয়ে দিয়োনা বাবা।

সারদা দূরে দাঁড়াইয়া রাখালের মুখের পানে চাহিয়া মৃদু হাসিল।

রাজু বিপন্ন হইয়া বলিল,—নতুন-মা, আপনার ছেলের বিদ্যে-বুদ্ধির খবর আপনার অজানা নয়।—এতবড় গুরু দায়িত্ব আমার উপর দিয়ে যাচ্চেন কেন? আমি কি পারব এ সবের ব্যবস্থা করতে? তার চেয়ে বরং তারকের কাছে এসব গচ্ছিত রেখে যান্; সে আইনজ্ঞ মানুষ, বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপার বোঝে-সোঝে ভাল, তার হাতে থাকলে সুব্যবস্থা হতে পারে।

সবিতা বলিলেন,—আমাকে কি তুই নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে দিবিনে রাজু? তারপরে গাঢ় কণ্ঠে বলিলেন,—যে উদ্দেশ্য নিয়ে—তোমার কাকাবাবুর হাত থেকে এ সমস্ত একদিন নিজের হাতে নিয়েছিলাম, তা' সার্থক হোলোনা। তোমার কাকাবাবুর ডুবে যাওয়া কারবারের তলায় এগুলোও সেদিন তলিয়ে গেলেই ভাল হত। হয়ত, এরচেয়ে সান্ত্বনা পেতাম তাতে।

রাখাল কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, কিন্তু সে যাই বলুন—নতুন-মা, আমি কিন্তু এসব আর্থিকব্যাপারে নিতান্তই অজ্ঞ। আমাকে দিয়ে—

সবিতা ধীর কণ্ঠে বলিলেন, ভয় পেয়োনা রাজু! তুমি এ সম্বন্ধে যে-ব্যবস্থাই করবে, সেইটাই হবে এর সুব্যবস্থা আর শুভ ব্যবস্থা।

সবিতারা প্রথমেই যাত্রা করিলেন দ্বারকা। সেখান হইতে বহু স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে গুজরাট রাজপুতানা প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া আগ্রায় আসিয়া পৌছিলে, বিমলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, মথুরা বৃন্দাবন দেখবেনা সবিতা? এখান থেকে খুব কাছে—

সবিতা বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র প্রভাস দেখলাম, দ্বারকা দেখলাম, মথুরা-বৃন্দাবনই বা বাকি থাকে কেন,—চলো যাই।

মথুরায় বিমলবাবুর পরিচিত এক ধনী শেঠের প্রাসাদে তাঁহারা আসিয়া উঠিলেন। শেঠজী কারবার সূত্রে বিমলবাবুর সহিত বিশেষ পরিচিত।

তিনি তাঁহার সুরম্য 'গেষ্ট্ হাউস্'এ বা অতিথিভবনে বিমলবাবুদের থাকিবার বন্দোবস্ত তো করিয়া দিলেনই, নিজের একখানি মোটরকারও বিমলবাবুর সর্ব্বদা ব্যবহারের নিমিত্ত ছাড়িয়া দিলেন।

মথুরা হইতে মোটরযোগে বৃন্দাবনে গিয়া বিমলবাবু বলিলেন, সবিতা, ব্রজবাবুদের সঙ্গে দেখা করতে যাবে নাকি?

সবিতা বলিলেন, পাগল হয়েচ। আমরা দেবদর্শন করতে এসেচি, তাই দেখে ফিরে যাব।

সমস্ত দিন বৃন্দাবনের নানা স্থানে ঘুরিয়া ক্লান্ত বিমলবাবু বৈকালে বলিলেন, চলো এইবার মথুরায় ফেরা যাক।

সবিতা বলিলেন, শুনেচি, বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর আরতি ভারী সুন্দর। আরতিটা দেখে গেলে হয়না?

বিমলবাবু বলিলেন, বেশতো, আরতি দেখেই ফেরা যাবে। বিস্তৃত একটি মাঠের পাশে গাছতলায় মোটর রাখিয়া তাঁহারা সতরঞ্চি বিছাইয়া বিশ্রাম করিতে বসিলেন। মহাদেও দরওয়ান বিমলবাবুর চায়ের সরঞ্জামপূর্ণ বেতের বাক্স গাড়ী হইতে নামাইয়া ষ্টোভ্ জ্বালিয়া গরমজল প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। সবিতা চা খান্না। কিন্তু নিজহস্তে চা তৈয়ারী করেন। এলুমিনিয়ম কেটলী হইতে ফুটন্ত জল চীনামাটীর চা-পাত্রে ঢালিয়া, চিনি, চা, দুধ প্রভৃতি, মহাদেও সবিতার সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিল।

ক্লান্ত কণ্ঠে সবিতা বলিলেন, মহাদেব, তুমিই আজ চা তৈরি কর। আমি ঘুরে ঘুরে বড় ক্লান্ত হয়েচি।

বিমলবাবু উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, তোমার শরীর খারাপ ঠেকছে নাকি? তা'হলে আজ আর মন্দিরে ভীড়ের মধ্যে গিয়ে কাজ নেই।

সবিতা বলিলেন, না, এমন কিছুই হয়নি। আরতি দেখব, সঙ্কল্প যখন করেচি, না দেখে ফিরে যাবনা।

প্রান্তরের প্রান্তে সূর্য্য অস্তাচলে নামিয়া গেলেন। গাঢ় রাঙা আলোয় নীল আকাশ সবুজ মাঠ আরক্তিম হইয়া উঠিল। কুলায়গামী পাখীর কলকোলাহলে বৃন্দাবনের গাছপালা ও কুঞ্জ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। সবিতা স্তব্ধ ভাবে মাঠের দূর প্রান্তে অন্যমনস্ক দৃষ্টি মেলিয়া বসিয়া আছেন। বিমলবাবু নীরবে সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া বিমলবাবু বলিলেন, চলো, এইবার মন্দিরে যাই। পরে গেলে ভীড়ে হয়তো তোমার ঢুকতে কষ্ট হতে পারে।

সবিতা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় সচকিতে ফিরিয়া চাহিয়া বলিলেন,—চলো।

গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া হঠাৎ কি ভাবিয়া বলিলেন, দেখো, একটু পরেই না হয় মন্দিরে যাব আমরা। আরতির কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠুক আগে। ভীড়ে এমন আর কি কষ্ট হবে ?

বিমলবাবু প্রতিবাদ করিলেননা।

গাড়ী এদিক সেদিক খানিক ঘুরিবার পরই আলোকিত গোবিন্দজীর মন্দিরে আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিল। বিমলবাবুরা মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

গোবিন্দজীর আরতি হইতেছে। সবিতা বিগ্রহ মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া গলবস্ত্রে আরতি দর্শন করিতেছেন। কিন্তু, তাঁহার দৃষ্টি বিগ্রহের প্রতি স্থির নয়, আশে পাশে চঞ্চল।

হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল সেই বারান্দারই এককোণে ব্রজবাবু যুক্তকরে দাঁড়াইয়া নিষ্পলক নয়নে আরতি দর্শন করিতেছেন। ওষ্ঠাধর মৃদুমৃদু কাঁপিতেছে, নামজপ করিতেছেন সম্ভবতঃ।

আরতি সমাপ্ত হইলে ভীড় কমিয়া গেল। বিমলবাবু অগ্রসর হইয়া ব্রজবাবুর পদধূলি গ্রহণ করিলেন।—সর্পদষ্টবৎ সরিয়া গিয়া ব্রজবাবু

বলিয়া উঠিলেন, গোবিন্দ গোবিন্দ। একী! প্রভুর মন্দিরে আমাকে প্রণাম! অপরাধে পাপী হলাম যে!

বিমলবাবু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, আমি জানতামনা মন্দিরে প্রণাম করতে নাই। ক্ষমা করুন।

—গোবিন্দ গোবিন্দ, আপনি আমাদের বিমলবাবু না? চলুন, চলুন, আঙিনায় তুলসী কুঞ্জের দিকে গিয়ে বসি।

বিমলবাবু বলিলেন, চলুন।

ব্রজবাবু বিগ্রহ মূর্ত্তির সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে শুইয়া পড়িয়া বারংবার আপনার অপরাধ মলিয়া হয়তো বা বিমলবাবুর প্রণাম জনিত অপরাধেরই মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

সবিতা স্থিরনয়নে ভূপতিত ব্রজবাবুর পানে তাকাইয়া নিস্পন্দের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সুদীর্ঘ প্রণাম অন্তে উঠিয়া ব্রজবাবু, সবিতা ও বিমলবাবু সহ মন্দিরের অন্যদিকে গিয়া দাঁড়াইলেন।

ব্রজবাবুর চেহারার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মুখমণ্ডল ও মস্তক ক্ষৌর মণ্ডিত। শীর্ষে দুগ্ধধবল শিখাগুচ্ছ ছাড়া আর কেশের চিহ্ন মাত্র নাই। কণ্ঠে তুলসী কাঠের গুচ্ছবদ্ধ মালা। নাসিকা ও ললাটে তিলকরেখা, হাতে হরিনামের ঝুলি, গায়ে নামাবলী। গৌরবর্ণ দীর্ঘচ্ছন্দ দেহ রৌদ্রদগ্ধ তামাটে হইয়া বার্দ্ধক্যভারে সম্মুখের দিকে অনেকটা নত হইয়া পড়িয়াছে।

বিমলবাবুর কুশল প্রশ্নের উত্তরে ভাবগাঢ়কণ্ঠে ব্রজবাবু বলিলেন,—বিমলবাবু, গোবিন্দ এই দীনহীনকে অনেক কৃপা করেছেন। যে-জন ব্রজধামে এসেছে, ব্রজরেণু মেখেছে, যমুনায় অবগাহন করে শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরিগোবর্দ্ধন দর্শন স্পর্শন করেছে, তার কি আর কোনও

অকুশল থাকে? বৃন্দাবনে সবই কুশল। ইহলোকে আর আমার কোনও কামনাই নেই। এখানে আমি কৃষ্ণানন্দে বিভোর হয়ে আছি।

সবিতা অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিলেন, রাজুর কাছে শুনেচি, তুমি এখানে নাকি কোন্ বৈষ্ণব বাবাজীর আখড়ায় দীক্ষা নিয়েচ? সদাসর্ব্বদা বোধহয় তাদের নিয়েই মেতে আছো মেজকর্ত্তা?

আমতা আমতা করিয়া ব্রজবাবু বলিলেন, তা' কতকটা বটে। কি জানো নতুন-বৌ, আমার শেষের দিনগুলি গোবিন্দ তাঁর চরণ ছায়ায় টেনে এনে বড় করুণাই করেচেন। এখানে সংসারের সকল দুঃখতাপ সত্যিই জুড়িয়েছি।

সবিতা স্তম্ভিত বিস্ময়ে ব্রজবাবুর পানে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন,— মেজকর্ত্তা, এ যে তোমার হেসে খেরে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে মদের নেশায় মশ্‌গুল্ থাকা। এ আনন্দের দাম কি তা' জানো?

মন্দিরের অন্তধারে খোল করতাল যোগে একদল কীর্ত্তনিয়া গাহিতেছিল—

"প্রেমানন্দে ডগমগ সুধার সাগরে
ডুবিয়া ডুবিয়া পিয়ে তৃপ্তি না সঞ্চারে॥
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ তন-মন,
কৃষ্ণ যে সুখের নিধি পরম রতন॥
কুল, শীল, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, লোকলজ্জা, ভয়,
দেহ গেহ সম্পদ যে নাহি কি আছয়,
মদিরা-মদান্ধ যেন কটির বসন
আছে কি নাআছে তার নাহি বিবেচন॥"

ব্রজবাবুর দুই চক্ষু ছাপিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বিহ্বল

কণ্ঠে কহিলেন, নতুন-বৌ, এ মদের নেশা যেন আর না ছোটে এই কামনাই কোরো।

সবিতা কঠিন কণ্ঠে কহিলেন, তোমার মেয়ে? আমার—রেণু?

—কে আমার মেয়ে? আর আমিত্বের মোহ রেখোনা নতুন-বৌ। এখানে সর্বত্রই তুঁহু তুঁহু। 'আমার' বলে কিছুই নেই। সেই একমাত্র 'আমি' ব্রজনন্দন শ্রীকৃষ্ণই এখানে সব। রেণুকে তাঁরই চরণে অর্পণ করেচি। যতদিন ওকে নিজের বলে ভেবেচি, ভাবনায় হয়ে পড়েচি দিশেহারা। এবার দিনদুনিয়ার মালিক যিনি, তাঁর হাতে তোমার রেণুকে তুলে দিয়ে—নিশ্চিন্ত হয়েছি। তিনি যে ব্যবস্থা করবেন, কারুর সাধ্য নেই তা' রদ করবার। ধরোনা কেন আমাদের কথাই। মানুষের ব্যবস্থা, মানুষের ইচ্ছা, মানুষের মালিকানা খাটলো কি? আড়াল থেকে সেই পরমরসিক হেসে যেদিকে অঙ্গুলি হেলালেন, সেই দিকেই উল্টে গেল পাশা। পুতুলবাজীর পুতুল আমরা। নিজেদের কোনও ইচ্ছাই মানুষের খাটতে পারেনা, একমাত্র তাঁর ইচ্ছা ছাড়া।

সবিতা কি যেন জবাব দিতে যাইতেছিলেন, কে ডাকিল, বাবা—

কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া সবিতা পিছন ফিরিয়া দেখিলেন,—রেণু। শীর্ণ মুখ, রুক্ষ কেশ, চেহারায় দারিদ্র্যের রুক্ষতা সুস্পষ্ট। পরণে একখানি আধময়লা ছাপা বৃন্দাবনী শাড়ী, তারও কণ্ঠে তুলসীর কণ্ঠী—ললাটে ও নাসিকাগ্রে চন্দন তিলক।

সবিতা স্তম্ভিত দৃষ্টিতে কন্যার পানে তাকাইয়া নিথর হইয়া গেলেন।

রেণু সবিতার দিকে না তাকাইয়া—ডাকিল, বাবা, ঘরে চলো, রাত হয়ে যাচ্চে।

ব্রজবাবু একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, তোর মাকে চিনতে পারলিনে রেণু?

মাথা হেলাইয়া রেণু বলিল দেখেচি। মন্দিরে তো প্রণাম করতে নেই।

মায়ের মুখের পানে একবার শান্ত নির্লিপ্ত দৃষ্টিপাত করিয়া আবার ব্রজবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল,—চলো বাবা। একাদশীর উপোস করে রয়েচো সারাদিন, কখন্ একটু প্রসাদ পাবে?

কন্যার আকৃতি দেখিয়া সবিতার অন্তরে যে আর্ত্তক্রন্দন গুমরিয়া উঠিতেছিল, কন্যার কথাবার্ত্তার ভঙ্গীতে তাহা যেন আরও উদ্বেল হইয়া উঠিল।

মাতার প্রতি কন্যার এই পরের মত আচরণে ব্রজবাবু মনে মনে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছিলেন। হয়তো বা সেইজন্যই সবিতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, নতুন-বৌ, গোবিন্দের কুটীরে একদিন তোমরা সেবা করতে আসতে পারবে কি?

সবিতা রেণুর নির্লিপ্তমুখের পানে ক্ষণিক দৃষ্টিপাত করিয়া ব্রজবাবুকে জবাব দিলেন, না মেজকর্ত্তা, তোমার গোবিন্দর কুটীরে আমার মতন মহাপাপীর প্রবেশের উপায় নেই।

জিভ কাটিয়া ব্রজবাবু বলিলেন, গোবিন্দ! গোবিন্দ! দীনদয়াল দীনবন্ধু —পতিতপাবন তিনি। তিনি যে অশরণের শরণ নতুন-বৌ—

উচ্ছ্বসিত কান্না প্রাণপণে দমন করিতে করিতে সবিতা বলিলেন, শুধু তোতা পাখীর মত মুখেই এ-সব আওড়ে গেলে মেজকর্ত্তা! তোমাদের ধর্ম্ম, তোমাদের যা' তৈরি করেচে, সে তোমরা নিজচক্ষে দেখতে পাচ্চোনা তাই রক্ষে। যেধর্ম্মে ক্ষমা নেই সেধর্ম্ম অধর্ম্ম থেকে কতটুকু আর উঁচু? সবিতা ত্বরিতপদে মন্দিরের বাহিরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

বিমূঢ় ব্রজবাবুর সামনে আসিয়া বিমলবাবু বলিলেন,—আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল, কখন আপনার সুবিধা হবে জানতে পারলে—

ব্রজবাবু বলিলেন, যখন আপনার সুবিধা হবে, তখনই।

বিমলবাবু বলিলেন, বেশ, কাল দুপুরে আমি আসব। আপনার বাসাটা—

—এই মন্দির থেকে বেরিয়ে বাঁ হাতি রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে গিয়ে ডাইনে গলিতে। ঘনশ্যামদাস বাবাজীর কুঞ্জ বললে সকলেই দেখিয়ে দিতে পার্বে।

রেণু বলিল, বাবা, কাল যে শ্রীগুরু মহারাজের কুঞ্জে অহোরাত্র নামকীর্ত্তন আর বৈষ্ণবসেবা আছে। কাল সারাদিন আমরা তো সেখানেই থাক্‌বো।

ব্রজবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, ঠিক মনে করিয়ে দিয়েচিস মা। ভাগ্যিস্! বিমলবাবু, কাল আমায় মাপ করতে হবে ;—কাল আমি সারাদিন আমার গুরুদেব শ্রীশ্রীবৈকুণ্ঠদাস বাবাজীর শ্রীকুঞ্জে থাকবো। আপনি পরশু সকালে এলে অসুবিধা হবে কি ?

বিমলবাবু বলিলেন, কিছুনা। তা'হলে পরশু সকালেই আমি আপনার কাছে আসব। নমস্কার !—

ব্রজবাবু বলিলেন, গোবিন্দ ! গোবিন্দ !

মোটরে উঠিয়াই আসনের উপর ক্লান্ত দেহ এলাইয়া দিয়া সবিতা বলিলেন, আর নানাস্থানে ছুটে বেড়াতে ভালো লাগচেনা। এইবার বিশ্রাম চাই দয়াময়।

বিস্মিত বিমলবাবু সবিতার মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন,—বৃন্দাবনেই থাকবে স্থির করলে নাকি ?

—না—না—না! এখানে আমি একদণ্ডও টিঁকতে পারবোনা !—কণ্ঠস্বরে একটু জোর দিয়াই বলিলেন—আমাকে সিঙ্গাপুরে নিয়ে চলো।

অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বিমলবাবু বলিলেন, সে কি ?

—হ্যাঁ,—কাল সকালেই যাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেল। একদিনও আর বিলম্ব নয়—সবিতার কণ্ঠে আকুল মিনতি ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

বিমলবাবু বলিলেন, এমন অধীর হোয়োনা সবিতা। কাল ত যাওয়া হতে পারেনা। এ রেলের পথ নয়, জাহাজের পথ! কলকাতা হয়ে যেতে হবে। তাছাড়া—ব্রজবাবুকে কথা দিয়ে এলাম, পরশু সকালে তাঁর সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করব। সুতরাং কালকের দিনটা অপেক্ষা না করে তো উপায় নেই। অবশ্য, পরশু রাত্রের ট্রেণেই আমরা মথুরা ছাড়তে পারবো—

সবিতা বালিকার ন্যায় ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, না না, আমি পারবো না। আমার দম আট্‌কে আসচে এখানে। এদেশ থেকে আমাকে তুমি চিরদিনের মতো বহু দূরদেশে নিয়ে চলো। বহুদূরে—যেখানে রীতি, নীতি, সমাজ, মানুষ সবই অন্যরকম। আমি মুছে ফেলব আমার সমস্ত অতীত! তাকে এমন করে—আমার জীবন দখল করে থাকতে আর দেবনা আমি।

বিমলবাবু কোনও উত্তর দিলেন না। সবিতার মনের অবস্থা বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

পরদিন প্রাতে বিমলবাবু ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিলেন, সবিতার শয়ন কক্ষের দ্বার তখনও বন্ধ। বিমলবাবু চিরদিনই একটু বেশি বেলাতে ওঠেন। কিন্তু সবিতার ভোরে ওঠাই অভ্যাস। এত বেলাতেও সবিতার শয়নকক্ষের দ্বাররুদ্ধ দেখিয়া তিনি শঙ্কিত হইলেন। দুয়ারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দ্বারে ধাক্কা দিবেন কিনা ভাবিতেছেন, এমন সময়ে দুয়ার খুলিয়া সবিতা বাহির হইলেন। দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি ও কালিমা চোখে-মুখে নিবিড় রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। মরণাপন্ন রোগী লইয়া সুদীর্ঘ রজনী মৃত্যুর সহিত বুঝিবার পর প্রভাতে নারীর মুখের

চেহারা যেমন বদলাইয়া যায়, এক রাত্রিতেই সবিতার মুখে যেন সেই ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে!

বিমলবাবু একবার সবিতার পানে তাকাইয়া ব্যথিত দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাইয়া লইলেন। কিছুই প্রশ্ন করিলেন না।

সবিতা ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, অনেক বেলা হয়ে গেছে দেখচি। তুমি চা পাওনি নিশ্চয়। কাপড় কেচে এসে আমি তৈরি করে দিচ্চি এখুনি।

বিমলবাবু বলিলেন, ঠাকুর চা করে দিক্ না আজ, সবিতা।

সবিতা বলিলেন, না না, সে ভাল তৈরি করতে পারে না। আমার দেরি হবেনা বেশি।

তারপরে নিজেই কৈফিয়তের ভঙ্গীতে সহজ গলায় কহিলেন, রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি। কাল মেজাজ এমন বিগড়ে গেছলো, মাথা ধরে উঠে রাত্তিরের ঘুমটি মাঝে থেকে মাটী হোলো আর কি। যাই, চট্ করে স্নান্টা সেরে আসি।

সবিতা গামছা হাতে লইয়া স্নানকক্ষের দিকে চলিয়া গেলেন। বিমলবাবু অন্যমনস্ক চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, কতখানি নিদারুণ হতাশা ও মর্ম্মবেদনায় মানুষের চেহারা একরাত্রের মধ্যে এতখানি ম্লান ও বিশুষ্ক হইতে পারে।

চা ঢালিতে ঢালিতে সবিতা অত্যন্ত সহজ ভাবে বলিলেন,—কাল রাত্রে বেশ ভাল করে ভেবে চিন্তে কর্ত্তব্য স্থির করে ফেলেচি। বুঝেচ?

বিমলবাবু বলিলেন, কিসের?

—ওই ওদের সম্বন্ধে!—

এই অনুদ্দিষ্ট সর্ব্বনাম যে কাহার উদ্দেশে উচ্চারিত হইল বিমলবাবু

বুঝিতে পারিলেন। কতখানি গভীর বেদনার ফলেই আর্ত প্রিয়নাম আজ সর্ব্বনামে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহাও তাঁহার অজ্ঞাত রহিল না। বলিলেন, কি স্থির করলে সবিতা?

—সিঙ্গাপুরে যাওয়াই স্থির করলাম।

—আরও দিনকতক তীর্থভ্রমণে বেড়ানো যাক—তারপরেও যদি যেতে ইচ্ছে কর, যাবে। কেমন?—

—না, আর তীর্থে নয়। (মানুষের হাতে গড়া এই পুতুল খেলার তীর্থে ঘুরে ঘুরে শুধু ঘোরারই নেশায় খানিক সময় কাটে মাত্র। অন্তরের প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসার উত্তর মেলেনা। এ খেলায় আর যারই মন ভুলুক, যে সত্য চায়, তার মন ভোলেনা।) এবারে বিশ্রাম চাই।

বিমলবাবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, কিন্তু যেখানে বিশ্রামের আশায় যেতে চাইছো, সেখানে গিয়ে যদি তা' না পাও?

—সে ভয় কোরনা। এবার আমার আর ভুল হবেনা। তোমার হাত দিয়ে ভগবান আমার জীবনের দিনান্তে, যে-সামগ্রী আমাকে পাঠিয়েছেন, তা' সামান্য নয়। (বোঁটা থেকে যে-ফুল ছিঁড়ে পড়ে গেছে মাটীতে, সে ফুল আর কখনো শাখার বাঁধনে ফিরে আসেনা। আলেয়ার পিছনে ছুটে বেড়ানো যে, শুধু দুঃখই বাড়ানো,)—এবার তা আমি বুঝতে পেরেচি।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে কাটিয়া গেল। বিমলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাহ'লে টেলিগ্রাম করে দিই, সিঙ্গাপুরের জাহাজে দু'টো কেবিন্ রিজার্ভের জন্য?

সবিতা মাথা হেলাইয়া সম্মতি জানাইলেন।

পরদিন সকালে বিমলবাবু মথুরা হইতে মোটরযোগে যখন বৃন্দাবনে

রওনা হইলেন, সবিতাকে বলিলেন, ব্রজবাবু তোমাকে তাঁর বাসায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন। একবার ঘুরে আসবে নাকি ?

সবিতা অসম্মত হইলেন। বিমলবাবু একাই বাহির হইয়া গেলেন। বৃন্দাবনে ব্রজবাবুর ঠিকানা খুঁজিয়া বাসায় পৌছিয়া দেখিলেন, রেণু পূর্ব্বদিন রাত্রি হইতে কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছে। চিকিৎসা ও শুশ্রূষার উপযুক্ত বন্দোবস্ত কিছুই হয় নাই। রোগীকে হরিনাম সংকীর্ত্তন শোনানো হইতেছে!—ব্রজবাবু ঠাকুরঘরে হত্যা দিয়া পড়িয়া আছেন। মধ্যে মধ্যে উঠিয়া আসিয়া মুমূর্ষু কন্যার ওষ্ঠাধরে একটু করিয়া চরণামৃত দিতেছেন, পুনরায় ব্যাকুলচিত্তে ছুটিয়া গিয়া বিগ্রহের সম্মুখে আছড়াইয়া পড়িতেছেন। তাঁহার গুরুদেব বৈকুণ্ঠদাস বাবাজীর কুঞ্জে সংবাদ পাঠানোয়, তিনি আশ্রমের একজন বৈষ্ণবী সেবাদাসী পাঠাইয়া দিয়াছেন, রোগিনীর শুশ্রূষার জন্য। সে মথুরা জেলার যুবতী। বাংলা ভাষা ভাল বুঝিতে পারেনা। শুশ্রূষা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান নাই। অসাড়প্রায় রোগিনীকে পিপাসায় জলদান এবং বৈকুণ্ঠদাস বাবাজীদত্ত কবিরাজি বড়ি ও ঠাকুরের চরণামৃত সেবন করাইতেছে। রোগিনীর শয্যা ও বস্ত্রাদিতে উপযুক্ত পরিচ্ছন্নতার অভাব বিমলবাবুর চোখে পড়িল।

ব্যাপার দেখিয়া বিমলবাবু সত্বর সবিতাকে আনিবার জন্য মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রেণুর অবস্থা যে শঙ্কাজনক তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

সংবাদ শুনিয়া সবিতা যেন পাথর হইয়া গেলেন।

বিমলবাবু তাঁহাকে লইয়া কালবিলম্ব না করিয়া পুনরায় বৃন্দাবনে ছুটিলেন।

মোটরে উপবিষ্টা সবিতার মুখের পানে তখন তাকানো যায়না। তাঁহার মধ্যে যেন একটা বিরাট ঝড় স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে।

বহুক্ষণ বাদে, জলমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় ছটফট করিয়া রুদ্ধ শ্বাসে একবার সবিতা বলিয়া উঠিলেন,—উঃ, গাড়ীখানা এত আস্তে চলছে কেন? আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসচে যে!

বিমলবাবু দুই একটি সময়োপযোগী কথা কহিলেও, তাহা সবিতার কানে পৌঁছিল না। অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, দয়াময়, তোমরা তো অনেক দেশের অনেক ইতিহাস পড়েচ। নিজের মা তার সন্তানের এমন দুর্গতির কারণ হয়েচে, পড়েচো কি কোথাও—

বিমলবাবু নিরুত্তর রহিলেন।

পথে একজায়গায় একটি কূপের সামনে মোটর থামিল, র‍্যাডিয়েটরে জল ভরিয়া লইবার জন্য। পথিপার্শ্বে দূরে কৃষিজীবিদের কুটীর হইতে বালকণ্ঠের কাতরক্রন্দন ধ্বনি ভাসিয়া আসিল।

সবিতা আচমকা ভীষণ শিহরিয়া উঠিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওগো, কী হোলো ওদের? ওযে কান্নার শব্দ,—না?—শুনতে পাচ্চ কি?—

বিমলবাবু সবিতার মানসিক অবস্থা বুঝিয়া চিন্তিত হইলেন। বলিলেন, ও কিছু নয়। ছোটছেলে এমনিই কাঁদচে বোধহয়। কিন্তু, তুমি যদি এমন নার্ভাস্ হয়ে পড়ো সবিতা, কী করে সেখানে রোগীর শুশ্রূষার দায়িত্ব নেবে?

সবিতা অতিশয় ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, না না, আমি একটুও অস্থির হইনি। যেটুকু হয়েচি, সেখানে গেলে—তাকে একবার বুকে পেলে আমার স-ব ঠিক হয়ে যাবে। এই পনেরো বচ্ছর আমার বুকের ভিতরটা খালি হয়ে রয়েচে যে। করুক সে আমার উপরে রাগ, করুক ঘৃণা। করবারই তো কথা।…যতোই যা কিছু ভুল করে থাকিনা, তবু আমি তার মা। এটা কি আর সে বুঝবেনা? নিশ্চয়ই বুঝবে, দেখে নিও। ও

তার রাগ নয়, ঘৃণা নয়, মার ওপর অভিমান! মেয়ে যে আমার ছোটবেলা থেকেই ভারি অভিমানী!

বিমলবাবু দীর্ঘ নিশ্বাস চাপিয়া অন্যদিকে তাকাইয়া রহিলেন।

যথাসম্ভব দ্রুত তাঁহারা বৃন্দাবনে ব্রজবাবুর বাসায় আসিয়া পৌঁছিলেন। বাটীর সম্মুখে দড়ির খাটিয়া ও গেরুয়াধারী বৈষ্ণবদল দেখিয়া বিমলবাবু শঙ্কিত নেত্রে সবিতার পানে তাকাইলেন। স্থির ধীর মুখের 'পরে আর সে চাঞ্চল্য ও উদ্বেগ ব্যাকুলতার লেশমাত্র নাই। সেখানে গাঢ় বিষণ্ণাভ অথচ অতিশয় কঠিন একটি যবনিকা নামিয়া আসিয়াছে। বিমলবাবু চমকিয়া উঠিলেন। মনে পড়িল, সর্ব্বপ্রথম যেদিন তিনি সবিতাকে দেখিয়াছিলেন, সেদিন সবিতার মুখে এই রকম আশ্চর্য্য কঠিন, অথচ নিগূঢ় বিষাদ-ব্যঞ্জক ছায়া দেখিতে পাইয়াছিলেন।

সবিতা এতটুকুও অস্থিরতা প্রকাশ করিলেননা। মোটর হইতে নামিয়া বাসার ভিতরে চলিয়া গেলেন। সদ্য শোকাহত ব্রজবাবু অশ্রু-ভগ্ন কণ্ঠে বলিলেন—এসেচো নতুন-বৌ! এঁরা সব ব্যস্ত হয়েচেন রেণুকে নিয়ে যাবার জন্য। আমি বলেচি, তা' হয়না। যার ধন সে আসুক, তারপরে তোমরা যা' খুসি কোরো। তোমার গচ্ছিত সামগ্রী আমি রাখতে পারলাম না, হারিয়ে ফেললাম! আমাকে মাপ করতে পারবে কি?

সবিতা কথা কহিলেননা। কম্পিত অধর প্রাণপণে দাঁতে চাপিয়া নির্ব্বাকমুখে অপরিচ্ছন্ন মেঝের একপাশে বিছানাটির পানে তাকাইয়া রহিলেন। ভূমিতলে মলিন শয্যায় মলিন বস্ত্রাবৃত নিস্পন্দ শীতলদেহ পড়িয়া আছে। আশে-পাশে জলের লোটা, চরণামৃতের ভাণ্ড, কবিরাজী বড়ি, খল নুড়ি—প্রভৃতি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

সবিতা অগ্রসর হইয়া কম্পিত হস্তে শবদেহের মুখ হইতে মলিন

আচ্ছাদন উঠাইলেন। অতিশয় শীর্ণ, বিবর্ণ, রক্তলেশহীন মুখ, কালিমা-লিপ্ত নিমীলিত চক্ষু গভীরভাবে কোটরে বসিয়া গিয়াছে। চোয়ালের ও কণ্ঠার হাড় উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। তৈলহীন রুক্ষ কেশের রাশি ঘাড়ের নিচে স্তূপীকৃত। স্নেহময়ী জননীর চোখে যেন সে মুখে বিশ্বের গভীরতম দুঃখ ও বেদনার নিগূঢ় ছায়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

মৃত্যু-মলিন মুখখানির পানে বহুক্ষণ অশ্রুহীন নিষ্পলক-নেত্রে তাকাইয়া থাকিয়া সবিতা অবনত হইয়া কন্যার তুষার শীতল ললাটে গভীর চুম্বন আঁকিয়া দিলেন।

শববাহীদল অগ্রসর হইয়া আসিলে আপনা হইতেই তিনি সরিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু বৃদ্ধ ব্রজবাবু তাঁর আজীবনের সংযম সাধনা ও ভগবদ্‌জ্ঞান ভুলিয়া—আজ শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িলেন, মাগো,—তোর এ বুড়ো বাপকে কার কাছে রেখে গেলি—

কয়েকদিন অতিক্রান্ত হইয়াছে। দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া কলিকাতা হইতে রাজু আসিয়াছে।

তার পাওয়া গিয়াছে ব্রজবাবুর কনিষ্ঠা পত্নী অর্থাৎ রেণুর বিমাতা আসিবেন। সম্ভবতঃ ব্রজবাবুর ভার গ্রহণ করিবার নিমিত্তই তিনি আসিতেছেন, এইরূপ সকলের অনুমান।

এই কয়েকদিনেই সবিতার দেহে আকস্মিক বার্দ্ধক্যের চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। চোখে-মুখে অনিদ্রা ও গভীর শোকের ঘন কালি পড়িয়াছে। শুষ্ক ওষ্ঠাধরে লাবণ্যের লেশমাত্র নাই। মুখভাব অসাড়।

শোকজীর্ণ ব্রজবাবুর সেবার সকল ভার সবিতা নিজহস্তে গ্রহণ করিয়া অহোরাত্র সেই কাজের মধ্যেই আপনাকে নিমগ্ন রাখিয়াছেন।

ঘরের মেঝেয় বসিয়া সবিতা কুলায় করিয়া খই বাছিতেছিলেন,

ব্রজবাবুর নৈশাহারের জন্য। পরণের শাড়ীখানি অতিশয় মলিন, স্থানে স্থানে তেল, ঘি কালি ও কাদার দাগ লাগিয়াছে। মাথার সীঁথি এলোমেলো অস্পষ্ট, রুক্ষ কেশপাশে ছোট-ছোট জট্ বাঁধিয়াছে।

বিমলবাবু আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সবিতা মুখ উঁচু করিয়া বলিলেন, তুমি আর কতদিন এখানে থাকবে?

বিমলবাবু বলিলেন, যতদিন বলো।

সবিতা বলিলেন, ছোট-গিন্নি আসছেন আজ। বোধহয় তাঁর আসার আগেই আমার এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। কি বল?

বিমলবাবু বলিলেন, সে তুমি নিজে বিবেচনা করে দেখ।

সবিতা বলিলেন, কিন্তু, আমি যে বুঝতে পাচ্চি, তারা এঁকে শান্তিতে থাকতে দেবেনা। এখান থেকে এঁকে কলকাতায় টেনে নিয়ে যাওয়ার মতলবেই আসছে।

বিমলবাবু বলিলেন, তাতে ক্ষতি কি?

সবিতা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, তা হয়না। এই অসহায় অক্ষম রোগে শোকে জীর্ণ মানুষটাকে তার শেষ আশ্রয় বৃন্দাবন থেকে টেনে নিয়ে যাওয়ার মত নিষ্ঠুরতা আর হতে পারেনা। অন্তরের টান্ থাকলে ছোট গিন্নী এইখানে থেকেই স্বামীর সেবা করতেন।

বিমলবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

সবিতা বলিলেন, এই ধূলোময়লার দেশে তোমার খুবই কষ্ট হচ্চে, বুঝতে পাচ্চি। তুমি ফিরে যাও। আমি এইখানেই র'য়ে গেলুম।

বিমলবাবু বলিলেন, আচ্ছা।

বিমলবাবু চলিয়া যাইতেছিলেন, পিছন হইতে সবিতা ডাকিলেন, —শোনো,

বিমলবাবু বলিলেন, আচ্ছা।

বিমলবাবু চলিয়া যাইতেছিলেন, পিছন হইতে সবিতা ডাকিলেন, শোনো।

বিমলবাবু ফিরিলে সবিতা তাঁহার পানে বেদনাবিহ্বল দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন, একটা কথার উত্তর দিয়ে যেতে পারবে আমাকে?

বিমলবাবু বলিলেন, বলো।

জন্ম-জন্মান্তরেও কি আমাকে এই ক্ষমাহীন গ্লানির বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে?

সবিতার কণ্ঠ বাষ্পারুদ্ধ হইয়া আসিল। বলিলেন, কিন্তু রেণু যে বড় হয়েও একদিন আমাকে 'মা' বলে ডেকেছিল, আপন হাতে সেবা-যত্ন আদর করেছিল, তাতেও আমার কালি মুছে যায়নি?

বিমলবাবু বলিলেন, তোমার মনই এর সঠিক উত্তর দেবে সবিতা।

আচ্ছা, আর একটা কথা। মানুষের অন্তরের প্রধান অবলম্বন যখন এমনি করে ভেঙে যায় মানুষ তখনও বেঁচে থাকে কেমন করে— কি নিয়ে জানো?

আমার মনে হয় তুমি যা হারিয়েছো সংসারের সকল অভাগাদের মধ্যে, সকল দুঃখীজনের মধ্যে তা খুঁজে পাবে।

সবিতা যাহা বলিয়াছিলেন হইলও ঠিক তাহাই। ছোটগিন্নী তাঁহার এক বোন-পোকে লইয়া আসিয়াছিলেন ব্রজবাবুকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য। ব্রজবাবু কোনও কথা কহিবার পূর্ব্বে সবিতা বলিলেন, এঁর এই দেহ-মন নিয়ে আর কলকাতায় ফেরা সম্ভব নয়। শেষ বয়সের শোকার্ত দিনগুলো এইখানে তবু কতকটা শান্তিতে কাটাবে।

ছোটগিন্নী বলিলেন, এখানে একজন তো বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারালো। অসুখ হলে দেখবে কে, সেবা করবে কে? তা ছাড়া পাঁচজনেই বা আমাকে বলবে কি?

সবিতা বলিলেন, সেবার জন্য তুমি নিজে এখানে থাকতে পারো। ওঁকে টেনে নিয়ে যাওয়া চলবে না।

ছোটগিন্নী বলিলেন, আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারচিনে!

সবিতা বলিলেন, আমি তোমাদের শ্বশুরবাড়ির লোক, আত্মীয় হই। তুমি আমাকে কখনও দেখোনি। চিনবে কেমন করে?

ছোটগিন্নী লোকটি নেহাত খারাপ নয়। একটু নির্ব্বোধ, সাদাসিদা আরামপ্রিয় মানুষ। সুক্ষ্মভাবে কোনও কিছু বুঝিতে বা উপলব্ধি করিতে পারেন না।

ছোটগিন্নী বলিলেন, দাদার মোটে মত নয় আমি বৃন্দাবনে থাকি। এই কয়েক-দিনের জন্য এখানে এসেচি কত তাঁর হাতে-পায়ে ধরে। ওঁকে নিয়ে যাওয়াই কিন্তু আমার পক্ষে সব দিক দিয়ে সুবিধা।

সবিতা বলিলেন, তা জানি; কিন্তু সেটা ওঁর নিজের পক্ষে যে খুবই অসুবিধার।

ছোটগিন্নী বলিলেন, উনি যদি আমার সঙ্গে না যান, এখানে ওঁর দেখাশুনা করবে কে? আমার তো কালকের মধ্যে ফিরতেই হবে।

সবিতা বলিলেন, যখন তোমরা কেউই ওঁর আপনার ছিলে না, ওঁকে চিনতেও না, তখন যে-লোক ওঁর সব-কিছু দেখাশোনার ভার নিয়ে থাকতো, সেই লোকই ওঁর ভার নিয়েচে! তোমার দাদাকে বলো।

ছোটগিন্নী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, তিনি কে?

তুমি চিনবে না ভাই, তোমার দাদাকে বললে তিনি ঠিক চিনবেন। ছোটগিন্নী বোনপোর সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন।

বিমলবাবুও সিঙ্গাপুরে প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যবস্থা করলেন।

যাত্রার পূর্ব্বক্ষণে সবিতা আসিয়া প্রণাম করিলেন। শোকশীর্ণা সবিতার পানে চাহিয়া বিমলবাবু অস্ফুটে কি শুভকামনা করিলেন বোঝা গেল না।

সবিতা মৃদুকণ্ঠে অপরাধীর মতোই বলিলেন, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না! জীবনে বারে বারে আশ্রয়-ভ্রষ্ট হওয়াই বোধহয় আমার নিয়তি।

বিমলবাবুর বৃহৎ মোটর বৃন্দাবনের রক্তিম ধূলিজালে দিক আচ্ছন্ন করিয়া সবিতার দৃষ্টির অন্তরালে অদৃষ্ট হইয়া গেল। স্তব্ধমূর্ত্তি সবিতার রক্তলেশহীন মুখের পানে চাহিয়া রাখাল ভীতকণ্ঠে ডালি, মা –মা—নতুন-মা

রাখালের আহ্বানে দৃষ্টি ফিরাইয়া সবিতা অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। বলিলেন, রাজু, আমার রেণু যখন আমাকে ক্ষমা করেনি, তখন বেশ জেনেচি, সংসারে কারো কাছেই আমি ক্ষমা পাবো না।

মাস-খানেক পরে এডেন বন্দরের পোস্ট অফিসের মোহরাঙ্কিত একখানি পত্র সবিতার নামে বৃন্দাবনে আসিল। বিমলবাবু লিখিয়াছেন—

রেণুর মা,

তোমার দেশ-ভ্রমণ শেষ হইয়াচে। আমি পৃথিবী-ভ্রমণে চলিয়াছি। তোমার প্রতি বিন্দুমাত্র দুঃখ বা ক্ষোভ অন্তরে রাখিয়াছি, এ সন্দেহ করিও না। সমস্ত জীবন, বৃহৎ ব্যাপ্তির মধ্যে ব্যাপৃত থাকিয়া বর্ত্তমান জীবনের এই স্বল্পপরিসরতা আমাকে যেন সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিতেছে, তাই এই যাত্রা।

অন্তরের অভিজ্ঞতার দিক দিয়া তোমার সহিত আমার পরিচয়ের মূল্য অনেক; কিন্তু যাহা পুরুষের জীবনকে বাহিরেও যথেষ্ট বিস্তৃত, উন্নত ও উন্মুক্ত করিয়া তুলিতে পারে না, তাহা পুরুষের পক্ষে কল্যাণকর নহে। জীবনে কখনও গৃহ লাভ করি নাই। অর্থ ও ঐশ্বর্য্যই লাভ করিয়াছি মাত্র। পথিকবৃত্তিতেই সারা কৈশোর ও যৌবন কাটিয়াছে। আজ প্রৌঢ়ত্বও শেষ হয় হয়। জীবনের এই অবেলায়, গৃহের আনন্দ উপলব্ধি তোমার নিকট হইতে লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। সেজন্য অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জানাই।

তোমার প্রতি গভীর সহানুভূতি ও অসীম শ্রদ্ধা অন্তরে লইয়া তোমা হইতে বহুদূরে সরিয়া চলিলাম। এইটুকু ভরসা রহিল, আজিকার এই যাত্রা-তরী যে সুদূর অকূলে ভাসিয়াছে,

তাহার কুলের নোঙ্গর রহিলে তুমি।

যেদিন যখনই, যে-কোনও কারণে আমাকে তোমার প্রয়োজন হইবে, টমাস কুক্ কোম্পানীর কেয়ারে টেলিগ্রাম করিয়া দিয়ো। জীবিত থাকিলে, পৃথিবীর যে-প্রান্তেই থাকি, বিমানযোগে সত্ত্বর প্রত্যাবর্ত্তন করিব।

আর ইহাও জানি, এমন একজন মানুষ পৃথিবীতে রহিল, আমার শেষ বিদায়-দিন সমাগত হইলে, যে সকল বাধা তুচ্ছ করিয়া আমার পার্শ্বে উপস্থিত হইতে পারে! এই জানাটাই কি অস্তাচলমুখী একটি জীবনের পক্ষে যথেষ্ট সম্বল নহে!

সমাপ্ত